মোহনলাল।

বহুদিন হইল, আমি "নবজীবনে" "বঙ্গে ইংরেজাধিকার" এই শিরোনাম দিয়া, কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধমালা শেষে মৎপ্রণীত "ভারত-প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্যস্থাপন-প্রসঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, আমি উক্ত প্রবন্ধমালায় সেইরূপ পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এখন গবেষণাকুশল লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। এক জন অতীতদর্শী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়া, প্রীতিভাজন হইয়াছেন। সিরাজের চরিত্র এখন যে ভাবেই চিত্রিত হউক না কেন, উহার একাংশ যে কলঙ্কের কালিমায় সমাচ্ছাদিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিরাজ তরুণবয়স্ক যুবক। সুশিক্ষায় তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত হয় নাই, ভূয়োদর্শনে তাঁহার বিচারশক্তি বলবতী হইয়া উঠে নাই, স্থিরতায় বা গাম্ভীর্য্যে তাঁহার সকল কার্য্যেরও সুশৃঙ্খলা ঘটে নাই। এই অপরিণতবুদ্ধি, অদূরদর্শী ও অস্থিরপ্রকৃতি যুবক যে ইংরেজের সহিত ব্যবহারে অনেক স্থলে ন্যায়-মার্গের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়। তাঁহাতে অনেক গুণ সমাহিত ছিল, কিন্তু সুশিক্ষা ও চিত্তসংযম সহায় না হওয়াতে, তৎসমুদায় সর্ব্বাংশে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি যদি সুশিক্ষিত সংযতচিত্তে সুপথে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল, সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হইত। অকবর যে বয়সে সাম্রাজ্যশাসনে উদ্যত হয়েন, সিরাজও সেই বয়সে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করেন। বয়সের সমতা থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। কথিত আছে, যৌবনে অকবরের চরিত্র তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল না। অকবর ক্রোধী ও অসংযতচিত্ত ছিলেন। তিনি উজবেক সর্দ্দারদিগকে হস্তীর পদে দলিত করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আদেশে এক জন সর্দ্দারকে হস্তীর পদের সহিত শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া, লাহোরের রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তিনি ক্রোধের আবেগে এক জন সামান্য ভৃত্যকে সামান্য অপরাধে প্রাসাদের উচ্চ চূড়া হইতে নীচে ফেলিয়া দেন। খোসরোজের সৃষ্টি করিয়া তিনি নীতিশূন্য উদ্দাম চরিত্রের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন

ছিল। তিনি রাজা মানসিংহকে মর্ত্ত্যলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিষাক্ত মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন; শেষে ভ্রমক্রমে সেই মোদক ভক্ষণে নিজেই সাংসারিক ভোগসুখের ক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত এরূপ হইলেও, সম্রাট্ আকবর ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার সৌম্য প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি মরু প্রান্তরে জন্মগ্রহণ করেন; ঘোরতর দুর্দ্দশার মধ্যে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। এই দুর্দ্দশা তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত পরিচিত করিয়া তুলে। এবং কষ্টসহিষ্ণুতার বলেই তাঁহার অপরিসীম সৌভাগ্যের উদয় হয়। সিরাজউদ্দৌলা কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হয়েন নাই। অত্যাদর ও অতিস্নেহে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বিলাসস্রোতে ভাসমান হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল ভাবের একশেষ প্রদর্শন করেন। সিরাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এই আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেকগুলি লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ ও অস্মদ্দেশীয়গণ উভয়েই এ সময়ে আপনাদের অদৃষ্টের পরীক্ষার জন্য এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের চাতুরী পরিস্ফুট হইয়াছিল। উভয়েই আপনাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের আশা সমভাবে ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ আপনার বুদ্ধিকৌশলে রত্নসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন, অস্মদ্দেশীয়গণ ইহাদের সহিত মিলিয়া কত দূর ন্যায়পরতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সহৃদয় ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য। আলালের ঘরের দুলাল আপনার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করিতে পারেন। অপরিণত বয়স, অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অসৎসংসর্গের বিষয় বিচার করিলে, তাঁহার এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কিয়দংশে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রবীণ পুরুষ এই আলালের সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকাল কলঙ্কপঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়া থাকিবেন। এ বিষয়ে ইংরেজ যেমন কলঙ্কিত হইয়াছেন, অস্মদ্দেশীয়গণও সেইরূপ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই এক জন আপনাদের অপূর্ব্ব প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। দুই এক জনের বিশ্বস্ততা নিবিড় তমোরাশি ভেদ পূর্ব্বক স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়াছে। আবুল ফজল, তোড়র মল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ অক-

বরের প্রাধান্য ও গৌরব অব্যাহত রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীরজাফর, জগৎ শেঠ, মহাতাপ্ চাঁদ প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারিগণ সিরাজের পার্শ্বে থাকিয়াই, বিশ্বস্ততার ভাণ করিয়া, অবিশ্বস্ত ভাবের একশেষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সিরাজের পার্শ্বে আর এক জন ছিলেন, যিনি বিশ্বস্ততায় বিসর্জ্জন দেন নাই, প্রভুভক্তির অবমাননা করেন নাই, আত্মস্বত্ববৃদ্ধির আশায় পরদেশীয়েরও শরণাপন্ন হয়েন নাই। এই প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মোহন-

“রেয়াজস্ সলাতিন” নামক গ্রন্থে মোহনলালের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এখন তৎসম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। সলাতিনকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোহনলাল কায়স্থ ছিলেন। তিনি যে সিরাজের হস্তে আপনার ভগিনী সমর্পণ করিয়াছিলেন, সলাতিনে তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। সিরাজ যখন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তখনও মোহনলাল তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার প্রতি অনুরাগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিরাজ মোহনলালের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু অনুরাগের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি অন্যায়পক্ষপাতিতা প্রকাশ করেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কম ছিল। তিনি যদি মোহনলালের পদগৌরব বৃদ্ধিতে অনুরাগের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য কাহারও বিরাগ জন্মাইত না। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল অপরিণামদর্শী ছিলেন। তিনি নবাব হইয়া মোহনলালকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দিয়া বহুসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন এবং দরবারের সভায় প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তৎপ্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। কেহ কেহ এই আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। কিন্তু মীরজাফর নবাবের আদেশপালনে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নবাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় হইতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি নবাবের প্রধান আত্মীয়, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। মোহনলালের ন্যায় একজন সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁহার নিকট নিতান্তই অবমাননাজনক বলিয়া বোধ

হইল। তিনি এইরূপ অবমাননাকর আদেশে এরূপ অসন্তুষ্ট হইলেন যে, নবাবের নিকট গিয়া, তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনেও কিছু দিন নিরস্ত রহিলেন।

এ দিকে মোহনলাল নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। যদি গাম্ভীর্য্য বা সুশিক্ষা অবলম্বনস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে উন্নতপদমূলক অসামান্য প্রাধান্য ও ক্ষমতা সহসা লোকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। মোহনলালেরও এইরূপ মতিভ্রম ঘটিল। অনুরাগীর অনুগ্রহে মোহনলাল উচ্চপদ লাভ করিয়া অসঙ্গতভাবে আপনার ক্ষমতার পরিচালনায় উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার আত্মীয় স্বজন ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ অপসারিত হইলেন। মুতাক্ষরীণকার সৈয়দ গোলাম হোসেন একটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। মোহনলাল তাঁহাকে কহিলেন, তিনি যদি মাসিক দুই শত টাকা বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নবাব-সরকারে থাকিতে পারেন, নচেৎ তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। তেজস্বী গোলাম হোসেন সম্মত হইলেন না। তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থ মক্কায় যাইবার ছল করিয়া হুগলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কের রেখাপাতে কালীময় হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু মোহনলাল গর্ব্বিত এবং আত্মক্ষমতার বৃদ্ধিতে আত্মম্ভরী হইলেও, বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। প্রভুভক্তিতে তিনি অবিচলিত ছিলেন, প্রগাঢ় বিশ্বস্তভাবে তিনি কর্ত্তব্য-পথে অটলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রতিপালকের হিতকামনায় তিনি সর্ব্বক্ষণ সংযত ভাব, একাগ্রতা ও যত্নের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। যে বিপুল ষড়যন্ত্রের অভিনয়ে সিরাজের অধঃপতন হয়, মোহনলাল তাহার মধ্যে ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মীরমদন ও মোহনলালের বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় বীরপুরুষই সেই ঘোরতর বিপত্তিময় স্থলে সেই কুচক্রিগণের অপূর্ব্ব চক্রান্তজালের বিকাশক্ষেত্রে হতভাগ্য সিরাজের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, মীরমদন চক্রান্তকারীদিগের কুপরামর্শে একবার বিচলিত হইয়াছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখন কর্ত্তব্যপথে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। শেষে তিনি আপনার অসাধুভাবের দমন করেন। কিন্তু মোহনলালের চরিত্র এ বিষয়ে যেরূপ কলঙ্কশূন্য, সেইরূপ

উঠে না! মোহনলাল কখনও প্রভুপরায়ণতায় বিসর্জন দেন নাই। প্রভুর অনিষ্টজনক কর্ম্মসাধনে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বক্ষণ অটল, অপরাজেয় ও অনমনীয় ছিলেন। লিখিত আছে, ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াই তিনি নবাবকে মীরজাফরের প্রাণনাশের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মীরজাফর নিহত হইলে আর কেহ ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তদীয় প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে সাহসী হইবে না। কিন্তু সিরাজ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। মীরজাফরের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে তাঁহার অভিরুচি হয় নাই। অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণমতি যুবকের এইরূপ মহাশয়তা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। এ স্থলে কলঙ্কলিপ্ত মীরজাফরের পার্শ্বে সিরাজের উজ্জ্বলতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

মেয়াজর সলাকিনে মোহনলালকে যে ভাবে দেখা যায়, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। মোহনলালের শত অপরাধ থাকিতে পারে, কিন্তু যে গুণ মানবহৃদয়ের একটি প্রধান ভূষণ, মোহনলালের হৃদয় সেই গুণে অলঙ্কৃত ছিল। মোহনলাল সেই গুণের সহৃদয়সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কলিকাতা-ওয়ালারা, হুগলী-তট-বাসীরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালার (উত্তর-বাঙ্গালারও বটে এবং দক্ষিণ বাঙ্গালারও কোন নয়?) বাঙ্গালে কথা শুনিয়া যে হাসেন—বাঙ্গালে কথা লইয়া যে বিদ্রূপ করেন, সেটা তাঁদের আত্মাভিমানের, অজ্ঞতার অথবা কূপমণ্ডূকতার ফল। নহিলে, কলিকাতার 'ককনী'র কথা যদি বাঙ্গালা কথা হয়, কর্ণফুলীর ও মেঘনার মাঝিদের কথাও বাঙ্গালা কথা বটে। একের কথা অপরের কর্ণে যেমনই বাজুক,—একের কথা অপরের কাছে যতই অবোধ্য হউক, উভয়েরই এক ভাষা বই দুই ভাষা নয়। পরন্তু, কলিকাতার ককনী ও কলিকাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি বাঙ্গাল না হন, তবে ঢাকা ও চাটগাঁর অজপাড়াগেঁয়েরাও বাঙ্গাল নয়,—অন্ততঃ বেজায় বাঙ্গাল নয়। চাটগাঁ যদি বাঙ্গাল হয়, চুঁচুড়াকেও বাঙ্গাল বলিতে বাধা কি? কথার আওয়াজ ও উচ্চারণটা আসলে আর কিছুই নয়, কেবল কাণের অভ্যাস ও মনের ধট্‌কা। যে আওয়াজের ও যে উচ্চারণের কথাটা বা কথাগুলা যাহারা চিরকাল, আজন্ম শুনিয়া আসিতেছে, সেই আওয়াজ ও উচ্চারণই তাদের

কাণে ভাল লাগে, মিষ্ট লাগে, উপযুক্ত বোধ হয়। তাহার বিপরীত হইলেই হাসি পায়, অবোধ্য ও বিসদৃশ বোধ হয়। অতএব বলা অতিরিক্ত যে, কলিকাতা হাবড়া হুগলী চুঁচুড়াই যে চাটগাঁ, চাঁদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালীর উচ্চারণ আওয়াজে হাস্য-রস-অবতারণার অধিকার পাইয়া অহরহ সেই অধিকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নয়। সে অধিকার ও অধিকারের অভিনয় ও ব্যবহার—দুই দিকেই সমভাগে বিভক্ত। নোয়াখালি চাটগাঁর, হুগলী চুঁচুড়ার, নদে শান্তিপুরের, নৈহাটী হালিসহরের অধিবাসীরাও হাবড়া কলিকাতা অঞ্চলের কথা শুনিয়া হাস্য-রসে ভাসে, অভিনয় করে।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক একাকী এ অঞ্চলে আসিলেই বুঝিতে পারিতেন, এ কৌতুক কি? উপস্থিত লেখক নিজে সম্প্রতি সে কৌতুকের বিষয়ীভূত। কেবল কৌতুকের বিষয়ীভূত নয়, মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্টে ক্লিষ্ট। এ পক্ষের উচ্চারিত সভ্যজনানুমোদিত বাক্যাবলী এ অঞ্চলের ইতর শ্রেণীর একান্ত অবোধ্য। তাহার একরত্তি ইহারা বুঝে না; শুনিয়া বিস্মিত হয়; মনে মনে বিদ্রূপ করে। মান্য করে বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। তাদের পুরুষ "পোলারা" পশ্চাতে যাইয়া হাসে। কিন্তু, "মাইয়েপোয়ারা" মুখের উপরেই মর্ম্মান্তিক মধুর হাসি হাসিয়া দুই পার্শ্বে "সারক্যাষ্টিক্" কটাক্ষ রাখিয়া যায়। আমরা যেন যথার্থই একটি জানোয়ার, কলিকাতার 'জু' হইতে বে-অব্-বেঙ্গলের জঙ্গলে পলাইয়া আসিয়াছি!

মনে হয়, কেন হায়! বাঙ্গাল হইলাম না, কেন আজন্ম বাঙ্গালে কথা শিখিলাম না। এখন শিখিতে চেষ্টা করি, কত কসরত করি। কিন্তু, একে আর হইয়া যায়। তাহাতেও লোকে হাসে, হাততালি দেয়। ইচ্ছা হয়, 'বে-অব-বেঙ্গলে' ঝাঁপ দিই। দোভাষী দ্বারা বিষয়-কর্ম্মই চলে। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য, সামাজিকতা ত আর চলে না। প্রণয় প্রেমের ব্যাপারেও দোভাষার দোটানা তরজমায় চলে না। কিন্তু সংসারে সে সবই ত আছে!

ফলতঃ আমার কথা যতই মার্জ্জিত, মোলায়েম, সভ্য, সুন্দর এবং সাধুভাষা ও সংস্কৃতসৌরভিত হউক, এখানে—এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ইহা নিষ্ফল। অতএব কুৎসিত। নিষ্ফল, কেন না ইহা কেহই বুঝে না। ইহা কেহই বুঝে না, কাজেই ইহা তাহাদের কাহারও কাণে ভাল শুনায় না, ইহা কাহারও মনে ধরে না। কাজেই আমার কথা ইহাদের কাছে কুৎসিত। যাহা সফল, তাহাই সুন্দর; যাহা নিষ্ফল, তাহাই কুৎসিত।

সফলতাতেই সৌন্দর্য্য। নিস্ফলতাই অসুন্দর, কুৎসিত। utilityতেই beauty; unutilityতে ugliness। ইহা অগ্রে কেবল কেতাবে পড়িয়াছিলাম। অধুনা কার্য্যক্ষেত্রে দায়ে পড়িয়া বুঝিতেছি।

কিন্তু, পুনর্ব্বার এ পক্ষ বিষয়ের বাহিরে, ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পঞ্জীর তিথি নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহগণ হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

"সাহিত্য"-পত্রের 'টু-দি-পয়েন্ট'-প্রিয় সম্পাদক-যুবক নিশ্চয়ই এ পক্ষের মস্তিষ্কের উপরে অকাল-ভীমরতির আবির্ভাবের আভাস দিয়া, আন্তরিক বেদনা-পূর্ণ আক্ষেপপত্র পাঠাইবেন! কিন্তু, প্রিয় সম্পাদক, তুমি আপাততঃ তাহা না পাঠাইয়া, যদি প্রলোভন সংবরণ করিতে পার, তবে, বাহিরের বাজে বাক্যগুলা বরং মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইও না। অথবা তোমার প্রেসের প্রেতবর্গকে কহিয়া দিও, এ পক্ষের প্রলাপগুলাকে পঞ্জীকৃত করিয়া দেয়;—যদিও তাহা পঞ্জিকা বই গঞ্জিকা নয়।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী লইয়াই বড় বড় বিশারদদের বিষম বিবাদ;—বাঙ্গালা ভাষা ত তাহার পরের পর্য্যায়! পঞ্জিকা-কার অগ্রে বল, আদি বঙ্গ কোথায়, মূল বাঙ্গালী কে? তাহার পর গণিয়া কহ, কোন জাতির বায়ু-কোষে বাঙ্গালা ভাষার বীজ ছিল ও কাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে বাহির হইয়াছিল?

অদ্যকার সম্মার্জ্জিতা, সংস্কৃতশব্দালঙ্কারশোভিতা, বিলাতি-'ইডিয়ম'-অভি-[illegible] বিধুমুখীর বীজ, দ্রাবিড়ীয়, কোলীয়, সাঁওতালীয়, বা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত?

কাঁঠালপাড়ার পুরাণ পাঁজীর মতে, শ্রীমতী সংস্কৃত হইতে উত্থিতা বা সংস্কৃতের গর্ভজাতা; অতএব প্রাকৃতের কন্যা নহেন, কনিষ্ঠা ভগিনী। কেহ কহেন কন্যা, কাহারও মতে কনিষ্ঠা ভগিনী! অতি রমণীয় সম্বন্ধনির্ণয় বটে!

কাঁঠালপাড়ার মতে, আর্য্য ঠাকুরেরা এ দেশে আসিয়া এদেশীয়দিগকে আর্য্যী-কৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং এদেশীয়দের অনার্য্যবস্তুমাত্রই এক গণ্ডুষে উদরস্থ করিয়া, আর্য্যপক্ক পদার্থ দ্বারা অনার্য্য-(বঙ্গ?)-ভূমি পরি-পূরিত করিয়াছিলেন। অনার্য্যদের আদিম (বাঙ্গালা?) ভাষাটাও সেই গণ্ডুষে তাঁহাদের উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃতাত্মিকা বা সংস্কৃতাত্মজা বাঙ্গালা দেবী, তাহার (শূন্য?) তক্তে বসিয়াছিলেন। অতএব তিনি অনার্য্যা নহেন; আর্য্যা—খাঁটী আর্য্যা।

প্রমাণ, বস্ত্রালঙ্কার, বাক্যের ছটা,—ক্রিয়াকর্ম্মের ঘটা—কি [illegible] পোশাক

তৈজসপত্র, এটোঁ, আসবাব, সবই ত আর্য্যপক—সুমার্জ্জিত, সংস্কৃত-সুবাসিত। ...র অস্থি মজ্জা শিরা ধমনী, সবই ত সংস্কৃত। তবে, পেটের ভিতর, ...রার ভিতর, শিকের উপর, কুলুঙ্গির ভিতর, ধামা ঢাকা, সরা চাপা, ...র বাতায় গোঁজা, ন্যাকড়ায় বাঁধা, উনুনের পিঠে, বালিসের নীচে, ...নালার খোপে, তোসকের তলে, লেপের খোলে, ঢেঁকির গড়ে, ধুচুনীর খড়ে, কোঁচ্‌তার মাথায়, কুলার গায়, খুকীর খোঁপায়—এখানে ওখানে যেখানে সেখানে যে ঐ যা তা কত কি সব অসংস্কৃত রকমের দেখিতে পাও,—ওগুলো কিছু নয়। উহারা "দেশজ",—অতিশয় ইতর কথা। বঙ্গভাষার এখন এমন রূপ যে, উহাদের নাম ধরিতে লজ্জা করে। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে ?

যেখান থেকেই আসুক, ওগুলা আজও খুব গুলজার। আদিম কালের আর্য্য গণ্ডূষ, বোধ করি, উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাই আজও আছে। তার পর, এ আমলের এঙ্গলো-আর্য্য পিয়ালার পৌনঃপৌনিক "পেগ্"ও উহাদিগকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না। তাই, বোধ করি, বরাবরই থাকিবে।

যাহা দেশজ নয়, তাহা নিশ্চয়ই বিদেশজ। অতএব সংস্কৃত বিদেশজ। ফারসী, উর্দ্দু, আরবী, ইংরেজী, স্পেনিশ, পোরটুগিজ প্রভৃতিরই মতই বিদেশজ; বলা বাহুল্য, এ স্থলে আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্বের কথা নয়;—ভাষা-... দের 'এরিয়ান্' ও 'সেমিটিক' বংশত্ব বাদ দিয়াই এখানে কথা। দেশজ বিদেশজেরই কথা। বিদেশজ মহাশয় বা মহাশয়ারা, বোধ হয়, বাঙ্গালা নহেন—নিশ্চয়ই বাঙ্গালা হইতে পারেন না। আরবী, ফারসী, ইংরেজী, অবশ্য বাঙ্গালা নয়। অতএব বিদেশজ সংস্কৃতও বাঙ্গালা নয়। সংস্কৃত বা তাহার আত্মজ বা অপভ্রংশ। বাঙ্গালা তবে বিদেশজ না হইয়া দেশীয় কেন, বাঙ্গালা কেন, বাঙ্গালা কিসে, বাঙ্গালা কবে হইতে ? পঞ্জিকাচার্য্যদিগকেই প্রশ্ন করিতেছি।

বিদেশজ মহাশয়রা বা বিদেশিনী ঠাকুরাণীরা অগ্রে অবশ্য এ দেশে কেহই ছিলেন না। থাকিলে আর বিদেশজ হইবেন কেন ? তাঁরা ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছেন। কেহ বনবাস করিতে, কেহ ব্যবসা করিতে, কেহ বশীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতে কেহই আসেন নাই, মারিতে, মথিতে, দংশিতে, দলিতে, শাসিতে, শোষিতে,

উজড়াইতে, [illegible]ড়াইতে আসাই [illegible]পরিমাণে সকলের উদ্দেশ্য ছিল। আজ ইংরেজরা যদি শাসিতে ও সভ্য করিতে আসিয়া থাকেন, আদিম আর্য্যেরাও এখানে এসেছিলেন তাহাই করিতে, এবং করিয়াছিলেন তাহাই। তাঁদের শাসনে এবং সভ্যীকরণে, বশীকরণে ও আর্য্যীকরণে পেষণে, দেশীয়দের আদিম ও অপ্রাপ্তবিকাশ ভাষাটি পর্য্যন্ত পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। এবং তাহার পদ অধিকার করিয়াছিল আর্য্য সভ্যতার সন্তান—সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিকৃতি। জিজ্ঞাস্য, সেই ভাষায় সেই বিকারই কি বাঙ্গালা ?

যদি তাহাই হয়, সংস্কৃতের প্রাকৃতের সেই বিকারের নাম বাঙ্গালা হইল কেন? তা[illegible] নাম গৌড়ী, পৌণ্ড্রী, রাঢ়ী বা আর কিছু হওয়াই ত উচিত ছিল। হইলেও পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালভূমির নামে তাহা বিশেষিত, পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুরের বলবীর্য্যে—রাজসম্মানের খাতিরে কি? কিন্তু, বিক্রমপুর ত বড় বেশী দিনের নয়। বিক্রমপুরের বহু পূর্ব্বেই ত উহার জন্ম। তখন ও তাহার পরেও ত পূর্ব্বাঞ্চলের ন্যায় পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ খণ্ডেও স্বস্বপ্রধান স্বাধীন রাজা ছিলেন। অতএব উক্ত বিকৃতির বাঙ্গালা নাম হইল কেন? অথবা ইতিপূর্ব্বে উহার আর কোন নাম ছিল?

[illegible]যাইতেছে, যাঁহাকে ও যাঁহাদিগকে লইয়া এখনকার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গা[illegible]য় যাঁর এবং যাঁহাদের এখন একাধিপত্য, একছত্রত্ব, তিনি নিজে বাঙ্গালী নহেন; তাঁদের কেহই বিশুদ্ধ বাঙ্গালী নন। তাঁহারা সকলেই প্রবাসী বা উপনিবেশী, বা ভাগ্যপরীক্ষাপরায়ণ ভবঘুরে পর্য্যটক। তখনকার এই অনার্য্য ভূমে সংস্কৃত স্বয়ং সবিশেষ ভাবে তৎপর্য্যায়ভুক্ত। তিনি নিজে 'বিদেশজ'। তবে কি "দেশজ" বলিয়া আজও এ দেশে যে কতকগুলি কথা চলিত আছে, যাহাদিগকে সংস্কৃত-চঞ্চু ও সাধুভাষী ভট্টাচার্য্যগণ, ইতর, গ্রাম্য, অন্ত্যজ বা অশ্লীল বলিয়া উপহাস করেন, তাহারাই কি আদিম কালের আসল বাঙ্গালা? দেশজগুলিই কি মৃত ও বিলুপ্ত বাঙ্গালার ভগ্নাবশেষ?

পরন্তু এই "দেশজদের" দেশ কোথা? পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গাল রাজ্য, এখন তাহাও ত ঠিক বলিতে পার না। পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সব দিকে ত "দেশজ" আছে; সাধারণ দেশজ আছে; তা ছাড়া এক একটি প্রদেশের স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ "দেশজও" আছে। সবই এখন চালোয়া বাঙ্গালা বটে;

পূর্ব্ববঙ্গই যদি বঙ্গ, বাঙ্গালেরাই [illegible] বাঙ্গালী, "দেশজ [illegible]দি থাকে বাঙ্গালা বুলি,—তবে পূর্ব্ববঙ্গে, বাঙ্গালদেশের মধ্যেই [illegible] কিন্তু এখন আর নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে লোপ হইয়া গিয়াছে) দেশজ বুলি খুব বেশী বেশী থাকা উচিত। কিন্তু, তা নয়। বাঙ্গালদের ভিতরে দেশজ অবশ্য বিলক্ষণ আছে; কিন্তু খুবই যে বেশী আছে, তা নয়। অন্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী নাই। বরং বাঙ্গালদের মধ্যেই সংস্কৃতের ও সাধুভাষার বাড়াবাড়ি বেশী। চাটগাঁয়ে অতি ইতরশ্রেণীর লোকেরাও সচরাচর কথোপকথনে বলে—"মেঘাবর্ত্ত", "জরাংশ" "ভাণ্ড," "আষ্ট" ইত্যাদি সন্ধিসমাসযুক্ত আরও অনেক আনকোরা সংস্কৃত কথা। বিভক্তি ও ক্রিয়া পদাদিতেও সংস্কৃতের সুস্পষ্ট ছায়া পড়ে। "দিয়ন", "থায়ম", "দিবাম", "পাঠাইবাম", "ন [illegible]" ইত্যাদির খুব চলন।

ঠাকুরাণীর ঠাটের কাঠামের অঙ্গের, আভরণের পৌণে ষোল আনা অংশেরও অধিক এখন সংস্কৃত বটে। অতএব সংস্কৃত রূপেই যে ইনি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, ইহা বলা বিচিত্র নয়। কাঁঠালপাড়ার পুরাণ পঞ্জিতে দেখা যায়, পঞ্জীকর্ত্তা প্রত্যক্ষের উপর খড়ি পাতিয়া প্রত্যক্ষেরই গণনা করিয়াছিলেন। অতীতের গণনা আজও কেহ করিয়াছেন কি? উক্ত পঞ্জিকায় "বাঙ্গালা ভাষার অপর একটি অনার্য্য মূল" কথিত হইয়াছে; গণিত হয় নাই। সে মূল কিরূপ, সেই মূলই কি আসল ও আদি মূল নয়? কিন্তু হায়! আর্য্য মহাপ্রভুরা সে মূল প্রায় উৎপাটন করিয়া ছাড়িয়াছেন।

শ্রীমতীর উপর সংস্কৃতের এবং সাধুভাষার এতটা আধিপত্য কি আদি কাল হইতেই এইরূপ? আদি কাঠামখানা কি একেবারেই অপ্রাপ্য? কোন্ তৃণে কাহারা, কাহাকে প্রস্তুত করিয়াছিল? ভাষার তৃণ কবে সাহিত্য-তরী হইয়া ভাসিয়াছিল? আর্য্য আসিয়াই ভাসাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তরীও তিনি গড়িয়াছিলেন বটে। কিন্তু, অনার্য্য তৃণ কি একেবারেই স্পর্শ করেন নাই? অথবা আর্য্য তরীর তুফান-তুফানে অনার্য্য তৃণ অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছিল? একই দিনে তলাইয়াছিল, অথবা ক্রমে ক্রমে তলাইয়াছিল? অথবা দুই একই হইয়া ভাসিয়াছিল, তার পর অনার্য্য-প্রভুরা আর্য্য-তৃণ অশুচি অপবিত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। অথবা যোগ্যের উদ্বর্ত্তন ও অযোগ্যের মরণের বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাহারা মারা গিয়াছে?

অনার্য্য তৃণ ত্যাগ করিয়া আর্য্যতরীতেই উঠ। তরী ত বহু বাতাসেই

তাঁহার কি কি রূপ মূর্ত্তি ছিল, তাহারই সন্ধান—তাহারই প্রশ্ন করিতেছিলাম। কিন্তু তাহারও বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ, হিন্দু ও আদি আর্য্য আমলেরও বহু পূর্ব্বে, ঠাকুরাণী ছিলেন বটে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি কালেরই গণনা করা পঞ্জিকাকারদের কর্ত্তব্য। এখন, বাদশাহী আমলটাই প্রায় তাঁদের উপজীব্য। বর্ত্তমান যুগেরও পাঁজী নাই। সাহিত্যের সাম্বৎসরিক পাঁজি হয় না কেন? দিন-পঞ্জিকা, মাস-পঞ্জিকা, বৎসর-পঞ্জিকা আবশ্যক। জ্যোতিষের পাঁজি ত আছেই; অনেক জীবনবীমা, জলবীমা, অগ্নিবীমার পাঁজি হয়; পাটের কলের পঞ্জিকাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের পাঁজি, তৈল পাঁচনের পাঁজি, পাঁজি কিসের নাই? নাই কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের। সেটা কি এতই সামান্য জিনিস? কেন? সে ক্ষেত্রে, সে চক্রে, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র, রবি শশী রাহু কেতু, দেব দেবারি, রাজা রাণী, পাত্র মিত্র, মেম্বর, মিনিষ্টার, আফিস বেহারা, লীডার স্পীকার, জলাধিপ, ফলাধিপ, ঋতু, পক্ষ, রাশি, মঘা, অশ্লেষা, ত্র্যহস্পর্শ, তল্পবহ, তল্পীদার, সবই ত আছেন; এবং তাঁদের পরিক্রমণ, পরিবর্ত্তন, নবনির্ব্বাচনাদিও আছেন, তাঁদের দ্বিরাগমন, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদিও আছে। তবে তাঁহাদের পঞ্জিকা নাই কেন?

বাদশাহী আমলে, বা সে আমলের কোনও আমলে, বৈষ্ণব রোশনি নিরালা নিধুবনে ফুটিলেও, মহাশয়গণ মার্জ্জনা করিবেন, বাদশাহী আমলে শ্রীমতী বাঙ্গালা ভাষা বিবি ফার্শী উর্দ্দুর একজন বাঁদী ছিলেন। শ্রীমতী সদর মোকামে এবং অন্দরমহলেও বটে, বিবিদ্বয়ের বাঁদীত্ব করিতেন। ফারসী ছিলেন বড়ী বিবি, 'বেগমে খাস'; আর উর্দ্দু ছিলেন ছোটী বিবি, 'বেগমে আম্'। বাঙ্গালা ছিলেন বাঁদী। "করিমা ববক্স" তখন বাঙ্গালীর বাহির দলিজে আচকান পিনিহিয়া, তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া আলবোলায় গোলাপী গুড়ুক টানিত, কোপ্তা কাবাব খাইত। ক খ গ ছিল নোক্তাদার "করিমার" ঘৃণিত গোলাম। বড়মানুষ হিন্দু বাঙ্গালীমাত্রই প্রায় ছিলেন মুন্সীজী। এখনকার যেমন 'মিষ্টার', তখনকার তেমনি মুন্সী ছিল শিক্ষার ও সম্মানের সরকারি বেসরকারি মানদণ্ড; চূড়ান্ত 'ডিপ্লোমা'। মিঞাজীরা মুন্সীজী 'কোচ্' করিতেন। হিন্দু-তনয়েরা পাজামা আবা আঁটিয়া, মাথায় মুসলমানী টুপি টেড়া করিয়া পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গ দোলাইয়া, কণ্ঠ তালু কাঁপাইয়া "করিমা" আওড়াইত। আর বড় বড় কাল কাল তক্তীর উপর মোটাখতের কলম দক্ষিণ হইতে বামে বুলাইয়া লিপি-

শিল্পের শিক্ষা করিত। কচিৎ কোনও বিশিষ্ট বংশের হিন্দু বালক "গণপতি দেহ সুমতি" বলিয়া তান্ত্রিক তালপত্রের উপর যন্ত্র কবচ, ক, খ, লিখিত কি না সন্দেহ। প্রায় সকলেই তখন নবাবী বুটিদার নথ ও নোক্তাদার "বড়ি কাফ্" "ছোটি কাফের" কয়তপ করিত। ক, খ, তাহার বহু পশ্চাতে পায়ে পায়ে চলিত। বস্তুতই তখন "বিস্মোল্লা" "গণপতিকে" ও "নারায়ণং নমস্কৃত্য"-কেও বটে, প্রায় গ্রাস করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ও বড়মানুষ ব্রাহ্মণের পোয়ারা টোল চৌপাড়ী প্রায়ই মাড়াইত না। কায়স্থসন্তানগণ তাহার কাছেও ঘেঁসিত না! বৈদ্যের পুত্রেরা নিদানমতে নাড়ী টিপিবার ইচ্ছা হইলেই সেথায় যাইয়া স্বরসন্ধি হলসন্ধি শিখিত। নহিলে নোক্তা ধরিয়া মুন্সী মোক্তার হইত। টোলে যাইত কেবল গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণের বালকেরা। কিন্তু সেখানেও বাঙ্গালার আদর এমনি ছিল যে, সে কথা বলিবার নয়। বাঙ্গালা তথায় ছিলই না বলিলেও বলা যায়। চৌপাড়ীতে বাঙ্গালার শিক্ষা কখনও ছিল কি না, জানি না। কিন্তু তখন ছিল না; এখনও নাই। বাঙ্গালাকে অপদস্থ কবিতে চাই না। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিজ্ঞান-সত্য ব্যক্ত করাই বাসনা। অতএব বলিতে বাধ্য, বাঙ্গালা বাদশাহী সেরেস্তা কাছারীতে ছিলেন বাঁদী; সংস্কৃত টোলে চৌপাড়ীতে ছিলেন চেড়ী। চৌপাড়ী অপেক্ষা কাছারিতে বরং তাঁর কিছু ইজ্জত ছিল—নিম্নতম স্থানে ফারসীর ফরাশ হইতে খুব দূরে, গারদ ও কঙ্কিখানার কাছে, তাঁর একটু তবু দাঁড়াইবার স্থান ছিল। কানুনগো সেরেস্তায় কিছু বাঙ্গালা ছিল। গ্রাম্য পাটোয়ার, শিকদার ও মালগুজার-দের বস্তার ভিতর বাঙ্গালা বসিতে পাইতেন। পাটোয়ারেরা উর্দ্দু পারসীর কাছ থেকে 'কিতাবৎ' ও 'কায়দা' কর্জ্জ করিয়া লইয়া বাঙ্গালাকে দিয়াছিল। পাটোয়ারেরা বাঙ্গালাতে পাট্টা দিত ও কবুলিয়ৎ লইত। তাহাদের অধি-কাংশ কথা, রচনার কায়দা এবং হিসাবের 'কিতাবৎ' সবই কিন্তু ফারসীর। শ্রীমতীর সেই এক মূর্ত্তি! জিজ্ঞাস্য—সেটি কি সংস্কৃতাত্মিকা আর্য্যময়ী মূর্ত্তি? অথবা শুদ্ধ "সেমেটিক"? নমুনা আজও আছে। পত্রিকা-কার পরীক্ষা করিতে পারেন। তদ্রূপ সেরেস্তাতেও বাঙ্গালা ছিল। চিঠা, পৈঠা, একোয়াল ও জমাবন্দী এক প্রস্থ করিয়া বাঙ্গালায় হইত। পাটোয়ার, শিক-দার ও তহশীলদারেরা সেহা, শুমার, করচা, আবরজা বাঙ্গালায় লিখিত। জমা-ওয়াশিল-বাকি বাঙ্গালায় হইত। তোডরমলের প্রসিদ্ধ "ওয়াশীল তুমার জমা"ও বোধ করি বাঙ্গালায় এক প্রস্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। কাছারি

ও সমন্বয় নাই, বা হওয়া দুষ্কর। নিরেট ছিদ্রহীন অক্ষরশ্রেণী অমাবস্যার অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে; তাহার সহিত মনুষ্যের মুখের ভাষা ও মনের ভাব, উভয়ের কাহারও পরিচয় নাই; তাহার মধ্যে তাহাদের প্রবেশের পথ নাই। অপরটির—শ্রীমতীর বৈষয়িক সেরেস্তার চেহারাটি, চারি ভাগের দেড় ভাগেরও বেশী যাবনিক "জবান", ফারসী "লবজ", অবশিষ্টের কতক কিতাবতী কথা, কতক "দেশজ" ইতর শব্দ, এবং কচিৎ কিছু কিছু সংস্কৃত বা প্রাকৃত বাক্যের যোজনা, বিভক্তি কোথাও বাঙ্গালা, কোথাও ... খণ্ডচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ প্রায় কোথাও নাই। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়ানির্বিশেষে, সটান দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া একই 'সেনটেন্স' চলিয়াছে। ইহাও অবশ্য বাঙ্গালা বটে।

এই দুই আকারের দুই রকম বাঙ্গালা সেকালের সদরি বাঙ্গালা। একটি বিদ্যাবত্তার বাঙ্গালা; অপরটি বিষয়কর্ম্মের বাঙ্গালা। ইহা ব... পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা কিন্তু নিশ্চয়ই একটি ছিল, তাহাতে স... নাই। কেন না, পণ্ডিতি বাঙ্গালা সকল ব্যবহারেরই বহির্ভূত ছিল। পরন্তু কিতাবতী বাঙ্গালায় গৃহস্থালী ও দৈনিক জীবনের কাজ চলিত না। ... ঐ দুই অনিবার্য্য ব্যবহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাঙ্গালার আবশ্যকতা ছিল, এবং তাহার অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ঠিক বলা যায় না। কারণ, তাহার সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গ আমরা এ আমলের লোক দেখি নাই। তাহার কতকাংশ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের কাছে পঁহুছিয়াছে।

পরন্তু, ঐ পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একই রকম আকৃতি প্রকৃতি ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধরণ, গঠন ও উচ্চারণ ছিল। "যোজনান্তে ভাষা" আজও এ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। ফলতঃ ছিলও তাই। এখনও কোথাও কতকটা সেইরূপই আছে। কিন্তু এখনকার একটানা সভ্যতায়, শিক্ষায় ও পরীক্ষায়, কোথাও রেলে এবং ষ্টীমারে, কথার হেরফের অনেকটা কাটিয়া গিয়া সর্ব্বত্রই প্রায় একই ধরণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

তখন পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা—কথোপকথনের Colloquial বাঙ্গালা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছিল। কিন্তু, সে বাঙ্গালায় কেহ কিছু লিখিয়া রাখিতে ও লিখিয়া জানাইতে সাহসী হইত না। কথা

কহার "ভাষা কথায়" লিখিতে লোকের তখন লজ্জা করিত, ভয় হইত। লিখিলে লোকে নেহাত মূর্খ বলিত, নিন্দা করিত, ছেলেমানুষী বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কাজেই তখন কেহ কথা কহার স্বাভাবিক ভাষায় মনোভাব প্রায়ই ব্যক্ত করিত না। কিছু লিখিতে হইলে একটা অস্বাভাবিক উৎকট ভাষা ও উদ্ভট ভাব আবশ্যক হইত। তাহা যাহার না জুটিত, সে কখনও লিখিত না; যে পণ্ডিতি হেঁয়ালী রচিতে পারিত, সেই কেবল লিখিত। আর যে কিতাবতী ঢং জানিত, সেই কালি কলম একত্র করিতে পারিত। নহিলে আর কেহ কেবল "নকল" করা ছাড়া আপন ভাষায় "মুসবিদা" করিবারও ভরসা করিত না। তবে, আর এক শ্রেণীর লেখক বা রচক ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা তখনকার কথা কহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা পাইয়াছি।

যাহারা কথায় কথায় মিলন ও চরণে চরণে পূরণ করিতে পারিত, উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর লেখক ব্যতীত, কেবল তাহারাই তখন লিখিতে বা রচিতে সাহস করিত;—তাহারা কবিওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, কথাওয়ালা, পাঁচালী-ওয়ালা প্রভৃতি। ইহারা গান রচিত, কথা বাঁধিত, গানের পালা বাঁধিত, ছড়া গাঁথিত। ইহা যাহারা করিত, বা করিতে পারিত, তাহারা সকলেই আপনাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিত। স্বপ্নে কোনও দেবতার দেখা ও "আরতি" পাওয়া ভিন্ন কেহ কখনও এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। বিশেষতঃ যাহাদিগকে বড় বড় পালা বাঁধিতে হইত, তাহারা প্রায় সকলেই দেবাদিষ্ট লোক, বা দেবতার বরপুত্র। জগতে জাহির হইতে উৎসুক কোনও দেবতা হঠাৎ এক আঁধার রাত্রে বা চাঁদনীর আলোকে তাঁহার বাঞ্ছাপুত্রের শিয়রে আসিয়া বসিতেন; তাহাকে জাগাইয়া বা স্বপ্ন দেখাইয়া নিজের জাহির হইবার বাসনা ব্যক্ত করিয়া তাহার যোগাড় করিতে কহিতেন। স্বপ্নাদিষ্ট জীব তাহার অজ্ঞতা অক্ষমতা বারবার জানাইত, কিন্তু দেবতা তাহা শুনিতেন না। জবরদস্তি দৈবশক্তি সহ পূজাপ্রচারের আরতি দিয়া যাইতেন। রাত্রিপ্রভাতে "পাঁচালী প্রবন্ধের" পুঁথি লেখা আরম্ভ হইত। এই সব পাঁচালী প্রবন্ধকে তখনকার লোকে বলিত "পালা", "জাগরণ", "মঙ্গল", "ভাসান", ইত্যাদি। আমরা এখন এ সকলকে বলি কাব্য। বলার অবশ্যই বিশিষ্ট কারণ আছে। তখনকার লোকে এই সব পাঁচালীর পালা আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গণে সংকল্প করিয়া গাওয়াইত, পাঁচালী-প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা দিত; রচক ও গায়ক প্রশংসিত

ও পুরস্কৃত হইত। সাধারণ লোকে সাগ্রহে সাদরে আসরে বসিয়া এই সব পাঁচালীর পালা শুনিত। শুনিবারই কথা। শ্রোতব্য বটে। বিশেষতঃ, তখন এই সকলের মত সর্ব্বজনবোধগম্য ও মনোজ্ঞ রচনা আর কিছুই ছিল না। সকলেই ইহা উপভোগ করিতে পারিত, সুতরাং আদর করিত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত-সমাজে এই সব মঙ্গল-পাঁচালীর, এবং কবি, কীর্ত্তন ও বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ রচনা সকলের এক কপর্দ্দকও পসার ছিল না। সংস্কৃত ভট্টাচার্য্যেরা বলিতেন, "ও ভুলো ভাষা।" নেহাত অনুগ্রহ হইলে, নাক শিকায় তুলিয়া বড় জোর বলিতেন, "সুবুদ্ধি-রচনা", বা "ভাষা কথার সংঘটন করেছে বেশ।" তদুর এতটা প্রশংসাই প্রচুর ছিল। বিদ্যাবানদের মত বৈষ্ণব ঠাকুরেরাও "মনসা মঙ্গলচণ্ডীর ইতর কথা" বলিয়া এই সব পাঁচালীর পালাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিতেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, তাঁরা নিজে সবিশেষ ভাবে ভাষাসেবক ছিলেন, এবং তখনকার বাঙ্গালা ভাষার বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, গৌরাঙ্গসেবকদিগের প্রতিও পক্ষান্তরে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইত। এখনকার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের অপেক্ষা অনেক বেশী গালিগালাজ গৌরাঙ্গভক্তেরা ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত শাক্ত পাঁচালীওয়ালা ও বৈষ্ণব পদ-পয়ার-গান-প্রণেতারাই তখনকার কথিত ও চলিত পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ ভব-সংসারে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কেহ কৃতী, কেহ বা অকৃতী ছিলেন; কেহ আসল, কেহ নকল; কেহ মেকি, কেহ খাঁটি ছিলেন। তাঁদের কতক কাল-পর্ব্বে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন; কতকের সহিত অল্পাধিক বিকৃত বা অবিকৃত আকারে এ যুগের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। অবিকৃত আকারে তাঁদের অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে; অথবা কিছুই পাওয়া যায় নাই। তবুও ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তিত, প্রক্ষিপ্ত, বিকৃত ও বিড়ম্বিত, যে আকারে ও যে অবস্থাতেই তখনকার বাঙ্গালার যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, এবং এখনকার বাঙ্গালার সম্মুখে পঁহুছিয়াছে, তাহা পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, ও পদওয়ালাদের প্রসাদাৎ; এবং বহুনিন্দিত বটতলার বাণিজ্যপ্রবণতার প্রসাদাৎ। নতুবা নিশ্চয়ই এ যৎকিঞ্চিৎও জুটিত না। বলিতে কি, বটতলাই এক হিসাবে আমাদের "একাডমি অব্ লিটারেচর্।" কিন্তু যাহা পাইয়াছি, তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। তখনকার চলিত বাঙ্গালার চৌদ্দ ভাগের চারি ভাগও ভাসিয়া আসিয়াছে [illegible]

নাই। যাহা আসিয়াছে, কেবল দৈবাৎ আসিয়াছে। কেন? তাহা পঞ্জিকাকারদেরই গণিয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার কেবল এইমাত্র মনে করেন যে, তখনকার রচকেরা গোলাতেও পদ্য ভিন্ন গদ্য রচেন নাই। কিন্তু, কেন? পদ্য রচার গুণ কি তাঁদের ছিল না? কেন থাকিবে না? বিলক্ষণই ছিল। পদ্য অপেক্ষা গদ্য রচা সহজ না হউক, কঠিন নয়। তাঁরা যে প্রকারের পদ্য রচিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে, তাঁরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উত্তম গদ্য রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাঁদের গদ্য গাঁথার গুণ থাকিলেও, গদ্য রচার রেওয়াজ তখন একেবারেই ছিল না। একেই ভট্টাচার্য্য-"ভেঙ্গচানি ভূমিকা 'ভাষা', তাহাও আবার সুর-ছন্দ-যতি-হীন যদৃচ্ছাগ্রথিত গদ্য! তখনকার রচকেরা এখনকার লেখকদের মত সাদা মাঠা কথায় গাদা গাদা গদ্য রচিলে নিশ্চয়ই গালে চড় খাইতেন। তার পর, গদ্যে ত আর গান গাওয়া চলে না। তখনকার রচকদের গান গাওয়া বা গাওয়ানই আবশ্যক ছিল; গালে চড় খাইবার দরকার নিশ্চয়ই ছিল না। কাজেই তাঁরা গদ্য রচার বিষয় ভুলিয়াও ভাবেন নাই। ফলতঃ, এখন আমরা যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ পাঁচ সাত শত ক্রোশব্যাপী গদ্য লিখিয়া গ্রন্থ ছাপাই, প্রবন্ধ প্রকাশ করি, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সামান্য সামান্য ঘটনা বিবৃত করিয়া কথা কহা / কথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈনিক ও সাপ্তাহিক ... পয়সা খরচ করিয়া প্রকাশ করি, তখনকার লোকেরা এখন জীবিত ... আসিয়া উহা দেখিলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে বলিবেন, "তোমরা অকালকুষ্মাণ্ড ও অলস; সংসারে তোমাদের করণীয় আর কোন কর্ম্মই নাই, তাই তোমরা পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা বিষয়ে এত অধিক বাজে বাক্য লিপি করিয়া রাশি রাশি কাগজ নষ্ট কর। আর তোমরা নিশ্চয় উন্মাদ হইয়াছ, তাই সেই সকল অযোগ্য ও হাস্যাস্পদ লিপি ইংরাজের কৃত ছাপাখানা নামক কলে ছাপাইয়া অতিদুর্লভ অর্থের দারুণ অপব্যয় কর। তোমরা মূর্খ ত বটেই, তাহার উপর মস্তিষ্কও তোমাদের মাটী হইয়াছে। নহিলে কেবল বালস্বভাবচাঞ্চল্যের বেগ ও ব্যভিচার এত বেশী হইতে পারে না!"

পিতামহগণ, তাঁহাদের সুদুর্লভ সাদা কাগজের অদ্যকার এই অন্যায় অপব্যয় ও অপমৃত্যু দেখিয়া, মর্ম্মপীড়াবশতঃ সর্ব্বপ্রথম পত্রসম্পাদকগণকে সেকালের পলায়িত পাঠশালার পোড়োর মত আড়কোলা করিয়া যে পাগলাগারদে পৌঁছাইয়া দিতেন, ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

...নকার রচকেরা এই গুরু কারণেই গদ্য রচিতেন না। পদ্য গাঁথিতেন। ... যে সে প্রবন্ধও রচিতেন না। পদ্যে পাণ্ডিত্যের ও পৌরাণিক ...নের পরিচয় পদে পদে দিতেন। প্রহেলিকা প্রস্তুত করিবার অবসর পাইলে, তাহা পার্য্যমানে ছাড়িতেন না। তাঁরা পৌরাণিক বিষয় ভিন্ন প্রাকৃত বিষয় প্রায়ই স্পর্শ করিতেন না। কচিৎ প্রাকৃত বিষয় কল্পনা করিলেও, তাহাতে পৌরাণিক ও শাস্ত্রিক বর্ণ রঞ্জিত করিয়া দিতেন। অতএব বলা বাহুল্য, সেরূপ রচনার বাঙ্গালা সাধারণতঃ কিরূপ আকার ধারণ করিত। যে সকল স্থলে পাঁচালী বা তাহার অংশবিশেষ দেবদেবীর বন্দনা, সাধনা, স্তুতি, বা মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, যে সকল স্থলে রচনা সর্ব্বাংশে শাস্ত্রীয়, পৌরাণিক, পাণ্ডিত্যপ্রকাশিনী বা প্রহেলিকাময়ী, সে সকল স্থলের বাক্যবিন্যাসে সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক শব্দেরই সবিশেষ আধিক্য হইবারই কথা।

তবে, পৌরাণিকে প্রাকৃতে মেশামিশি হওয়াতে, পৌরাণিকের উপর রচকদের নিজের নিজের কল্পনার রঙ্ পড়াতে, এবং নিজের নিজের সময়ের ও সমাজের রঙ্ পড়াতে, কখনও কখনও অজ্ঞাতে, উলঙ্গ স্বভাব, শিল্পচাতুরীর শিকল কাটিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনই—কেবল তখনই কবি মহাশয়েরা কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃত শব্দের কায়দা ও পুঁথি লেখার প্রচলিত Conventionality পরিত্যাগ করিয়া, লোকসাধারণ, সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তখনই তাহা তৎকালের লোকব্যবহৃত বাঙ্গালার মত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দেখা যায়, সে বাঙ্গালার সংস্কৃত অপেক্ষা বরং অসংস্কৃতই অধিক। সাধুভাষা বা ভদ্র ভাষা অপেক্ষা তথাকথিত ইতর ভাষাই অধিক। দেশজ বাক্য, বিভক্তি ও 'ইডিয়ম' আদিতে তাহা প্রায়ই পরিপূর্ণ। সংস্কৃত শব্দও তাহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আছে। কিন্তু হিন্দী ফারসীও আছে।

ফলতঃ, আজ কাল চলিত বাঙ্গালায় সংস্কৃতের ও সাধুভাষার যতটা বেশী রকম আমদানি হইয়াছে ও হইতেছে, সাবেক আমলে ততটা ত ছিলই না; তাহার তিন ভাগের এক ভাগও ছিল কি না সন্দেহ। এখনকার এবং সম্মুখের এবং বাড়ীর কাছের বাঙ্গালা দেখিয়াই, বোধ হয়, সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিবে যে, সংস্কৃতই বাঙ্গালার জননী; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই মাতামহী।

মাতা ও মাতামহী 'থিওরি' মন্দ নয়। কিন্তু, শাশুড়ী 'থিওরি' কিরূপ শুনাইবে?

যদি বলি, গর্ভজাতা দুহিতাও নহে,—দুহিতৃগর্ভজাতা দৌহিত্রীও নহে; বাঙ্গালা, সংস্কৃত-ঠাকুরাণীর পুত্রবধূ, এবং সনাতনী সংস্কৃতভাষা, শ্রীমতী বাঙ্গালার শাশুড়ী, তাহা হইলে, বোধ হয়, তীরধানা শিকার ছাড়িয়া বেশী তফাতে যাইয়া পড়ে না।

আর্য্য ঠাকুরেরা এ দেশে আসিয়া অনার্য্য বাঙ্গালিনী সহ বাঙ্গালা ভাষাকেও বিবাহ বা সংগ্রহ করিয়া, নববধূর সঙ্গে নববধূরই ন্যায় গৃহে তুলিয়াছিলেন। আর্য্যমাতা অনার্য্যা বধূদিগকে, এবং সংস্কৃত-মাতা বঙ্গভাষা বধূটিকে স্বগোত্রীয় মন্ত্রে শুভক্ষণে বরণ করিয়া লইয়া বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার ধন রত্ন যৌতুক দিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্বশ্রূ বঙ্গবধূর অনার্য্যঅঙ্গ শোধিত মার্জ্জিত করিয়া, তাহা আর্য্যালঙ্কারে সাজাইয়া, আর্য্যীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহা অসম্ভব নয়। রমণী, জননীর বৈভব অপেক্ষা, ঠাকুরাণীর সম্পদেরই অধিকতর অধিকারিণী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা এক রাত্রির মধ্যে সংস্কৃতের সাজ সজ্জা পরেন নাই। বহু শতাব্দে উত্তরোত্তর তাহার অধিকার করিতেছেন। বাদশাহী কাল অপেক্ষা ইংরেজী আমলেই এ অধিকার বেশী বাড়িয়াছে। শ্রীমতী শ্বশ্রূর সনাতন সম্পদে শক্তিমতী হইয়া, সোহাগ করিয়া, বিলাতী বিষম বৈভব ক্রয় করিতেছেন; ইহা উন্নতি বটে।

অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরীক্ষায় শ্রীমতীর প্রবেশাধিকার নাই বলিয়া, এ পক্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোনও কালে কখনও ইনি কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণাভাব। মোসলেম আমলে ইনি যেরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, এখনি দেখা গিয়াছে। নিত্যপাঠার্থ পাঠশালাই ছিল তখন ইহাঁর প্রধান চতুষ্পাঠী। পরন্ত, নৈমিত্তিক 'কলচারের' জন্যও বড় বড় দুইটি কলেজ ছিল; তাহার একটির নাম "আসর ইনিষ্টিটিউশন," এবং অপরটির নাম ছিল,—"বাসর একাডেমী"। এই দুই সিণ্ডিকেটের সহী স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত 'সার্টিফিকেট,' 'ডিগ্রি', 'ডিপ্লোমা' পাইলে, নিদেন 'লাইসেন্স' কিনিয়া, যাঁরা 'য়ুনিভার্সিটী আউট' হইতে পারিতেন, তাঁরাই ছিলেন তখনকার "বাঙ্গালা-বিদ্যাবিদ্ বুধ", বা বৃহস্পতি, বা [illegible]। অর্থাৎ, এম্. এ., এম্. ডি., 'ডক্টর অব্ বেঙ্গলী লিটারেচর", ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীমতীকে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের সুব্রতী সন্তান। কিন্তু, বাঙ্গালাই বিদ্যা-

সাগরকে অমর করিয়াছে। শ্রীমতীর তখন বয়ঃক্রম অবশ্য বহু শতাব্দীই হইয়াছে,—যখন বিদ্যাসাগরের বিপুল যত্নে বালিকাবিদ্যালয়ে গেলেন। বিদ্যা-সাগর শ্রীমতীর হাতে বই ছাপিয়া দিলেন, শ্লেট পেন্সিল দিলেন, পাততাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর বসাইলেন। সবরুচা শাটীর নীচে একটি শাক সাদা ধপ্‌ধপে সংস্কৃত শেমিজ্ পরাইয়া দিলেন। তাহার উপর আবার একটি 'বডিস্' পরাইলেন। হাতের শাঁখা খাড়ু ভাঙ্গিলেন না, সীমন্তের সিন্দূরও মুছিলেন না। বরং সিঁথির উপর আর এক বিন্দু বেশী সিঁদুর টিপিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর বর্ষীয়সী বালিকাকে নূতন ধরণের "বর্ণ-পরিচয়" হইতে "মাতার বনবাস" "শকুন্তলা" পর্য্যন্ত সায় করাইলেন। বাঘমুখ বালা শাঁখার সঙ্গী হইল। শাশুড়ী সংস্কৃত-ঠাকুরাণীর সিন্দুকে অজস্র জড়োয়া গহনা। গহনাগুলি বড় ডাগর ডাগর—সেকেলে রামচন্দ্রী মোহর গলাইয়া গড়া, সত্যযুগের সোনা। কলির মেয়ে বঙ্গবধূর গায়ে গলায় মানায় না। বিদ্যাসাগর বেতহাতে বিদ্যালয়ে অষ্টপ্রহরই উপস্থিত। হাতুড়ি ধরিলেন, হাপর বসাইলেন। সংস্কৃত-মাতার মান্ধাতার আমলের গহনা গলাইয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, পিটিয়া, মনের মত মানানসই 'ফ্যাশন'সই করিয়া, বাঙ্গালার গায়ে গলায় পরাইয়া দিলেন। বাউটিস্কুট, বাঁউড়ীসুট হইল। সোণার চন্দ্রহার ঝুলিল। ডায়মনকাটা চিকের কোলে হীরার ধুকধুকি জ্বলিল। কাণময় মাকড়ী। নাকে নাকফুল—সেকেলে নথখানার গড়ন কুৎসিত! পায়ে আটগাছা মল উঠিল। তখন আর পায় কে? বাঙ্গালা তখন চৌপাড়ীর চেটীদের কর্ম্মনাশা ও বাদশাহী বাঁদীদিগের বৈতরণী পার হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এবং বিলাতি সাহিত্যের সমুন্নত শেলাই ফোঁড়াই শিখিয়া, বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন। সময় বুঝিয়া বাঙ্গালা কাটে, বিলাতি ছাঁটে, জোছনা-রঙের রেশমী গাউন শিলাইয়া, শ্রীমতীর বিদ্যাসাগরী বডিসের উপর ঝুলাইয়া দিলেন। দিনে দিনে আরও রঙ, 'ওয়াশ', 'ব্রাশ,' 'এসেন্স্' প্রভৃতির আমদানি হইল। বধূর পায়ের গুজরিপঞ্চম গিয়া 'সিকের' 'স্থল্' 'ব্লু-ষ্টকিং' চড়িল। কীর্ত্তিমতী 'কিড কাফে'র দস্তানা আঁটিলেন। পিয়ানো আসিল, পিক্‌চার ঝুলিল, 'পাংখা' দুলিল, পরদা পড়িল; বিদ্যালয়-কক্ষ তখন হাফ ড্রয়িংরুম্, হাফ বল্‌রুম্। বিদ্যাসাগর তখন নাই, বেতও নাই। বল্‌-রুম্ কারপেটে মোড়া, কোচ কেদেরায় যোড়া। শ্রীমতী তখন আধ-বাঙ্গালিনী, আধ-বিবি। বিলাতি

বিস্কুটের পাকে, কুকুখানারের বাদামতক্তী। শুভ্ ইভ্‌নিং ম্যাম্! বেরী ভি এক্লী! কেয়ার্ যি ওয়েল্! কিন্তু ঐ কলা, ফলা—" (ক-য়ে র-ফলা, ক-য়ে য-ফলা, "মার্ক ফলা")—আই আই! কাই কাই!—ঐ কথাগুলা আর এখন তোমার পরিধান করা ভাল দেখায় না। লেডি! তুমি [illegible]কারের বাড়ীতে 'ব্যাপ্‌টাইজ্' অর্থাৎ 'রোমানাইজ্' হও; নইলে বিলেত যেতে পাবে না। জান?—এটা ১৯০৫—20th সেঞ্চুরি?

শ্রীমতী যখন সাগরী শেখিজ্ পরিয়াছিলেন, তখন তাঁর সেকেলে মাল-মশ্‌লা-বোঝাই "গহ"খানা বৈতরণীর বুকের উপর ডুবু ডুবু। কিন্তু তখন শনির দৃষ্টি ঘুচিয়া বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছে; পরক্ষণেই ক্ষিতি কূলে লাগিল। চারি দিক থেকে দাঁড়ি মাঝী জন মজুর গিয়া জুটিল, জল সেঁচিল, কাদা মুছিল, মাল বহিল, যত পারিল সাজাইল, শৃঙ্খলা করিল। বহুকালের পর মেরামতের জন্যে গহখানা ডকে উঠিল। ইঞ্জিনিয়রেরা গিয়া গহখানার ভিতর ক্যাবিন্ গড়িয়া শ্রীমতীর নবীন মূর্ত্তির বসবাসের কামরা সাজাইয়া দিল। শুলুকের ফ্যাশনে গহখানার সংস্কার হইল। শ্রীমতী শুলুকে উঠিলেন। ডিঙ্গা আবার ভাসিল। ভাসিতে ভাসিতে অক্ষোরণ পার হইয়া চতুর্দশ শতাব্দীতে পড়িল। এক—দুই—তিন—চারি—নিরিয়ানি আমদের বাঙ্গালা সাহিত্য সম্প্রতি তের শত পাঁচে পা দিয়াছেন।

এখন, পত্রিকাকার! কহ, শ্রীমতীর সূতিকা-গৃহের সংবাদ কি? শৈশবে তিনি কি ছিলেন? কৈশোরে কিরূপ ফুটিয়াছিলেন? বুড়া বিবি, বোধ হয়, তখন 'মিশি-বাবা' ছিলেন না? শ্রীমতীর অন্নপ্রাশন পুংসবনাদির সমাচার কি? এ আমলে কি তাঁর দ্বিরাগমন? বয়স যার শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, বা তাহারও অধিক? সর্ব্বাগ্রে সাব্যস্ত কর তাঁর জন্মকাল, জন্মকোষ্ঠী এবং সর্ব্বোপরি তাঁর জনক জননী কে? যাঁর শত বৎসরের বিবর্ত্তনে আধ-বিবিষ; এ ইনি কোন্ অবতার? তের-শ' পাঁচে তরীর কাণ্ডারী কে? ভৌগোলিক সংস্থান কি? এক শত হইতে বার শতের stock-takingতের শ'তে কিছু হওয়া উচিত কি না? তের শতের বাণিজ্য-বায়ু কোন মুখে, কোন দিকে? তেরশ' পাঁচের রাজা কে, মন্ত্রী কে, বৈদ্য কে? রোগ কি? ঔষধ কি? মেঘ কেমন? জল কত? ফসল কেমন, ইত্যাদি [illegible] ফলাফল বলুন,—যাহা শুনিয়া নর নারী দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বলিবেন, রাজা নাই,—'রিপব্লিক্' তের [illegible] 'পার্লামেন্ট' বসেছে।

ঐ দেখ, পাঁচের পরম চরমোন্নতি "সাহিত্য-পরিষৎ"। অতি উত্তম উত্তর। 'রিপব্লিকে' রাজি আছি। কারণ, তাতে 'সাইট্' আছে। বিশেষতঃ, আরও সুবিধা এই যে, পঞ্জিকাকার খুঁজিতে এ পক্ষকে অলি গলিতে ঘুরিতে হইল না। [illegible] সব-পল্লীর চিরপরিচালক নবদ্বীপের নূতন সংস্করণ অতি সহজেই ক্ষেত্রে সম্মুখে উপস্থিত। ইহা যেমন সৌভাগ্য, তেমনি শুভগ্রহ। নহিলে পঞ্জিকাকার কে, এবং কাহাদের হওয়া উচিত, 'নিম্ন-প্রাইমারি'র এই অতি নীচ প্রশ্নটাও অনেক ক্ষণ নিজড়াইতে হইত। অতঃপর কেবল আশঙ্কা এই যে, প্রশ্নগুলা কিছু 'অন্‌পার্লামেণ্টারী' রকমের হইয়া থাকিবে, এবং পার্লামেণ্টের বহু দূর বাহির হইতে হইয়াছে। কিন্তু, প্রথম অপরাধের সংশোধন আছে। দ্বিতীয়ের নজির আছে। পরিষৎ 'অন্‌পার্লামেণ্টারি'কে 'পার্লামেণ্টারী' করিয়া লইতে পারেন। সদস্যের মুখে না হয়, সেক্রেটারীর হাতে হইতে পারে। পরন্তু বাহিরের প্রশ্নও ভিতরে যাইতে পারে, তাহার নজির আছে। 'প্লাট-ফরম' ও 'প্রেসে'র প্রশ্ন 'পার্লামেণ্টে' পঁহুছিবার কোনও না কোনও প্রবাহ পাইয়াই থাকে। সেখানে—স্বস্থানে ত পায়ই। ইদানীং এখানেও পাইতেছে। 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে', তথা 'লোকাল্ কৌন্সিলে' লোকজিজ্ঞাসা আজ কাল তাজা টাটকাই যাইয়া থাকে। পরিষদের পার্লামেণ্টে রাজনৈতিক সুরেন্দ্র-নাথের মত সাহিত্যিক সুরেন কি আধখানিও নাই ?

উন্মাদিনী।

ভূমিকা।

প্রায় তিন বৎসর হইল, প্রিয়বর প্রেমগোবিন্দবাবু উকীলের খাতায় নাম লেখাইয়া জয়পুরের বড় আদালতে যাতায়াত করিতেছেন। লাইসেন্স লইবার পর পাঁচ মাস কি ছয় মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্রিয়বরের একখানা করিয়া পত্র [illegible]তাম। প্রেমগোবিন্দের পত্র যখন হাতে আসিয়া পঁহুছিত, মনে [illegible] বিদ্যুৎ কি অগ্নিশিখা যেন আমার ডান হাতের অঙ্গুলি হইতে [illegible] এই [illegible] [illegible]হের সর্ব্বত্র একটা উদ্দাম স্ফূর্ত্তি ও [illegible]লাসের মা[illegible] চলিয়া [illegible]। পত্রের ভিতরকার উৎসাহ দেখে

কে ? সত্য ও [illegible] বলিদান হয় বলিয়া ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণের একটা কিম্বদন্তী আছে। প্রেমগোবিন্দ দেখাইতে চান যে, তাহা প্রধানতঃ উকীলবাবুদের [illegible], আইনের দোষে নহে। তিনি এমন ভরসা রাখেন যে, উকীল-কলঙ্ক-[illegible] প্রথম দৃষ্টান্ত তিনিই দেখাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস, ওই সাদ্‌লাটাই সকল নষ্টের গোড়া। ও জিনিষটা মাথায় দিলে দেবতাও দানব হইয়া যায়। সেহেতু প্রয়োজন না হইলে প্রেমগোবিন্দ শামলা স্পর্শ করেন না।

কিন্তু কয় মাস পরে প্রেমগোবিন্দের চিঠির গতি ক্রমশঃ বড় মন্দা হইয়া আসিল। সপ্তাহান্তে ত দূরের কথা, মাসান্তেও আসে কি না সন্দেহ। তাহাও আবার এক পয়সার পোষ্টকার্ডমাত্র; আগেকার সেই মসৃণ কাগজে লিখিত, অপূর্ব্ব-অলঙ্কার-সমন্বিত, সুদীর্ঘ, বাক্যবহুলী উৎসাহের প্রবাহ নহে। মনে করিলাম, ভায়ার পসার এইবার জমিয়া আসিতেছে। কাজের ভিড়ে বড় চিঠি দিবার আর সময় পান না। এতদিন কথায় যাহা বলিতেন, এইবার তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। ব্যাপারখানা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার বড় সাধ হইল। শুধু সাধ নহে, একটু বিষাদেরও আভাস ছিল। প্রেমগোবিন্দ প্রায় তিন মাস আর কোনও খবর দেয় নাই। তাই ত, মক্কেলের ভিড়ে পথ হারাইয়া বিদেশে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল না কি! এই পূজার বাজারে চারি দিকেই দুষ্ট লোক ফিরিতেছে,—বিপৎপাত অসম্ভব নহে।

একদিন রবিবার সকল কাজ ফেলিয়া হৃদয়পুরে গিয়া হাজির হইলাম। প্রিয়বরের ক্ষুদ্র আশ্রমটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তা হউক; তাহাকে স্বশরীরে প্রফুল্ল করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম,—

"ভায়া! আমি মক্কেল নহি। আলাপের সময় হইবে ত ?"

প্রেমগোবিন্দ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—

"মার্জ্জনা করিও, ভাই! তিন বৎসরের পর হাতে খড়ি করিয়াছি। একটা মকদ্দমা লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলাম। তোমাদের কাহারও সংবাদ লইতে পারি নাই। এই একটা কাজেই আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সামনে পূজার ছুটি আসিতেছে। মনে করিতেছিলাম, কলিকাতায় গিয়া বন্ধুদের সাহচর্য্যে প্রাণটা আবার নবীন করিয়া তুলিব। তুমি [illegible] ভালই হইয়াছে। এখন চল যাই। আদালতের বাজারমাত্র আমার [illegible] না। লাঙ্গল ধরিতে হয়; তাও স্বীকার। এ বাবুজারী ত্যাগ করিব [illegible]

আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ব্যাপার কি বল দেখি? ভবানীর পুরোহ করিলে,—আগে ত মিষ্টান্নের খবর দাও।"

প্রে. গো.। আর লজ্জা দিও না ভাই! মিষ্টান্নের কথা কও কি? তিন মাস কাল আমি কোনওরূপ অন্ন মুখে দিয়াছি কি না সন্দেহ। মকদ্দমাটায় সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলাম; বিফল, বিফল, সবই বিফল!

আমি। একটা মকদ্দমা হারিয়াছ? এই বই ত নয়? এর জন্য তুমি যে সন্ন্যাস লইবে, দেখছি! এমনি ক'রে সংসার করিবে? জান না, উকীলের ব্যবসা নিষ্কামধর্ম্মের আদর্শ। সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, জয়াজয়, ন্যায়ান্যায়, কিছুতেই বিকার নাই,—তবে ত বলি উকীল!

প্রেম। উকীলের মুণ্ডপাত কর!

আমি। আচ্ছা, তা করিব, তোমারটা বাদ দিয়া। এখন মকদ্দমার বৃত্তান্তটা আদ্যোপান্ত বল দেখি, শুনি।

প্রেম। শুধু মকদ্দমা নয়, আমার মক্কেলের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আগাগোড়া শুনিতে হইবে।

এই বলিয়া প্রেমগোবিন্দ ড্রয়ার খুলিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি রঙিন-মলাটের খাতা বাহির করিলেন। খাতাখানি খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি?"

প্রেম। ভাই! বর্ত্তমান ব্যাপারটায় হাতে কিছু না আসুক, মাথায় কিছু আসিয়াছে। তাহারই পরিচয় এই ক্ষুদ্র গল্পে পাইবে। আমি পড়িয়া যাইতেছি। একটু সহিষ্ণুতাসহকারে শুনিবে কি?

আমি। বিলক্ষণ! শুভক্ষণে তোমার হৃদয়পুরের দিকে পা বাড়াইয়াছিলাম। তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে! পূজার সময় একটা গল্প দিতে না পারিলে "সাহিত্য"-সম্পাদক "মারামারি কাটাকাটি" করিবেন, বলিয়াছেন। আমি আজকাল চাকরীর দায়ে কিরূপ বিব্রত, তা' ত জান। লেখাপড়ায় একপ্রকার জলাঞ্জলি দিয়াছি। তাই বলি, এবার তুমিই আমায় বাঁচাইলে। এখন পড় দেখি, শুনি। উকীল আবার কবি হইতে পারে, এমন বিশ্বাস ত নাই। এত দিনের পর বুঝি বিশ্বাসটা ঘুচিয়া যায়!

প্রিয়বর একটু হাসিয়া, চোখের উপর সোনার চশমাখানি সন্তর্পণে আঁটিয়া, অতি মিষ্টস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

১

মেয়ের নাম উন্মাদিনী রাখিবার সময় মেয়ের বাপ-মার মনে তাহার সুদূর পরিণামের কোনও কথা অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বড়মানুষের ঘরের বড় আদরের মেয়ে,—আদর করিয়া সকলেই উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু উন্মাদিনীর বাল্যজীবনের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার কোনও সম্পর্ক নাই। যথাকালে যেরূপ সকলের হয়, আমাদের নায়িকারও সেইরূপ বিবাহ হইয়া গেল। তবে, সে বাপের এক মেয়ে, তাহার বিবাহে একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহার পিতা ও মাতা উভয়েরই ইচ্ছানুসারে গরিবের ছেলে দেখিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকে। জামাই শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত করেন। মাঝে মাঝে কখনও এক মাস, কখনও বা দুই মাস কাটাইয়া যান। উন্মাদিনীর শ্বশুর ছিল না। কেবল শাশুড়ীঠাকুরাণী বাস্তুবিগ্রহ বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবার নিমিত্ত ভদ্রাসন আগুলিয়া থাকিতেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধার মুখে কেবল বৈকুণ্ঠেশ্বর ব্যতীত আর কোনও কথা প্রায় শুনা যাইত না।

বৃদ্ধার মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠেশ্বরকে বোধ হয় নিজের পথ দেখিয়া লইতে হইত। তাঁহার পরম সৌভাগ্যক্রমে একটা সামান্য ঘটনায় সে বিপদ নিবারিত হইল। উন্মাদিনীর প্রথম যৌবনোন্মেষসময়ে একবার জামাইবাবু প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া তাহার সঙ্গসুখের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কর্ত্তা ও গিন্নীর মনে যাহাই থাক, দাসদাসীগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে উন্মাদিনীর শাশুড়ী পুনঃপুনঃ পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং জামাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না,—নববসন্তের বাসরকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া যাইতে হইল। প্রস্থানের পূর্ব্বদিন যত দাসী-মিশির দল তাঁহাকে ধরিয়া বসিল,—আমাদের কাপড় দিতে হইবে। জামাইবাবু মহাফাঁপরে পড়িলেন। উন্মাদিনী স্বয়ং তাহাদের সকলকে খুসী করিবেন, এই কথা বলিয়া মাঝখানে না পড়িলে, জামাইবাবুর সে যাত্রা কি হইত বলা যায় না। তথাপি নিস্তার নাই। একজন অনতীতযৌবনা অর্দ্ধবয়সী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল,—"যার এই সম্পত্তিটুকু নাই, তার আবার এত দেমাক কেন? তার শ্বশুরবাড়ী আসাই বা কেন? কথায় বলে পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।" জামাইবাবু ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কোনও [illegible] একটু মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। এখন সে সময় পাইয়া পদ্মচক্ষু সমে[illegible]না একবার ভাল করিয়া ঘুরাইয়া লইল।

কথাটা জামাইবাবুর কাণে গেল। তিনি অভিমানে দাসীকে কিছু না বলিয়া শ্বশুরমহাশয়ের সমীপে নালিশ করিলেন। শ্বশুরমহাশয় তখন নিলামে-কেনা নূতন জমীদারীখানার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। অন্যমনস্কতাবশতঃই হউক, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, জামাতার অভিযোগ শুনিয়া কেবল একটু হাসিলেন, কোনও কথা কহিলেন না। জামাইবাবু উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে, তাহা হঠাৎ মনে করিতে পারিলেন না। অবশেষে উত্তর পাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধীরে ধীরে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে গিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উন্মাদিনী তথায় নাই। তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আপনার জামা ও উড়ানীখানি লইয়া, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

জামাইবাবু নাম ত্যাগ করিয়া, প্রমোদকৃষ্ণ আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। অন্তরে বিষম অভিমানবহ্নি জ্বলিতেছিল। মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া পর দিবস প্রভাতেই বধূকে আনিবার জন্য পাল্কী বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে একখানা চিঠিও দেওয়া হইল। চিঠি এইরূপ,—

"আপনার বেহাইনের নমস্কার জানিবেন। আজ আমার পুত্রের অভিযোগের উত্তর করিতে আপনার মুখে কথা বাহির হয় না। কিন্তু আপনার কন্যার বিবাহসম্বন্ধের সময়, আমার স্বর্গীয় স্বামী যখন বড়মানুষের ঘরে কুটুম্বিতা করিতে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, আমার মনে আছে, তখন আপনারই ওই মুখে কত মধুমাখা খই ফুটিয়াছিল। যাহা হউক, মুখে কথা থাকা না থাকা যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছাধীন, তখন বাক্‌রোধের নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিব না।

"এখন আমার কথা এই। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রেরিত লোকজনদিগের সঙ্গে আমার বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি, সে জন্য অন্যত্র আবেদন করিতে হইবে না।"

পত্র পড়িয়া জমীদার বাবুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনেক উর্দ্ধফণ ফণীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির এতদূর স্পর্দ্ধা কখনও দেখেন নাই। বাবু দরওয়ানদের হুকুম দিলেন,—"পত্র লইয়া যে কয় জন লোক আসিয়াছে, প্রত্যেককে পাঁচ ঘা করিয়া নাগোরা জুতা পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া

হুকুম শুনিবামাত্র বেহারাদের কেহ বা পলাইল, কেহ বা দরওয়ানগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

প্রমোদকৃষ্ণের বধূ আনিবার সাধ এইরূপে মিটিল।

২

ক্রোধে ও লজ্জায় মাতাপুত্রের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসিল। এরূপ স্থলে যে একমাত্র উপায় বাঙ্গালাদেশে সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে, প্রমোদকৃষ্ণের জননী তাহার চিন্তা করিতেছিলেন কি না, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে প্রজাপতির দুই এক জন ভগ্নদূতের শুভাগমনবার্ত্তা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরে, একটা অভিনব উপায় আপনি আসিয়া দেখা দিল। উন্মাদিনীর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র আসিয়া পঁহুছিল। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর হইলেও, আমরা পত্রখানি নিম্নে নকল করিয়া দিলাম।

"আপনার দাসী উন্মাদিনীর প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বাবা আপনার লোকজনদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। সে অপমান আমারি গায়ে লাগিয়াছে। সেই জন্য আমি বাবার হইয়া আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। দাসীর অপরাধ লইবেন না।

"পতিনিন্দা কানে শুনিয়া সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যেখানে আপনার অপমান, আমি সেখানে থাকিতে পারি না। এ বাড়ীর অন্ন আর গ্রহণ করিব না। তাহা আমার পক্ষে বিষ। যদি কখনও আমার সন্তান হয়, তাহাদিগকেও বারণ করিয়া যাইব, এখানে কখনও পদার্পণ না করে। যাহাতে আপনার অধিকার নাই, তাহা আমিও ভোগ করিতে পারি না। পিতার যত্নের ত্রুটি নাই। কিন্তু যখন মনে হয় যে, তিনিই আপনার প্রতি অপমান বর্ষণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আদরকে একান্ত অনাদর বই আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারি না। আপনি যেখানে স্বাধীন, যেখানে সামান্য বস্তুটির জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না,—দাসী চাকরের অপমান-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় না,—সে স্থান পর্ণকুটীর হইলেও আমার পক্ষে প্রাসাদতুল্য। আমি সেই দিনই এ গৃহ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু একেলা বাহির হইতে পারি নাই। বিশ্বাস করিয়া মনের কথা এতদিন কাহাকেও বলিতেও পারি নাই। ভগবান আজ বিশ্বাসের যোগ্য একজনকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আমি আগামী কল্য

সন্ধ্যার পর লুকাইয়া এই বিশ্বস্ত দাসীর সহিত কামারপাড়ায় আমার জাতরের বাড়ী চলিয়া যাইব। আপনি সেখান হইতে আমাকে কালই লইয়া যাইবেন। উন্মাদিনীকে যেন ভুলিবেন না।

"পুঃ। আমি চোরের মত লুকাইয়া যাইতাম না। কিন্তু বাবার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে এ কথা প্রকাশ করিলে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। তাই একটু বাঁকা পথ অবলম্বন করিতে হইল। সে জন্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—"

বলা বাহুল্য, প্রমোদকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। উন্মাদিনী স্বামিগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইল। জমীদার মহাশয় আপশোষে কয়েক দিন কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালে সকল ব্যথাই জুড়াইয়া যায়। তিনিও সান্ত্বনা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বা তাহার স্বামীর নাম আর মুখে আনিতেন না। এখন কি করিলে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হয়, তিনি আপনার বিপুল বিভবের একজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিতে পারেন, কর্ত্তা-গিন্নীর মনে সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল।

৩

এইখানে পাঠক মহাশয়কে একবার কুম্ভকর্ণের স্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্ত ঘুমাইতে হইবে। ইত্যবসরে প্রমোদকৃষ্ণ ইহ-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁহারই ছবির ন্যায় একটি সুন্দর সুকুমার চারিবৎসরবয়স্ক শিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। উন্মাদিনীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ মুখমণ্ডল দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে মলিন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা ও অভিমান-শিখা উজ্জ্বল জ্বলিতেছে। প্রমোদকৃষ্ণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না;—কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শাশুড়ী ও বধূ কিশোর শিশুটির মুখ চাহিয়া কোনও রূপে দিনপাত করিতেছেন। উন্মাদিনীর পিতার আর কোনও সন্তান হয় নাই। সুতরাং প্রমোদকৃষ্ণের পুত্র, তাঁহার দৌহিত্র, এই শিশুটিই তাঁহার বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যখন শিশুটি অন্নাভাবে কাঁদিত, তখন এই কথা স্মরণ করিয়া প্রমোদকৃষ্ণের মাতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন। কিন্তু বধূর ভয়ে এবং তাহার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না। উন্মাদিনী প্রাণাধিক পুত্রের অনুপম কান্তি উপযুক্ত পোষণা-ভাবে দিন দিন ম্লান হইতে দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত। তাহার

চোখ ফাটিয়া কখনও জল পড়িত কি না, ভগবান জানেন। মানুষে তাহা দেখিতে পাইত না। সে গ্রামস্থ এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পিতা বারংবার লোক পাঠাইয়াছেন, নিজেও দুই একবার আসিয়া আপনগৃহে লইয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন। পাষাণীর পাষাণ-হৃদয় কিছুতেই টলাইতে পারেন নাই।

এক দিন অপরাহ্নে উন্মাদিনী মুনিব-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিশুটি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, মাথায় মূল্যবান উষ্ণীষ পায়ে সমুজ্জ্বল জুতা পরিয়া, রাজপুত্রের মত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছে। মাকে আসিতে দেখিয়া শিশু এক মুখ হাসিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। উন্মাদিনী বুঝিতে পারিল যে, যিনি তাহার স্বামীকে এক দিন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই তাহার পুত্রকে আজ এই অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছেন। কথাটা ভাবিতে তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। সে শিশুর মাথা হইতে টুপিটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সেটা গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণপ্রান্তে একটা নর্দ্দমায় গিয়া পড়িল। তার পর মা ছেলেকে ধরিয়া সেই সুন্দর পোষাক খুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। শিশু কাঁদিয়া উঠিল, ঠাকুরমার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, আপনার সুকুমার দেহের সমগ্র ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দুই হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া পোষাক সমেত স্বীয় বক্ষোদেশ লাগিয়া ধরিল। সে কিছুতেই তাহার মাতামহ-প্রদত্ত নবীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিবে না। এ দিকে উন্মাদিনী টানাটানি করিতেছে। শিশু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই প্রাঙ্গণে ধূলার উপর শুইয়া পড়িল, আর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরমার নাম ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুরমা এত ক্ষণ কোথায় ছিলেন, বলিতে পারি না। শিশুর ক্রন্দনে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"তোমার মতন রাক্ষসী মা ত কোথাও দেখি নি। হ'ক না; আমাদের দেবার ক্ষমতা নাই, ওর নানা মহাশয় দিয়াছেন। তাঁ'তে তোমার এত আক্রোশ কেন? যদি বেঁচে থাকে, ওরই ত সর্ব্বস্ব।"

উন্মাদিনী তখন শিশুকে ছাড়িয়া শাশুড়ীর উপর পড়িল। শিশু মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুরমার এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিচিত্র পোষাক ছিন্ন ভিন্ন ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া তাহার অঙ্গে বৈরাগীর কন্থার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল।

উন্মাদিনী কহিল, "আমার স্বামী দীন দুঃখী ছিলেন; আমিও দীন দুঃখী। গরিবের ছেলের গায়ে অত পোষাক শোভা পায় না। পরের ধনে বড়মানুষী কেন?"

শাশুড়ী। যদি কথা তুলিলে ত বলি, পরের ধনই বা কিসে? ওর দাদা-মহাশয়ের ছেলেপিলে নেই, যা কিছু সব ওই ত পাবে।

বধূ। কা'র ধন পা'বে, সে কথাটা বোধ করি আপনার মনে নেই। আপনার ছেলের অপমান আপনি ভুলিতে পারেন, কিন্তু আমার স্বামীর অপমান আমি এ জন্মে ভুলিব না।

শাশুড়ী। যখন সময় ছিল, আমিও সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছি। এখন আর সে কথায় কাজ কি, মা? যা'দের পেটে অন্ন নেই, তাদের আবার মান অপমান কি, মা? এমন সোনার চাঁদ, দুধের ছেলে,—ওর মুখে ভাল খাবার, অঙ্গে ভাল কাপড় দিতে পারি না। এর বাড়া আর দুঃখ কি আছে? আমাদের যা হ'বার হোক্। আমার প্রমোদের সোনার চাঁদ সুখে থাক্। মরণকালে তাই দেখিয়া যেন মরিতে পারি।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখের জল আর বারণ মানিল না। আপনার ঘরে গিয়া, মেঝায় পড়িয়া, উচ্ছ্বসিত স্বামিশোক ও পুত্রশোকে বৃদ্ধা কত দিনের কত কথা স্মরণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

৪

বৃদ্ধাকে অধিক দিন আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। সকল যন্ত্রণাপহারী শমনের সুশীতল বাহুযুগল শীঘ্রই তাঁহার জন্য প্রসারিত হইল। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রমোদকৃষ্ণের মাতা, উন্মাদিনী ও তাহার কিশোর শিশুটিকে সংসার সমরক্ষেত্রে ফেলিয়া, অমর ধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দুঃখে, শোকে ও দারিদ্র্যে উন্মাদিনীর দিন কাটিতে লাগিল। এখন হইতে সে বালকটিকে আর চোখের আড়াল করিত না। মুনিব-বাড়ী যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। সেখানেও শিশুটি সর্ব্বদা তাহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। অপর বালকগণ খেলায় জন্য ডাকিলে বলিত, "আমি খেলিব না। আমার মা কাঁদিবে।" সে তাহার মাকে কোনও দিন কাঁদিতে দেখিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তথাপি কি জন্য বলিতে পারি না, কেহ ডাকিলেই বলিত,—"না, আমার মা কাঁদিবে।" উন্মাদিনী

লইয়া কখনও কখনও গোপনে পরামর্শ করিত। পাঁচ বৎসরের শিশুর সঙ্গে পরামর্শটা কিরূপ, জানিবার নিমিত্ত পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই আমরা নিম্নে তাহার একটা নমুনা দিতেছি। মা বলিতেন,—

"আমার পরাণধন! তোমাকে যদি কেউ আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে যায়?"

শিশু বলিত,—"তা' হ'লে আমি কাঁদিব।"

মা। আর আমি?

শিশু। তুইও কাঁদিবি।

মা। তোমার দাদামহাশয় যদি নিয়ে যান?

শিশু। আমি যা'ব না।

মা। কেন? তাঁরা ত তোমায় ভালবাসেন।

শিশু। কেন? তুই যে বলিস্ তা'রা আমার বাবাকে ভালবাসিত না।

মা। সেখানে যেও না বাবা! গরিবের ছেলের বড়মানুষের বাড়ী যেতে নেই। তা' হলে আমি কাঁদিব।

শিশু। না, মা! আমি কোথাও যা'ব না। বাবা যদি আসে কেবল তা'র কাছে যাব! তা' হলে ত তুই কাঁদিবি না?

মাতা-পুত্রের পরামর্শ ইহার পর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সুতরাং আমরাও নিরস্ত হইলাম।

শিশু পাঁচ বৎসর ছাড়াইয়া ছয় বৎসরে পড়িল। উন্মাদিনী তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে পাঠাইতে বাধ্য হইল। প্রমোদকৃষ্ণ বলিতেন,—"যে বিদ্যাধনের অধিকারী, সে জগতের অপর সকল ঐশ্বর্য্যকে অবহেলা করিতে পারে।" উন্মাদিনীর সে কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু শিশুটিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া তাহার মন কখনও সুস্থির থাকিত না। সে যতবার সুবিধা পাইত, স্বয়ং গিয়া শিশুটিকে দেখিয়া আসিত। সে যে বড়মানুষের মেয়ে—জমিদার-দুহিতা—তাহা বোধ হয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই রাস্তার বাহির হইতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জা হইত না। শুধু তাই নহে। এরূপ চাঞ্চল্যের আরও [illegible] কারণ ছিল। প্রমোদকৃষ্ণের মাতার মৃত্যুর পর উন্মাদিনীর পিতা কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া যাইবার জন্য আর একবার আসিয়াছিলেন। এই শেষবারেও কন্যার কঠোর প্রতিজ্ঞার কোনওরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। [illegible] গিয়াছেন যে, সেইদিন হইতে তিনি কন্যার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ-

করিলেন। কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র, তাঁহার অতুল বৈভবের অধিকারী, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। উন্মাদিনী ছাড়িয়া না দিলে তিনি আপন উত্তরাধিকারীকে বলপূর্ব্বক আপনার গৃহে লইয়া যাইবেন। তাঁহার সহিত বলে আঁটিয়া উঠেন, উন্মাদিনীর এমন সহায়, এমন সামর্থ্য ছিল না। তাই শিশুটিকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া থাকিত।

গুরুমহাশয় গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঠশালা গ্রামের প্রান্তে বারোয়ারীর আটচালায় স্থাপিত ছিল। গৌরচন্দ্র গ্রামের মধ্যে একজন বিজ্ঞলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রায় দুই ক্রোশের ভিতর অন্য কোনও স্কুল বা পাঠশালা ছিল না। সুতরাং গৌরচন্দ্রের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার পাঠশালাটিও একটু উচ্চ ধরণের। গুরুমহাশয়ের নিজের জন্য একখানি চেয়ার, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত ছাত্রবর্গের নিমিত্ত কয়েকখানি বেঞ্চ ছিল। উন্মাদিনীর শিশুটির স্বভাবগুণে গুরুমহাশয় তাহাকে আপন পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বেঞ্চগুলি বয়স্কছাত্রবৃন্দের জন্য কল্পিত হইলেও, গৌরচন্দ্র তাহারই একপ্রান্তে শিশুটিকে বসাইতেন। দিনের মধ্যে একবারমাত্র তাহার পাঠ লইতেন। পাঠান্তে শিশু আপন ইচ্ছামত খেলিত, বসিত, ঘুরিয়া বেড়াইত। গৌরচন্দ্র মানসিক শ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কখনও কখনও শিশুটির সহিত বাক্যালাপ করিয়া, বা তাহার খেলায় যোগ দিয়া, ক্লান্তি দূর করিতেন।

একদিন প্রভাতে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ অনেকেই সমাগত হইয়াছে। উন্মাদিনীর বালকটিও আসিয়াছে। কিন্তু গৌরচন্দ্র স্বয়ং এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ছেলেদের মধ্যে কেহ ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কলহ করিতেছে; কেহ বা ওরই মধ্যে একটু সুবোধ, গুরুমহাশয় সেদিনের যে পাঠ দিয়াছেন, তাহাই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া [illegible] করিয়া রাখিতেছে। এমন সময়ে আটচালার সম্মুখে বকুল বৃক্ষের তলায় [illegible] বৃহৎকায় হাতী আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বড় বড় বাঁশের [illegible] মাথায় পাগড়ী, সুদীর্ঘকায় একদল হিন্দুস্থানী দরোয়ান [illegible] পৃষ্ঠে সুচিক্কণ ঝালরবেষ্টিত বিচিত্র হাওদা। [illegible] প্রমোদকৃষ্ণের শ্বশুর, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত [illegible] এ পর্য্যন্ত হাতী কখনও দেখে নাই। [illegible]বত

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেকে ভয়ে আটচালার ভিতর লুকাইল। ইত্যবসরে মাহুতের ইঙ্গিতক্রমে হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। তখন জমীদার মহাশয় হাওদার ভিতর হইতে নামিলেন। অদূরে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাঁহার দৌহিত্র, মলিনবসনে, অনাবৃত গাত্রে, অনাবৃত পদে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে হাতীর পানে চাহিয়াছিল। জমীদার মহাশয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালক তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল। বলিল, "দাদা মহাশয়!" দাদামহাশয় বলিলেন, "হাঁ দাদা! তবে আমাকে তোমার মনে আছে?" শিশু আবার বলিল, "দাদামহাশয়! তুমি ঐরাবত কোথা পেলে?"

দাদা। ঐরাবত তোমারই, ভাই! তোমাকে লইতে আসিয়াছে।

শিশু। আমি ত যা'ব না। আমার মা কাঁদিবে।

দাদা। না দাদা, তোমার মা কাঁদিবে না। তোমার মাকেও নিয়ে যা'ব।

শিশু। মা কই? মাকে ডাকো না।

দাদা। তোমার মা বিকাল বেলা যা'বে। তুমি আমার সঙ্গে চল। ইত্যবসরে একজন ভৃত্য বিচিত্র পোষাক আনিয়া দাদামহাশয়ের হাতে দিল। দাদামহাশয় আপন বসনপ্রান্তে বালকের অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে সেই সমুজ্জ্বল সাজে সজ্জিত করিলেন। তার পর তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া আপন বক্ষে তুলিলেন। তুলিয়া হাওদার ভিতর গিয়া কোলে লইয়া বসিলেন। তখন মাহুতের ইঙ্গিতে হাতী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তা'র পর গর্ব্বিত মন্থর পদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠী স্কন্ধে দ্বারবানের দল পশ্চাতে সারি দিয়া ধাবমান হইল।

পাঠশালার ছেলেরা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। ঐরাবত [illegible] দেখিয়া, কেহ কেহ যত দূর পারিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটি[illegible]কা বাশের লাঠীর ভয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল [illegible] বা ছাত্র-পল্টনের জেনেরাল গুরুমহাশয়কে সংবাদ [illegible]তে [illegible]

৫

গ্রামের ম[illegible]য়া গেল। সেদিন আর পাঠশালা বসিল না। বাল[illegible] আন্দোলন করিতে করিতে যে

যার বাড়ীতে প্রস্থান করিল। তাহার মধ্যে একদল ঐরাবতের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কৌতূহলসহকারে অগ্রসর হইল। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা বিবিধ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বলিলেন,—হাতীটা বালককে শুঁড়ে ধরিয়া হাওদার ভিতর বসাইয়া দিয়াছিল। এ কথা তিনি তাঁহার নিজের ছেলের মুখে শুনিয়াছেন। তাঁহার ছেলে বালকটির সহপাঠী। সুতরাং তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেহ বা বলিলেন,—ঐরাবত না কি বালককে দেখিবামাত্র দুই পা তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিল! একজন রহস্যপ্রিয় বুড়া সহিষ্ণুতার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া তাহারই টীকাস্বরূপ বলিলেন,—"হাতী নমস্কার করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই পা তুলিয়া নহে। আমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছি, নমস্কারের সময় হাতী চারিটি পদই জমীর ঠিক চারি হাত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল!"

ঐরাবতের বৃত্তান্ত যথাসময়ে উন্মাদিনীর কানে গিয়া পঁহুছিল। সে তখন কর্ম্মস্থলে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। উন্মাদিনী সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ কোনও দুর্ব্বলতা দেখাইল না। কেবল তাহার চক্ষে উন্মাদিনীবৎ একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অন্তরে যে অনল জ্বলিতেছিল, সে জ্যোতি তাহারই ছায়ামাত্র। উন্মাদিনী ধীরগমনে বাড়ীর কর্ত্রীর নিকট গিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "এইবার আমার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আমি আর কাজ করিব না।" কর্ত্রী ঠাকুরাণীও সংবাদ শুনিয়াছিলেন। উন্মাদিনীর প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—"তা মা! এ ত তোমার চাকরী নয়। আমি তোমাকে আপন কন্যার মত দেখিয়া থাকি। তুমি কাজ কর, আর নাই কর, আমার গৃহে তোমাকে চিরদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" উন্মাদিনী বলিল,—"মা! আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে। আমি অনুগ্রহের প্রয়াসী নহি। ভগবান সেরূপ মতি দিলে পিতৃগৃহে স্বামীর সম্পদ ত্যাগ করিয়া আসিতাম না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যিনি আমার হৃদয়ে এই অশ্রান্ত অভিমানের অনল জ্বালাইয়াছেন, তিনিই আমার উপায় করিয়া দিবেন। সেজন্য যেন মানুষের উপাসনা করিতে না হয়।" কর্ত্রীঠাকুরাণীর স্বভাবটি স্নেহরসে পরিপূর্ণ ছিল। উন্মাদিনীর এই উত্তর শুনিয়া আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। কথার পরিবর্ত্তে তাঁহার [illegible]পূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ অপহরণ করিয়া [illegible] দুইটি মুক্তা[illegible] দুইটি

অশ্রুবিন্দু দুই গণ্ডে ঝরিয়া শোভিত হইল। উন্মাদিনী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

উন্মাদিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার স্বর্গীয় স্বামী যে শয্যায় শুইতেন, বহুকাল হইল যে শয্যা সে আর স্পর্শ করে নাই, আজ কি মনে করিয়া তাহারই উপর শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। তা'র পর আবার কি ভাবিয়া উঠিল। উঠিয়া, স্বামীর লিখিবার বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ বাহির করিল। ফটোগ্রাফ তাহার স্বামী ও শিশুর। শিশুটির বয়স যখন দুই বৎসর, প্রমোদকৃষ্ণ ফটোগ্রাফ-শিক্ষার্থী কোনও বন্ধুর অনুরোধে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া এই ছবি তুলাইয়াছিলেন। উন্মাদিনী ছবিখানি বক্ষে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। যে উচ্চ সুরে তাহার প্রাণের বীণা এতদিন বাঁধা ছিল, তাহা এইবার ছিঁড়িয়া গেল। উন্মাদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। বহুকাল অনুপভুক্ত স্বামীর সেই শয্যার উপর পড়িয়া দরবিগলিতধারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল;—

"ও আমার সাতরাজার ধন! আমার আঁধার ঘরের মাণিক! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোরে কে চুরি করিল? আমার অঞ্চলের নিধি! কেন আমি তোমাকে অঞ্চলছাড়া করিলাম? তাহা না করিলে আমার প্রাণ থাকিতে ত কেহ তোমাকে কাড়িয়া লইতে পারিত না। সেখানে তোমাকে রাজার আদরে, রাজভোগে রাখিবে, তা' আমি জানি। কিন্তু সে আদর যে তোমার পক্ষে বিষ, তাহা কে তোমাকে শিখাইবে? আমি অতি দুঃখিনী—চির-কাঙালিনী। তোমার মনে আমি যাহাতে আর ঠাঁই না পাই, তা'রা তাই করিবে। আমাকে ঘৃণা করিতে শিখাইবে। আমাকে ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যাঁহার অপমান আজ পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মস্থলে অগ্নিশিখার মতন জ্বলিতেছে, তাঁহাকেও ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যে প্রতিজ্ঞাপালনের আশায় এত দিন এ প্রাণ রাখিয়াছি, আজ তা' আমার ঘুচিয়া গেল। তবে প্রাণ আর কিসের জন্য রাখিব?"—

কিন্তু উন্মাদিনী ত মরিল না। শোকের প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে আবার উঠিল। চোখের জল মুছিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় হইতে তাহার স্বভাবে উন্মাদের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা দিল। সে এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিত না, এক জনের সহিত অধিকক্ষণ কথা কহিতে

পারিত না। প্রায় সর্ব্বদা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। কথনও বা গুন্ গুন্ করিয়া গান করিত। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিত,—“হাঁ গা! রাজার হাতী এই পথে গেল কি? আমার ছেলেকে রাজা কর্‌বে। আমি রাজার মা হ'তে পার্‌ব না? আমি কার শ্বশুর-বাড়া যা'ব। আমার [illegible] দিতে এসেছে! আমি রাজার মা হ'তে পার্‌ব না।”—কথা কহিতে কহিতে উন্মাদিনী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। কথনও বা, “ঐ আমার গোপাল মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছে। সে রাজা হ'বে না। যাই, আমি তা'কে কেড়ে নিয়ে আসি।”—এইরূপ বকিতে বকিতে রাস্তা দিয়া ছুটিত। তাহার দুর্দশা দেখিয়া পাষাণেরও হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

৬

রোগ সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী নহে। কথন আসে, কথন যায়। যখন ভাল থাকিত, উন্মাদিনী ঘরের বাহির হইত না। কথনও বসিয়া বসিয়া ভাবিত, কথনও স্বামীর শয্যায় পড়িয়া কাঁদিত। কোনও দিন বা নিজের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিত। উন্মাদের অবস্থাতেও তাহাকে কথনও পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে, অথবা পরের অন্ন খাইতে দেখা যায় নাই। কেহ কিছু দিতে চাহিলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিত, “আমি উন্মাদিনী, ভিখারিণী নহি।”

এইরূপে দুই এক মাস কাটিয়া গেল। তার পর উন্মাদিনী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। মকদ্দমা ভিন্ন তাহার শিশুটিকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, অবশেষে স্বামির ভদ্রাসনটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক অর্থসাহায্য করিতে চাহিল। উন্মাদিনী তাহাদের গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল।

উন্মাদিনীর হাতে কয়েক-শত টাকা সংগৃহীত হইল বটে; কিন্তু এই সময়ে আবার তাহার রোগ আসিয়া দেখা দিল। তথাপি সে মকদ্দমার কথা ভুলিল না। যাহার সঙ্গে দেখা হয়, কেবল জিজ্ঞাসা করে,—“হাঁ গা! জজসাহেব কোথা থাকে জানো? আমি তার কাছে নালিশ করিব। আমার গোপালকে চোরে নিয়ে গেছে। আমি চোরকে ফাঁসি দিব!” লোকে শুনিয়া হাসে, কেহ বা বিদ্রূপ করে, কেহ বা আপনাদের মধ্যে একজনকে জজসাহেব বলিয়া দেখাইয়া দেয়। অবশেষে একজন প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া, হৃদয়পুরের আদালতের কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিল। আমাদের বিশ্বাস,

সে রমণী নিশ্চয়ই তাহারই ন্যায় শিশুহারা। নহিলে এমন কুকাজ কখনও করিত না।

হৃদয়পুরে আসিয়া উন্মাদিনী পূর্ব্ববৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক উকীলের সাক্ষাৎ পাইল; কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া, লাভের সম্ভাবনা না বুঝিয়া, কেহই তাহার মকদ্দমা লইতে রাজি হইল না।

প্রেমগোবিন্দ নামে একজন শাপভ্রষ্ট ভদ্র লোক কয়েক বৎসর ধরিয়া আদালতের হাওয়া খাইতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত হাতে-খড়ী করিতে পারেন নাই। একদিন কাছারী যাইবার সময় উন্মাদিনী তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি সন্ধান করিয়া লোকের মুখে তাহার অবস্থা অবগত হইলেন। প্রেমগোবিন্দের মাথাটা যতই সবল হউক, তিনি হৃদয়ের ভিতর একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করিতেন। তাই শিশুহারা জননীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নূতন ধরণের মকদ্দমাটা লইয়া একটু নাম কিনিবার বাসনাও জাগিয়া উঠিল। তিনি সে দিন কাছারী যাওয়া বন্ধ করিয়া উন্মাদিনীকে আপন আলয়ে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তার পর তাহার সব কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া, আইনের বহি খুলিয়া, নজীর ঘাঁটিয়া একখান আরজী প্রস্তুত করিলেন। পর দিবস আদালত বসিবামাত্র তাহা পেশ্ করিয়া দিলেন। অনেকে উপহাস করিতে লাগিল,—"কি হে! ব্যবসায়ের গতিক বুঝিয়া অবশেষে উন্মাদ হইবার সাধ হইল না কি?" প্রেমগোবিন্দ তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মকদ্দমাটায় আপনার সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিলেন।

নিজের সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া প্রেমগোবিন্দ অনুনয়-বিনয় সহকারে দুই একজন নামজাদা উকীলেরও সহায়তা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বিষয় বিক্রয়-লব্ধ টাকার পুঁটুলিটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। প্রেমগোবিন্দ তাহা স্পর্শও করিলেন না। খরচ-পত্র সব নিজেই নির্ব্বাহ করিলেন! সুতরাং উন্মাদিনীর টাকা তাহার অঞ্চলেই বাঁধা রহিল।

জমিদার মহাশয়ের পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি হইল না, পাঠক তাহা নিজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। যোগ্য উকীল যাঁহারা ছিলেন, কেহই নিযুক্ত হইতে বাকী রহিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া যে দুই এক জন ইতিপূর্ব্বে প্রেমগোবিন্দের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কপালে করাঘাত করিয়া আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিলেন।

আজ মকদ্দমার দিন। আদালতে লোক আর ধরে না। পাগলের মক-

দ্দমার বিচার শুনিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক। বাদিনীর পক্ষে বক্তৃতা শেষ হইলে, আসামীর উকীল ধর্ম্মাবতারকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আদালতের সম্মুখে যে বালককে আজ হাজির করা হইয়াছে, সে যে বাদিনীর গর্ভজাত, আমার মক্কেল তাহা স্বীকার করেন। বালককে যে বাদিনীর অজ্ঞাতসারে এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মক্কেল আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। এ সব কথা স্বীকার করিয়াও তিনি বালককে তাহার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিতে রাজী নহেন। প্রথম কারণ, বাদিনী উন্মাদিনী; তাহার হাতে বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কারণ, বাদিনীর মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। পথে পথে, মাঠে মাঠে তাহার আশ্রয়। তাহাতেও বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। তৃতীয় কারণ,"—কিন্তু আমরা পাঠক মহাশয়কে এই কারণ-পরম্পরার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আর হাবুডুবু খাওয়াইতে ইচ্ছা করি না।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আদালতগৃহে বাতী জ্বালা হইল। তখন হাকিম বাদিনীর পক্ষে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হুকুম লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হুকুম যাহা হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। লেখা শেষ হইলে ধর্ম্মাবতার তাহা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রেমগোবিন্দ উন্মাদিনীর ইচ্ছানুসারে আদালতকে জানাইলেন,—"আমার মক্কেল নিজে এই মকদ্দমা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চান।" হাকিম মহা বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তখন উন্মাদিনী মঞ্চের এক প্রান্তে সর্ব্বলোকলোচনের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মহিমা-মন্থর পদক্ষেপ, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব পরিণতি, তাহার বিশালায়ত লোচনযুগলের মহত্বোজ্জ্বল বিদ্যুচ্চকিত দৃষ্টি দেখিয়া স্বয়ং বিচারকপ্রবরের হৃদয়দেশও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উন্মাদিনী বলিল,—"আমার সন্তানকে আমার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা হউক।"

আসামীর উকীল আপত্তি করিলেন,—"ইহাতে বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা।" বাদানুবাদের পর বালককে বিচারকের চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা হইল।

উন্মাদিনীকে দেখিবামাত্র শিশু 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—তাহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইল। আসামীর উকীল অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"দোহাই হুজুরের! বালকের প্রাণহানি করিবেন না!" অনেক

কষ্টে বালককে ধরিয়া রাখা হইল। হাকিম স্বয়ং তাহার হাত ধরিয়া রাখিলেন। উন্মাদিনী তখন বলিতে লাগিল,—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! ভগবানের বিচার হইতে মানুষের বিচারের প্রভেদ করিবেন না। ভগবান উহাকে আমারই গর্ভে স্থান দিয়াছিলেন। তখন আমারই হৃদয়ের শোণিত আমারই নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া উহাকে পোষণ করিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইলে আমারই বুকের সুধায় উহার অধর সিক্ত হইয়াছে। তার পর আজ ছয় বৎসর ধরিয়া আমি উহাকে স্নেহপাত করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমারই ললাটের অবিশ্রাম স্বেদবিন্দু অন্নজলে পরিণত হইয়া উহার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু গঠিত করিয়াছে। সেই আজন্মের—সেই জন্ম-পূর্ব্বের বন্ধন আপনি আজ ছিন্ন করিতে চান্? আজ উহার অধিকার-তত্ত্ব আপনার বিচারে আসিয়াছে। কিন্তু যখন দশ মাস দশ দিন আমার জঠরে বাস করিতেছিল, তখনকার বিচার তার ত আপনার হস্তে ছিল না! দোহাই ধর্ম্মাবতার!"—উন্মাদিনীর দুই গণ্ডের উপর দুই অশ্রান্ত জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল,—"দোহাই ভগবানের! আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন—আমার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"—বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না। কেবল করযোড়ে অশ্রুবিপ্লাবিত বদনে বিচারকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ দিকে শিশু আবার 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বিচারকের হাত ছাড়াইয়া মায়ের কাছে যাইতে উদ্যত হইল। একজন প্রহরী বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

বিচারকের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল। বুঝি ভাবিলেন,—"একি উন্মাদিনীর উক্তি!" মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-সংবরণ করিয়া রায় পড়িয়া শুনাইলেন। উন্মাদিনীর শেষ আশার রশ্মিও নিবিয়া গেল। উন্মাদিনী তখন প্রকৃতই উন্মাদিনীবৎ এক লম্ফ দিয়া মঞ্চোপরি বিচারকের অভিমুখে এক পদাঘাত করিল। সে বুঝি ভাবিয়াছিল, সেই এক পদাঘাতে দেশের সমগ্র ধর্ম্মাধিকরণ চূর্ণ করিয়া ফেলিবে! তা'র পর আর এক লম্ফে বিচার-মঞ্চ পার হইয়া পলকের মধ্যে বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! আদালত গৃহ মহান কলরবে পূর্ণ হইল। কে কাহাকে ধরিতেছে, কে কাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে, তাহার ঠিকানা রহিল না।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে জমীদার মহাশয়ের তোরণ-রক্ষক এক-

দিন শব-নির্ব্বাণ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তোরণ-পার্শ্বে একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। অনেক সন্দেহ-অনুমানের পর স্থির হইল, দেহটা উন্মাদিনীরই বটে!

উপসংহার।

প্রেমগোবিন্দ তাঁহার গল্প পড়িয়া শেষ করিলেন। শ্রোতার অবস্থা যাহাই হউক, লেখককে সান্ত্বনা করা আমার পক্ষে একটা বিষম দায় হইয়া উঠিল। প্রিয়বরের অশ্রুর স্রোত কিছুতেই বারণ মানিতে চাহে না। আমি বলিলাম;—"ভাল উকীল যা' হ'ক! কাঁদিয়া মকদ্দমা জিতিবে না কি?"

প্রেমগোবিন্দ। চল ভাই! আর এ রাজ্যে থাকিব না। আর এ ব্যবসা করিব না।

আমি। চল। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আজ আমি অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত। ঔষধের শিশির মধ্য হইতে কবি কিট্‌সকে উদ্ধার করিবার গৌরব কেহ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই,—তিনি নিজেই প্রতিভাবলে সে কাজটা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আজ নজিরের স্তম্ভস্তূপ ও মকদ্দমার নথি-পত্র হইতে তোমার ন্যায় কবিকে আবিষ্কার করিয়া আমি বিচিত্র জয়মাল্যে সুশোভিত হইলাম।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও মৌর্য্যবংশীয় তৃতীয় সম্রাট্। ২৬৩-২২৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে "রাষ্ট্রিক" জাতির উল্লেখ দেখা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে "রট্ট" জাতি দক্ষিণাপথে আধিপত্য লাভ করে। তাঁহাদের নামানুসারে, তাঁহাদের অধ্যুষিত জনপদ মহারট্ট (মহারাষ্ট্র) নামে পরিচিত হয়। এই "রট্ট" জাতিই কালক্রমে "রাষ্ট্রিক" নামে পরিচিত হয়। রট্টবংশীয় বিভিন্ন পরিবার, পরস্পরের রক্ষণার্থ রট্টকূট—(রাঠোড়=রাষ্ট্রকূট) নামে সম্মিলিত হয়। অন্ধ্রভৃত্য ও ক্ষত্রপ নরপতিগণের অধিকারকালে এই রাষ্ট্রকূট সামন্তেরা বিভিন্ন প্রদেশে অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। অন্ধ্রভৃত্য

ও কদম্ব বংশের অভ্যুত্থানের পর, সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রকূটগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কাহেরির পর্ব্বতগহ্বরে এক বৌদ্ধচৈত্যে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের লিপি দৃষ্টে ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোন নরপতির ২৪৫-তম বর্ষে লিখিত হয় বলিয়া, উক্ত তাম্রশাসনে নির্দ্দিষ্ট আছে। চালুক্য-বংশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটবংশ দক্ষিণাপথে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া, জয়সিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ-ভাগে দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন শত বৎসর রাষ্ট্রকূটবংশ চালুক্য সম্রাটদিগের পদানত থাকিয়া, পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত (৭৫৩—৯৭৩ খৃঃ) রাষ্ট্রকূটবংশ প্রবলপ্রতাপে দক্ষিণাপথ শাসন করিয়া, অবশেষে পুনরায় চালুক্যবংশের পদানত হয়। মধ্য যুগে রট্ট সামন্তেরা বেলগাঁও জিলার সুগন্ধবর্ত্তী (সৌনদত্তি) প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।*

কোহ্লাপুরের সন্নিহিত সামনগড়ে দন্তিদুর্গের নামাঙ্কিত এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহা ৬৭৫ শকাব্দে (৭৫৩ খৃঃ) দন্তিদুর্গের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের পিতামহ গোবিন্দরাজ হইতে বংশাবলী আরব্ধ হইয়াছে। এলুরার গহ্বরস্থ দশাবতারের মন্দিরে গোবিন্দ-রাজের পূর্ব্বতন দন্তিবর্ম্মা ও ইন্দ্ররাজের নাম খোদিত রহিয়াছে। দন্তিবর্ম্মা হইতে রাষ্ট্রকূট নরপতিগণের ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাইতেছে। সামনগড়ের শাসনপত্র ৬৭৫ শকাব্দের মাঘমাসের রথসপ্তমীদিনে উৎকীর্ণ হয়। ইহার দ্বারা মহারাজ দন্তিদুর্গ শেঋর (স্বোমর ?) জনপদের অন্তর্গত দেউলবট গ্রাম বশিষ্ঠগোত্রজ বেদবেদাঙ্গবিৎ নারায়ণ ভট্টকে প্রদান করেন। নারায়ণ ভট্ট করহাটক† গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণভট্ট ও পিতা-মহের নাম বিক্রমভট্ট। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, ৬৭৫ শকাব্দে ৮১১ সংবৎ ছিল। নিম্নে এই শাসনপত্রের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

---

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan" (1884), p. 9 and 35-36.

† কৃষ্ণা ও কোয়না নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত বর্ত্তমান কহ্লাড় নামক গ্রাম। সাহিত্য-সম্পাদক।

"আসীদ্বিষতিমিরমুদ্যতমণ্ডলাগ্রো
ধ্বস্তঃ শুচির্বিজয়কাঙ্ক্ষিগণস্তকীর্ত্তিঃ।
তস্যাত্মজো প্রথিতবীর্যকীর্ত্তিঃ
ভূপঃ কৃতিবশকৃতানুকৃতিঃ কৃতজ্ঞঃ॥ ১॥
তস্য প্রভিন্নকরটচ্যুতদানদন্তি-
দন্তপ্রহাররুচিরোল্লিখিতাংসপীঠঃ
ক্ষ্মাপঃ ক্ষিতৌ ক্ষপিতশত্রুরভূত্তনূজঃ।
সদ্রাষ্ট্রকূট-কনকাদ্রিরিবেন্দ্ররাজঃ॥ ৮॥
ধর্ম্মৌত্রিরয়সিত্মুখো রণশর্ব্বরীষু
গোবিন্দরাজ ইতি রাজসু রাজসিংহঃ॥ ২॥
মার্ত্তণ্ডহারিহরিবিক্রমনামধারী।
শ্রীকর্করাজ ইতি গোত্রমণির্বভূব॥ ৩॥
পুত্রিতাজাশুচিশ্চ তাবুত্তির্যোংশেব মাতৃতঃ।
রাজ্ঞী সোমান্বয়ী তস্য পিতৃতশ্চ শলুক্যজা॥৯॥
তস্মাদভূৎ পিতৃরিব সৌম্যতেজসি ধামোদ্‌প্রকাশিত-দিগম্বরঃ।
শ্রীদন্তিদুর্গরাজস্য স্বকুলাম্ভোজভাস্করঃ॥ ১১॥
রক্ষী-মহানদীরেবারোধোভিত্তিবিদারণং।
যোজা বিলোকয়ন্ত্যচ্ছৈঃ কৃতং যজ্জমকুঞ্জরৈঃ॥১৩॥
মাতৃভক্তিঃ প্রতিগ্রামং গ্রামলক্ষচতুষ্টয়ে।
দদতা ভূপ্রদানানি যস্য মাতা প্রকাশিতা॥১৫॥
সদ্রবিচ্ছেদমগৃহীত-বিধোতশস্ত্রং,
অজ্ঞাতমপ্রতিহিতাস্ত্রমপেতযত্নাৎ।
যো বল্লভং সপদি দণ্ডলবেন জিত্বা,
রাজাধিরাজপরমেশ্বরতামুপৈতি॥ ১৬॥
সমরে তং বিনির্জিত্য তৈলপোঽভূন্মহীপতিঃ।
চালুক্যনৃপজাহিশ্চ যথাত্রিরাজকেশরী॥ ৯॥
তস্যাত্মজঃ পরং জিষ্ণুঃ খ্যাতঃ সত্যাশ্রয়োঽভবৎ।
ক্ষিতীশ্বরঃ সত্যবুদ্ধির্বিক্রমৈকরসোর্জ্জিতঃ॥১০॥
কাঞ্চীশ-কেরলনরাধিপ-চোল-পাণ্ড্য-
শ্রীহর্ষ-বজ্রটবিভেদবিধানদক্ষং।
কর্ণাটকং বলমনন্তমজেয়রথ্যৈ,
ভৃত্যৈঃ কিয়দ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায়॥ ১৭॥

"স চ পৃথ্বীবল্লভ-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-খড়্গাধার্ক-শ্রীদন্তিদুর্গরাজদেবঃ-সর্ব্বানেব ... ... আজ্ঞাপয়তি।" *

মহারাজ দন্তিদুর্গের প্রপিতামহ গোবিন্দ সম্ভবতঃ ঐহোলির শিলা-লিপিতে চালুক্যবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গোবিন্দ চালুক্যসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন, এবং পরে চালুক্যসম্রাটের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে বাধ্য হন। গোবিন্দের পুত্র কর্করাজ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। কর্করাজের পুত্র ইন্দ্ররাজ চালুক্যবংশীয় এক রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করেন। এই রাজকুমারী মাতৃপক্ষে চন্দ্রবংশীয় রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহারই গর্ভে ইন্দ্ররাজের পুত্র দন্তিদুর্গ জন্ম লাভ করেন। দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ বল্লভকে (দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে) পরাজিত করিয়া, দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূটবংশের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কর্ণাটক, কাঞ্চী, কেরল, চোল ও পাণ্ড্যদেশীয় নরপতিগণকে পদানত করেন। শ্রীহর্ষ ও বজ্রট তাঁহার আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য হন। কলিঙ্গ, কোশল, মালব, লাট, শ্রীশৈল ও টঙ্কের নরপতিগণ তাঁহার বশীভূত হন। মহারাজ দন্তিদুর্গ মালবের রাজধানী

* Journal of Bombay R. A. S. (II. 375-376.)

উজ্জয়িনী নগরে অবস্থিতিকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যমাণিক্যাদি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করেন।

দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কর্করাজের দ্বিতীয় পুত্র। সামনগড় ও খারেপাটনের † তাম্রশাসন হইতে রাষ্ট্রকূটবংশের যে নামাবলী জানা যাইতেছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। ইহাতে রাষ্ট্রকূটবংশের পরবর্ত্তী ইতিহাস অবগত হইবার পাঠকবর্গের সুবিধা হইবে। নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আনুমানিক শাসনকালও নির্দ্দিষ্ট হইল।

দন্তিবর্ম্মন্ (৬৩৫—৫৫ খৃঃ অব্দ)
|
ইন্দ্ররাজ (১) (৬৫৫—৭৫)
|
গোবিন্দরাজ (১) (৬৭৫—৯৫)
|
কর্করাজ (১) (৬৯৫—৭১৫ খৃঃ)

ইন্দ্ররাজ (২) (৭১৫—৩৫) | কৃষ্ণরাজ (১) (=শুভতুঙ্গ) (৭৫৫—৭৫ খৃ)

দন্তিদুর্গ (৭৩৫—৫৫) | গোবিন্দরাজ (২) (৭৭৫—৮০) | ধ্রুবরাজ (=ধারাবর্ষ=নিরুপম) (৭৮০—৮০০)

(৮০০—৬০) গোবিন্দরাজ (৩) (জগৎতুঙ্গ=প্রভূতবর্ষ=পৃথ্বীবল্লভ) | ইন্দ্ররাজ (৩য়, গুর্জরাট শাখা)

(৮৬০—৮০) অমোঘবর্ষ (১) (=শর্ব) | গোবিন্দরাজ | কর্করাজ (১)

(৮৮০—৯১০) অকালবর্ষ (১) (=কৃষ্ণরাজ ২) | কর্করাজ (২)

(৯১০—২০) জগৎতুঙ্গ (২) (=[illegible]) | (১) ধ্রুবরাজ (=ধারাবর্ষ=নিরুপম)

(৯২০—২৫) ইন্দ্ররাজ (৪) | বদিগ (=অমোঘবর্ষ (৩) (৯৩৫—৪০) | কৃষ্ণরাজ (১)

অমোঘবর্ষ (২) (৯২৫—৩০) | গোবিন্দরাজ (৪) (৯২৫—৩৫) | কৃষ্ণরাজ (৩) (=অকালবর্ষ (২) (৯৪০—৫০) | খোট্টিক নিরুপম (৯৫০—৬০) | ধ্রুবরাজ (২)

কৃষ্ণরাজ (২)

কক্কল (=কর্করাজ=অমোঘবর্ষ ৪) (৯৬০—৭০)

খারেপাটনের তাম্রশাসন ১৮৪৯ খৃঃ নবেম্বর মাসে বোম্বের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর শাস্ত্রীর যত্নে ও পরিশ্রমে আবিষ্কৃত হয়। ইহা ৯৩০ শকাব্দে (১০০৮ খৃঃ) কঙ্কণের শিলাহারবংশীয় নরপতি রট্টরাজের আদেশে খোদিত হয়। ইহা

† Bombay branch of R. A. S. (1. 209-224.)

দ্বারা রট্টরাজা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শাক্তমাণ্ডী, আম্বীর ও বড়গান নামে তিনখানি গ্রাম মত্তময়ূরবংশীয় কর্করোলীর বংশধর আত্রেয়-গোত্রজ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। সান্ধিবিগ্রহিক দেবণালের পুত্র লোকপাল দ্বারা চারিখানি তাম্রপত্রে এই দানপত্র লিখিত হয়। রট্টরাজ চালুক্যপতি সত্যাশ্রয়ের অধীন মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। এই শিলাহারবংশীয় রট্টরাজের রাজধানী সম্ভবতঃ খারেপাটন বা বিজিয়াদুর্গে অবস্থিত ছিল। জীমূতকেতু এই শিলাহারবংশের আদিপুরুষ। চালুক্যসম্রাট তৈলপরাজের পুত্র সত্যাশ্রয়ের সমকালিক রট্টরাজ এই তাম্রশাসনে আপনার বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণরাজের সময়ে শণফুল্ল দ্বারা এই বংশের আধিপত্য দক্ষিণ কঙ্কণে প্রতিষ্ঠিত হয়। শণফুল্ল কৃষ্ণরাজের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। এই কৃষ্ণরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। রট্টরাজ শণফুল্লের অধস্তন দশম বংশধর। রট্টরাজ ৯৩০ শকাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় হইতে শণফুল্ল ও কৃষ্ণরাজের সময় অবধারিত হইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫।২৬ বৎসর ধরিলে, ৯ পুরুষে ২২৫।২৩৪ বৎসর রাজত্বকাল গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৯৩০ শকাব্দ রট্টরাজের রাজ্যারম্ভকাল অনুমান করিয়া, (৯৩০—২৩৪) ৬৯৬ শকাব্দ (৭৭৪ খৃঃ) শণফুল্ল ও তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণরাজের সময় অনুমিত হইতে পারে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শণফুল্ল রাষ্ট্রকূট-নরপতি প্রথম কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক ছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে রাষ্ট্রকূটেশ্বরদিগের পূর্ণ নামাবলী জানা যাইতেছে। রাষ্ট্রকূটবংশজ শেষ নরপতি কক্কলকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ তৈলপ চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। রট্টরাজ মহারাজ তৈলপের পুত্র সত্যাশ্রয়ের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটবংশ যদুবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। দন্তিদুর্গ হইতে কক্কল পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ জন নৃপতি রাষ্ট্রকূটবংশে রাজত্ব করেন। অনন্তর চালুক্যবংশের আধিপত্য মহারাজ তৈলপ দ্বারা পুনরায় স্থাপিত হয়।

"গোত্রং ভিত্বা ন ভুগ্নো ন মধুপবসতির্নো সদা ধর্মবক্রো
শক্রাদ্যা দণ্ডকোট্যা ন চ পর-পবনাকম্পিতো মাত্রহীনঃ।
যাবত্তাব্রীতমূলঃ প্রকৃতিরতিঘনা নো রণে দত্তপৃষ্ঠঃ
সাহস্তাস্থোহস্তীহ বংশো যদুকুলতিলকো রাষ্ট্রকূটেশ্বরাণাং॥ ২ ॥
তত্রাসীদন্তিদুর্গঃ প্রভুরপি চ ততঃ কৃষ্ণরাজঃ পিতৃব্য-
স্তস্মাদ্ গোবিন্দরাজস্তমনু নিরুপমোহস্যানুজস্তন্দনেঃ।

তৎপুত্রোঽভূদমোঘবর্ষো বিপুবলদহনোঽস্যাপ্যথাকালবর্ষো
মধ্যোস্যা গ্রজাতো রুচিবরবপুস্তৎসুতোঽমোঘবর্ষঃ ॥ ৩ ॥

শৃঙ্গাররসনিবাসো কন্দর্পসমূহবৃতঃ।
হরিরিব তস্য যবীয়ান্ ভ্রাতা
গোবিন্দরাজোঽভূৎ ॥ ৪ ॥

পিতৃব্যস্তস্যাসীৎ প্রণয়িজনসাকল্পবিটপী
কৃতান্তোঽরাতীনাং নয়গুণনিধি
বন্দিপো নৃপঃ।
প্রতিচ্ছন্দঃ সাক্ষাৎকৃতযুগনৃপাণাং কলিযুগে
সদাচারঃ শান্তো মুনিরিব জগত্‌কৃত্তনয়ঃ ॥ ৫ ॥

শম্ভোঃ ষড়ানন ইবাত্রিমুনেরিবেন্দুঃ
রাজ্যো যথা নন্দনস্য সুরেন্দ্রস্য জয়ন্তঃ।
তস্যাত্মজোঽপি চতুরম্বুধিমেখলায়া
ভর্ত্তা ভুবঃ সমভবৎ ভুবি কৃষ্ণরাজঃ ॥ ৬ ॥

সোঽপ্যং ক্ষিত্যা মণ্ডলযোগদুষ্টা
যাতে তস্মিংশ্চৈব সত্ত্বাবকাশং।
তস্য ভ্রাতা খোট্টিকাখ্যস্ততোঽভূৎ
পৃথ্বীভর্ত্তা ত্যাগকামোর্জ্জিতশ্রীঃ ॥ ৭ ॥

কক্কলস্তু ভ্রাতৃব্যো ভুবো ভর্ত্তা জনপ্রিয়ঃ।
আসীৎ প্রচণ্ডধামেব প্রতাপজিতশাত্রবঃ ॥ ৮ ॥"

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে খোট্টিকের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কলের উল্লেখ আছে। কিন্তু কক্কলের পিতা নিরুপমের উল্লেখ দেখা যায় না। এই কক্কলকে সমরে পরাজিত করিয়া তৈলপ ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খৃঃ) দক্ষিণাপথে চালুক্য-বংশের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি দক্ষিণাপথ হইতে রাষ্ট্রকূটবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়। সেই সময় হইতে রাষ্ট্রকূটবংশ চালুক্য-নরপতিগণের সামন্তমধ্যে পরিগণিত হয়।

সমরে তং বিনির্জিত্য তৈলপোঽভূন্মহীপতিঃ।
চালুক্যনৃপত্রাজিষ্ণু যযাতিরাজকেশরী ॥ ৯ ॥
তস্যাত্মজঃ পরং জিষ্ণুঃ খ্যাতঃ সত্যাশ্রয়োঽভবৎ।
ক্ষিতীশ্বরঃ সত্যবৃত্তির্বিক্রমৈকরসোর্জ্জিতঃ ॥ ১০ ॥

কড়াতে পূর্ব্বোল্লিখিত কক্কলের নামাঙ্কিত এক তাম্রশাসন * আবিষ্কৃত হয়। তাহা রাজা কক্কলের আদেশে ৮৯৪ শকাব্দে (৯৭২ খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহার পরবৎসর তৈলপ কর্তৃক কক্কল পরাজিত হইলে, রাষ্ট্রকূটবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথ হইতে উৎসন্ন হয়। ৭৪৮—৯৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ২২৫ বর্ষকাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় ত্রয়োদশ জন নরপতি দক্ষিণাপথে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করেন। কক্কলের পিতা নিরুপমের নাম এই তাম্রশাসনে প্রদত্ত হইয়াছে।† এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, নিঃসন্তান অবস্থায় দন্তিদুর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূটবংশের অধিকার দৃঢ়ীভূত করেন, এবং দন্তিদুর্গের আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন। তিনি শুভতুঙ্গ নামে খ্যাত হন। বরোদার তাম্রশাসন

---

* J. R. A. S. (III. 94) কর্ডে গ্রাম পুণা জিলার অন্তর্গত।—সাহিত্য-সম্পাদক।

† J. A. S. B (VIII. 292) and J. A. (XII. 162)

অনুসারে কৃষ্ণরাজ এলাপুরে এক বৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এলুরের (ইলোরার) পর্ব্বতগাত্রে এই মনোহর মন্দির 'কৈলাস' নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি রাহপ্প নামক রাজাকে জয় করিয়া, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। বরোদার শাসনপত্রে দন্তিদুর্গের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কৃষ্ণ-রাজ হইতে রাষ্ট্রকূটবংশাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণরাজের বংশধর ও প্রপৌত্র গুজরাটের রাষ্ট্রকূটনরপতি প্রথম কর্করাজের আদেশে, ৭৩৪ শকাব্দে (৮১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে কৃষ্ণরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র দন্তিরাজের নাম উল্লিখিত না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ পৈতৃক সিংহা-সনে উপবিষ্ট হন। অল্পকাল পরেই কয়েক বৎসরের মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ধ্রুবরাজ নিরুপম, ধারাবর্ষ ও কলিবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধ্রুবরাজ কাঞ্চীর পল্লবরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার নিকট বিবিধ ও বহুমূল্য হস্তী করস্বরূপ গ্রহণ করেন। চেরদেশীয় গঙ্গাবংশীয় রাজা তাঁহার পদানত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তিনি কৌশাম্বীর নরপতি বৎসরাজকে পরাজিত করেন। গৌড়দেশ-বিজয়ের পর বৎসরাজ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়বিজয়ের দ্বারা যে দুইটি রাজছত্র বৎসরাজের হস্তগত হয়, বিজয়ী ধ্রুবরাজ তাহা গ্রহণ করেন। বৎস-রাজ মাড়োয়ারের দুর্গম মরুভূমির অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কৌশাম্বী বর্ত্তমান কালে কোশম নামে পরিচিত ও আলাহাবাদের সন্নিধানে অবস্থিত। অনুমান ৭৭০—৭৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই বৎসরাজ কনোজে রাজত্ব করেন। কৌশাম্বী ও বারাণসী সেই সময়ে কনোজের পদানত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। খাররপাটনের তাম্রশাসনে ধ্রুবরাজ 'নিরুপম' নামে পরিচিত হইয়াছেন। নিরুপম ধ্রুবরাজের রাজত্বকালে পট্টদকলে এক প্রস্তর-লিপি * খোদিত হয়। তাহাতে তিনি ধারাবর্ষ ও কলিবল্লভ নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

ধ্রুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দরাজ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য সবিশেষ প্রসারিত হয়। তাঁহার আদেশে ৭২৯ শকাব্দে (৮০৭ খৃঃ) বণীডিণ্ডোরীর ও ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃঃ) রাধনপুরের শাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়। † এই দুই শাসনপত্র

---

* I. A. (XI. 125)

† J. R. A. S. (V.) aud Indian Antiquery (VI. 65)

ময়ূরখণ্ডী হইতে প্রদত্ত হয়। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ময়ূরখণ্ডী তাঁহার রাজধানী ছিল। মোরখণ্ডের পার্ব্বত্য দুর্গ এখন নাসিক জিলায় অবস্থিত। এই দুই শাসনপত্রে ধ্রুবরাজের পূর্ব্বোক্ত অবদানপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। ধ্রুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজের নাম ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। ধ্রুবরাজ উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভারসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যুবরাজ তাহাতে অসম্মত হন। তিনি জগত্তুঙ্গ, জগৎরুদ্র, প্রভূতবর্ষ, পৃথ্বীবল্লভ ও শ্রীবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর চেরদেশীয় গঙ্গাবংশজ রাজাকে কারামুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে উক্ত চেররাজ গোবিন্দরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া, পুনরায় পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন। রাজপদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, মহারাজ গোবিন্দের বিরুদ্ধে দ্বাদশ জন নরপতি সম্মিলিত হইয়া রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। গোবিন্দ একাকী তাঁহাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও তাঁহাদের একতা ভঙ্গ করেন। গুজরাটের নরপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া পলায়ন করেন। মাহী ও তাপ্তি নদীর মধ্যবর্ত্তী লাটদেশের শাসনকার্য্যে গোবিন্দরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে নিযুক্ত করেন। এই ইন্দ্ররাজের দ্বারা রাষ্ট্রকূটবংশের এক শাখা গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাটদেশের অধীশ্বর এই ইন্দ্ররাজের পুত্র কর্করাজ ও গোবিন্দরাজের প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন বরোদা ও কাবী নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরোদার শাসনপত্র ৭৩৪ শকাব্দে (৮১২ খৃঃ) কর্করাজের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। কাবীর শাসনলিপি কর্করাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরাজের আদেশে ৭৪৯ শকাব্দে (৮২৭ খ্রীঃ) খোদিত হয়। *

গুজরাট অধিকারের পর, তৃতীয় গোবিন্দরাজ মালবের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মালবরাজ বিনা যুদ্ধে তাঁহার পদানত হন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা মারাশর্ব্ব বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। শ্রীভবনে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক কাঞ্চীর দন্তিগ নামক পল্লবরাজকে পদানত করেন। চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজ কাঞ্চী নগরে আগমন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীদেশে এইরূপে বিনা রক্তপাতে গোবিন্দরাজের আধিপত্য প্রসারিত হয়। এই

* J. A. S. Bengal VIII 298; and I. A. V. 147.

দিগ্বিজয়ের পর উত্তরে মালব, দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে গোবিন্দ-রাজের অধিকার বিস্তারিত হয়। নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিতিকালে, গোবিন্দরাজ শিবধারীকে রামেশ্বর নামক পবিত্র স্থানে কিছু ভূমি প্রদান করেন। ৭২৬ শকাব্দে (৮০৪ খৃঃ) ইহার দানপত্র উৎকীর্ণ হয়। * তৃতীয় গোবিন্দরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি শর্ব্বদেব নামে পরিচিত ছিলেন। † মান্যখেট তাঁহার রাজধানী ছিল; কর্ডার শাসনপত্র দৃষ্টে এরূপ বোধ হয়। মান্য-খেট এক্ষণে মালখেড় নামে পরিচিত ও নিজামরাজ্যে অবস্থিত। শর্ব্ব চালুক্যবংশীয় বেঙ্গারাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শিলাহারবংশীয় পুল্ল-শক্তি এই অমোঘবর্ষের অধীনে কঙ্কণের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ৭৭৫ শকাব্দের (৮৫৩ খৃঃ) খোদিত পুল্লশক্তির নামাঙ্কিত এক শিলালিপি কাহ্নেরির গিরিগহ্বরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য দুইখানি শিলালিপি পুল্লশক্তির পুত্র কপর্দ্দীর আদেশে ৭৯৯ শকাব্দে (৮৭৭ খৃঃ) অমোঘবর্ষের রাজত্বকালের ৬৩ তম বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। ‡ জৈনাচার্য্য গুণভদ্র স্থরি জিনসেন স্থরির শিষ্য ছিলেন। গুণভদ্র 'মহাপুরাণ' নামক জৈন পুরাণের শেষভাগে অমোঘ-বর্ষকে § জিনসেনের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

---

* J. A. Xi. 126.

† J. A. Xii. 183.

‡ J. A. Xiii. 133 And J. Bombay R. A. S. (V1. Xiii. 11.).

§ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, "এই নৃপতির অপর নাম নৃপতুঙ্গ। বীরাচার্য্যকৃত "সারসংগ্রহ" নামক গণিতবিষয়ক জৈনগ্রন্থে নৃপতুঙ্গ অমোঘবর্ষকে জৈনদিগের "স্যাদ্বাদ" নামক পন্থের অনুযায়ী বলা হইয়াছে। এই নরপতি বৃদ্ধবয়সে রত্নমালিকা নামে এক গ্রন্থরচনা করেন, দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

বিবেকাত্যক্ত-রাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলঙ্কৃতিঃ।

তিব্বতীয় ভাষাতে এই রত্নমালিকার অনুবাদ হইয়াছে।—"সাহিত্য"-সম্পাদক।

"যস্য প্রাংশুনখাংশু-জালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎপাদাম্ভোজরজঃপিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
স স্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং স শ্রীমান জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলং॥

এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ জিনসেনের দ্বারা ও অবশিষ্টাংশ গুণভদ্র দ্বারা রচিত হয়। ৮২০ শকাব্দে (৮৯৮ খৃঃ) এই গ্রন্থ অকালবর্ষের রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়। মহাপুরাণ,—

> অকালবর্ষভূপালে পালয়ত্যখিলাং মহীং।
> তস্মিন্ বিধ্বস্তনিঃশেষদ্বিষি ধর্ম্মে গোজুষি॥
> *　*　*　*　*
> শকনৃপকালাভ্যন্তরবিংশত্যধিকাষ্টশতমিতাব্দান্তে।
> মঙ্গলমহার্থকারিণি পিঙ্গলনামনি সমস্তজনসুখদে॥"

এই অকালবর্ষ অমোঘবর্ষের পর পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হন।

খারেপাটনের শাসনপত্রে যিনি অকালবর্ষ নামে পরিচিত, তিনি কর্ডার তাম্রশাসনে কৃষ্ণরাজ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ কক্কলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের জগত্তুঙ্গ বা জগৎরুদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। এই দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের অধীন সামন্তরাজ পৃথ্বীরাম সৌনদত্তি নামক স্থানে এক জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৭৯৭ শকাব্দে (৮৭৫ খৃঃ) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ধারবাড় জিলার অন্তর্গত মুলগুন্দ নামক স্থানে এই কৃষ্ণবল্লভের রাজত্বকালে ৮২৪ শকাব্দে (৯০২ খৃঃ) আর একটি জৈনমন্দির নির্ম্মিত হয়। চিকার্য্য নামে জৈন বণিক কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। * কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত তিনখানি তাম্রশাসন গুজরাটের অন্তর্গত কাপড্বনজ নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৩২ শকাব্দে (৯১০ খৃঃ) বৈশাখী পূর্ণিমায় কুলপুত্রক অগ্নিমহ দ্বারা উৎকীর্ণ হয়। ... অধান হর্ষপুরের মহাসামন্ত প্রচণ্ডের ভ্রাতা অকুব ও তাঁহার ... নাম এই দানপত্রের শেষভাগে লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে ... দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ (অকালবর্ষ) ব্যাঘ্রাস নামে গ্রাম ... নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। হর্ষপুর প্রদেশে ৭৫০খানি গ্রাম মহাসামন্ত প্রচণ্ডের শাসনাধীন ছিল। রাষ্ট্রকূট নরপতি কৃষ্ণরাজ বৈষ্ণব ছিলেন। এই শাসনপত্রে গরুড়ের মূর্ত্তি দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাঁহারা পুরুষপরম্পরায় বৈষ্ণব ছিলেন। কৃষ্ণরাজ, ধ্রুবরাজ, গোবিন্দরাজ ও

---

* J. B. B. R. A. S. (X. 192, 203) and Epigraphia Indica (I. 52).

খড়গরাজ অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় মাতুল চেদিরাজ শঙ্করগণের কুমারী লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কড়ার শাসনপত্রের শঙ্করগণ সাঙ্গলীর দানপত্রে রূপবিগ্রহ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হৈহয়বংশীয়া এই রাজকুমারীর গর্ভে দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গের পুত্র তৃতীয় ইন্দ্রবাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্ররাজ হৈহয়বংশীয়া রাজকুমারী অম্বার পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ কোক্কল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্জ্জুনদেব। শঙ্করগণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই অর্জ্জুনদেবের পুত্র অঙ্গনদেব। ইন্দ্ররাজের পত্নী অম্বা এই অঙ্গনদেবের দুহিতা ছিলেন। রাজমহিষী অম্বার গর্ভে ইন্দ্ররাজের দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠের নাম অমোঘবর্ষ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোবিন্দ।

ইন্দ্ররাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অমোঘবর্ষ পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চতুর্থ গোবিন্দরাজ এক বৎসর কাল পরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। গোবিন্দরাজ সাহসাঙ্ক ও সুবর্ণবর্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতি দানশীল ছিলেন। তিনি বহুতর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মান্যখেটে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মান্যখেট হইতে ৮৫৫ শকাব্দে (৯৩৩ খ্রীঃ) সাঙ্গলীর দানপত্র প্রকাশিত হয়। * সাঙ্গলীর তাম্রশাসনে গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমোঘবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

চতুর্থ গোবিন্দরাজের পর তাঁহার পিতৃব্য বদ্দিগ তৃতীয় অমোঘবর্ষ নামধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বদ্দিগ জগত্তুঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র ও ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তৃতীয় অমোঘবর্ষের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় কৃষ্ণরাজ রাজপদ লাভ করেন। এই কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত এক শাসনপত্র সালোটগি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৬৭ শকাব্দে (৯৪৫ খ্রীঃ) মান্যখেট হইতে কৃষ্ণরাজের আদেশে প্রচারিত হয়। † এই কৃষ্ণরাজের নামান্তর কন্নরদেব। তক্কোল নামক স্থানে চোল নরপতি রাজাদিত্য এই কৃষ্ণরাজের সহিত সমরে পরাজিত ও নিহত হন। গাঙ্গবংশীয় পরমান্দীবুটুগ গঙ্গবাড়ী দেশের রাজা রাজমল্লকে সমরে নিহত করিয়া তৃতীয় কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক বনবাসী প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। বনবাসী

* I. bombay R. A. S. IV. III.

† I. A. I. 205.

একণে উত্তর কানাড়া জিলায় অবস্থিত। এই পয়মান্দীবুটুগ আটুকুর গ্রামে কিছু ভূমি চন্দ্রেশ্বর শিবের পূজার্চ্চনানির্ব্বাহার্থ, ৮৭২ শকাব্দে (৯৫০ খ্রীঃ) প্রদান করেন। আটুকুর মহীশূর প্রদেশে অবস্থিত, এবং আটগড় নামে একণে পরিচিত। * ইহাতে কৃষ্ণরাজ অমোঘবর্ষের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণরাজের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খোটিকদেব রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি অমোঘবর্ষের পত্নী কন্দকদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্দক-দেবী চেদিরাজ যুবরাজদেবের তনয়া। খোটিকদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কলদেব রাজাসনে আসীন হন। তাঁহার পিতার নাম নিরুপম। কক্কলদেব রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ নরপতি। ৮৯৪ শকাব্দে (৯৭২ খ্রীঃ) কর্দা শাসনপত্র এই কক্কলদেবের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খ্রীঃ) এই কক্কলদেবকে সমরে পরাজিত করিয়া, তৈলপরাজ চালুক্যবংশের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাষ্ট্রকূটনরপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া খারেপাটনের শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। রাষ্ট্রকূট-নরপতিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন চালুক্যবংশীয় ভূপালদিগের ন্যায় আপনাদিগকে 'পৃথ্বীবল্লভ' ও 'বল্লভ-নরেন্দ্র' নামে পরিচিত করিয়াছেন। লক্ষ্মেশ্বরের শাসনপত্রে তৃতীয় † গোবিন্দরাজ 'শ্রীবল্লভ' ও রাধনপুরের শাসনপত্রে 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সাঙ্গলীর শাসনপত্রে চতুর্থ গোবিন্দ ও কর্দার শাসনপত্রে কক্কল-দেব 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লভনরেন্দ্র ও বল্লভরাজ পদ একার্থ-প্রতিপাদক। 'বল্লভরাজ' পদ প্রাকৃতে 'বল্লভরায়', 'বল্লহরায়' ও 'বল্লরায়' শব্দে কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মান্যখেট রাষ্ট্রকূট-নরপতিদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিক-গণ মানকিরের 'বলহরা' নামে রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতিগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হলায়ুধ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বরচিত "কবিরহস্য" নামক কাব্যে রাষ্ট্রকূট-বংশ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের অবদানাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* Epigrafica Indica II. 167.

† এই গ্রাম ধারবাড় জিলায় মিরাজ-নগরের সন্নিহিত। "সাহিত্য"-সম্পাদক।

অত্যাগস্ত্যমুনিজ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।
কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজা সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥
সোমং সুনোতি যজ্ঞেষু সোমবংশবিভূষণঃ।
তোলয়ত্যতুলং শক্ত্যা যো ভারং ভুবনেশ্বরঃ।
কস্তং তুলয়তি স্থাম্না রাষ্ট্রকূটকুলোত্তমং॥—কবিরহস্য।

এই কৃষ্ণরাজকে বিজয়নগরের অধীশ্বর কৃষ্ণরায় বলিয়া ডাক্তার ওয়েষ্টারগার্ড ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটনরপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে সমাপ্ত করা গেল। ভবিষ্যতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশের বিবরণ সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া, পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

থ্যাকারে।

থ্যাকারের কন্যা শ্রীমতী রিচি পিতার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তদুপলক্ষে নানা পত্রে সেই চিরমধুময় উপন্যাসিক ও পরিহাসরসিকের সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয়, এ সময়ে সেই সকল প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া থ্যাকারের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

ডিকেন্স ও থ্যাকারে।

থ্যাকারের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ডিকেন্সই তাঁহার প্রধান ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে পাঠকসমাজে ডিকেন্সেরই আদর অধিক ছিল। এখন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থ্যাকারের আদর বাড়িতেছে। এখন ডিকেন্সের যশের ভরা গাঙ্গে ভাঁটা পড়িয়াছে; আর থ্যাকারের যশের মরা গাঙ্গে পুরা জোয়ার প্রবেশ করিয়াছে।

জীবনচরিতের আতঙ্ক।

থ্যাকারের ইচ্ছাক্রমে আজিও তাঁহার কোনও পুরা জীবনচরিত রচিত হয় নাই। অপর[illegible] বিষয় লিখিবার সময় তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; কিন্তু কেহ তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবে ভাবিলে, তিনি ভীত হইতেন। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা।

বংশবৃত্তান্ত।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই কলিকাতা সহরে থ্যাকারের জন্ম হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে থ্যাকারে বংশ এ দেশে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। উপন্যাসিকের পিতামহ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসেন। সার উইলিয়ম হণ্টার বলেন যে, তিনি পুরাতন কাগজপত্রে তাঁহার চারি পুত্রের ও অন্ততঃ চতুর্[illegible] পৌত্রের ও দৌহিত্রের উল্লেখ দেখিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে, পিতামহ থ্যাকারের পাঁচ পুত্র; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন [illegible] বিভাগে প্রবেশ করিয়া নেপালযুদ্ধে নিহত হয়েন। আর সকলেই সিভিল বিভাগে [illegible]। পুরাতন দ[illegible]

পানা সন্ধান করিলে, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূল হইতে উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই থ্যাকারে-বংশীয়দিগের [illegible] পাওয়া যায়।

পাঁচ বৎসর বয়সে থ্যাকারে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েন। এত অল্প বয়সে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার উপর তদীয় জননীর প্রভাবের হ্রাস হয় নাই; হণ্টার বলেন,—"Divided by half the world he clung to her memory." যদিও থ্যাকারে আর এ দেশে আসেন নাই, তথাপি তাঁহার বহু গ্রন্থ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্রে পূর্ণ। কিপ্‌লিং ব্যতীত আর কোন ইংরাজ লেখকের পুস্তকে এত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র লক্ষিত হয় না। সেড্‌লী, কর্ণেল নিউকাম, মেবেরী প্রভৃতি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র, থ্যাকারের আত্মীয় বা বন্ধুবর্গের আদর্শে চিত্রিত। তখন ইংলণ্ডে একটা উপকথা প্রচলিত ছিল যে, ভারতবর্ষে প্যাগোডা নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহা নাড়িলেই মোহর পড়ে, একবার ডাল নাড়িয়া তার পর কুড়াইয়া লইলেই হইল। ভারতপ্রত্যাগত "নবাব" নামে আখ্যাত ইংরাজদিগের ঐশ্বর্য্যাতিশয্য হইতেই এই উপকথার উৎপত্তি। কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা সত্য; ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষ তখন "লুটের বিলেত" ছিল; সাধু অসাধু বিবিধ উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে গিয়া "নবাব" সাজাই তখন ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র থ্যাকারের বর্ণনায় যেমন ফুটিয়াছে, কোন ঐতিহাসিকের রচনায় তেমন ফুটে নাই। তাঁহার রচিত O'Dowd পত্নী, ব্রাণ্ডিপানিপায়ী Sedley, রমণলাল প্রভৃতি চিত্র অমর। শুনিতে পাই, রমণলাল চরিত্রের আদর্শ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, কর্ণেল নিউকাম চরিত্রের আদর্শ তাঁহার জননীর দ্বিতীয় স্বামী মেজর কারমাইকেল স্মিথ। Union Bank of Calcutta দেউলিয়া হওয়ায় থ্যাকারে পরিবারের অনেকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, থ্যাকারের পৈতৃক অর্থ যাহা কিছু ছিল, তাহাও যায়; থ্যাকারের পুস্তকে এই ব্যাঙ্কই বুন্দেলখণ্ড ব্যাঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রভাব।

রচনার বিষয়।

কিছু দিন স্কুলে অধ্যয়নের পর থ্যাকারে কেম্ব্রিজে গিয়া ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিলাভ ঘটে নাই। কলেজ ছাড়িয়া তিনি কিছু দিন আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বলা বাহুল্য, আইন-ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য প্যারিসে ও [illegible] প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার মনে সংবাদপত্রসেবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। [illegible] বিবাহ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে "ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিন" পত্রে তাঁহার [illegible] পুস্তক Yellow Plush Correspondence প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় [illegible] পুস্তকাকারে প্রথমে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক [illegible] যায় পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে বার্ষিক পাঁচ শত পাউণ্ড আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া [illegible] এই ঘটনা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইলেও, সাহিত্যজগতের পক্ষে বিশেষ [illegible] স্বরূপ পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, থ্যাকারে [illegible] স্বরূপ [illegible] সম্পন্ন [illegible] লোক ছিলেন, তাহাতে উদরান্নের জন্য সাহিত্যসেবা করিতে না [illegible], [illegible] বোধ হয়, কখনও সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বাবধি [illegible] সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ ছিল, এখন কষ্টে পড়িয়া তিনি সাহিত্যই অবলম্বন [illegible] করিলেন।

জীবনযুদ্ধ ও সাহিত্যসেবা।

"টাইম্‌স্‌" পত্রে থ্যাকারের হাতেখড়ি ; কিন্তু "পঞ্চই" চিরদিন তাঁহার প্রিয় পত্র ; পঞ্চেই তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থ্যাকারের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই মাসিক খণ্ডের আকারে Vanity Fair আরম্ভ হয়। ভ্যানিটি ফেয়ার প্রকাশিত হইবার পরই থ্যাকারের যশ প্রায় ডিকেন্সের যশের সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর ক্রমে দুই দুই বৎসর অন্তর Pendennis, Esmond, The Newcomes প্রকাশিত হয়। Esomond একেবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর দুইখানি মাসিকপত্রে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি কিছু দিন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ রসিকদিগের সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাও—The Four Georges কখনও অনাদৃত হইবে না। যে দেশে ভাল পুস্তকও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়, সে দেশের লোককে কেমন করিয়া বুঝাইব যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়াও উপযুক্ত লোকের যথেষ্ট অর্থাগম হয় ?

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসেবা পরিহার করিয়া তিনি উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া পুনশ্চ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া The Virginians প্রকাশ করেন। প্রায় ২৩ বৎসর সম্পাদনের পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি Cornhill Magazine পত্রের ভার পরিত্যাগ করেন। থ্যাকারের প্রথম কবিতা পাওয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম,—

রাজনীতি, সাহিত্য ও সংবাদপত্র।

মটন চপের মতন প্রণয়
করিতে শীতল হন ;
সব আকর্ষণ হয় ব্যথাময়
না হতেই পুরাতন।
স্নিগ্ধ বেদনার মতন প্রণয়,
তারে সহা, হায়, সহজ ত নয় !
ভ্র্যাণ্ডি-ব্যবহারে দু'বাথাই সারে—
এমন করি শ্রবণ।

যবে কোন কৃষী রমণীর তরে
প্রেমানলে মরে জ্বলে,
বাঁধিতে তখন চাহে সে তাহারে
পরিণয়-শৃঙ্খলে ,
সুবিধা পেলেই বিবাহটা করে
হায়, হতভাগ্য লাফাইয়া পড়ে
কটাহ ছাড়িয়া শেষে যাইয়া
উনানে দীপ্ত অনলে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে থ্যাকারের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ থ্যাকারেকে হৃদয়হীন Cynic বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু দিবস পরে ডিস্রেলী স্বীয় St. Barbe পুস্তকে বলিয়াছেন, থ্যাকারে Pushing, উগ্রহৃদয় ও নীচমনা ছিলেন। এ বর্ণনা সেই নীচমনা ইহুদীরই উপযুক্ত , তিনি বোধ করি, সকলকেই আপনার মত ভাবিতেন। তাঁহার নীচতার বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদের নাই ; যাঁহারা সে বিবরণ দেখিতে চাহেন, তাহাদিগকে ওকনরের ডিস্রেলী-চরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। থ্যাকারে যত দিন করনহিল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন দুঃখী ও অক্ষম লেখকদিগের রচনা পত্রস্থ করিতে না পারিলেও আপনি তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতেন। ইহাই কি হৃদয়হীনের নীচতা ?

চরিত্র-বিচার।

কেহ কেহ বলেন, থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী নহে। যদি মানবচরিত্রের নিখুঁত খাঁটি বর্ণনা স্ত্রীলোকের পাঠ্য না হয়, তবেই থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠের অনুপযোগী ;—নহিলে নহে।

থ্যাকারের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস—Vanity Fair, আর সেই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান চরিত্র—বেকি সার্প। থ্যাকারের তুলিকায় সে চিত্র যেমন ফুটিয়াছে, কোনও উপন্যাসিকের তুলি-

কার কোনও চরিত্র তেমন ফুটিয়াছে কি না সন্দেহ। সমালোচক ফ্রেডরিক হ্যারিসন্ বলেন যে, বেকি সার্প চরিত্র যদি ক্লিওপেট্রা ও লাইলক চরিত্রের মত না হয়, তথাপি কোয়ার ওয়েষ্টর্ন্, টোবী ও স্যাম্ ওয়েলারের চরিত্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উপন্যাসজগতে কোনও চরিত্রেরই বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হয় নাই। বেকি সার্পের বুদ্ধির প্রাখর্য্য, রসিকতা, স্বার্থপরতা, অসীম সাহস, ধূর্ত্ততা, স্থির ও কর্ম্মশীল মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, যেখানে তাহার স্বার্থে আঘাত না লাগে,

বেকি সার্প।

সেখানে তাহার সুবিচারপ্রিয়তা ও যেখানে কোনও ক্ষতি নাই, সেখানে তাহার সততা, অতুলনীয় ও অনুকরণের অতীত।

Esmond ও The Newcomesএর গ্রন্থকার কথনই Misanthrope হইতে পারেন না। ইংরাজ পরিহাসরসিকদিগের সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় তিনি সদাই সরল ও সদানন্দ। থ্যাকারের ন্যায় বন্ধুবৎসল লোক কখনই cynic ও misanthrope হইতে পারে না। আজ থ্যাকারের কুৎসাকারীরা বিস্মৃতির কোন অতল তলে চিরান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর থ্যাকারের যশঃসূর্য্য সাহিত্যগগনে পূর্ণমহিমায় বিরাজ করিতেছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তিব্বত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Abbe Huc. চীন ও তিব্বতের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়েল্বি ও তাঁহার সহযাত্রী লেফ্টেনাণ্ট মাল্কম্ "অজ্ঞাত" তিব্বতের মধ্য দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৮০ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই সঙ্কটসঙ্কুল কষ্টসাধ্য ভ্রমণ ন্যানসেনের মেরুভ্রমণের সহিত তুলিত হইতে পারে। সচরাচর ভ্রমণকারীরা আপনাদের ঈপ্সিতসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; কিন্তু এই দুই জন সর্ব্বতোভাবে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প ছিল যে, মধ্য এসিয়া উপত্যকাভূমির পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া, আধুনিক মানচিত্রে 'অজ্ঞাত'-চিহ্নিত দেশে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিয়া, সৈদাম পার হইয়া, হোয়াংহো নদী বাহিয়া, চীনের বিখ্যাত প্রাচীর পার হইয়া, "স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে"র রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন। শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্য, অনাহার ও পানীয়শূন্য মানববসতিবিরল পথের সহস্র বাধা বিপত্তি সত্বেও, ইংরাজ সৈন্যের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা ও প্রফুল্লতা সহকারে ইঁহারা অভিলষিতলাভে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে, লে নগর হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া যাত্রা করেন, এবং ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে পিকিনে উপস্থিত হয়েন।

তাঁহারা ভারবহনের জন্য বাইশটি কষ্টসহ অশ্বতর ও আরোহণের জন্য সতেরটি পোনি ঘোড়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। পরিচর্য্যা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য নয় জন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওয়েল্বি ও মাল্কাম্ ব্যতীত বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেণ্টের "নন্‌কমিশণ্ড অফিসার" সাহাদর্মীর ভ্রমণকারীদিগের সঙ্গে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ বিপদবহুল পথে তিনি ইঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিলেন। অশ্বতরচালকেরা প্রথম হইতেই অবিশ্বাসী ও অবাধ্য হইয়াছিল। অনুচরবর্গের মধ্যে লাডো ও ইসা জামের (যাহাকে সংক্ষেপতঃ ইস্থ বলিয়া ডাকা হইত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ছিল। তাহারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-

প্রণোদিত হইয়া এরূপ হইয়াছিল, তাহা নহে—যাত্রার প্রথম হইতেই দলের অন্যান্য পরিচারকদিগের সহিত তাহাদের মতান্তর হওয়াতেই তাহারা বিরক্ত ও প্রভুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

সে হইতে যাত্রা করিয়া ভ্রমণকারীরা প্রথমে উত্তর তিব্বতের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন; পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় পঁহুছিয়া উত্তরপূর্ব্ব দিকে চলিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণের প্রথম দুই মাস তাঁহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ কোন কষ্ট পান নাই। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভ্রমণের এই অংশের বর্ণনা এইরূপ ;—"পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমাদিগের পরিহিত বসন স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিত; সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয়। অবশেষে আমরা জামা খুলিয়া অনাবৃতগাত্রে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একটু বাতাস পাইব, এই আশায় বহুক্ষণ ধরিয়া পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া থাকিতাম। চারি দিকে স্তূপাকার বরফ, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের পিপাসাশান্তির বড় সুবিধা হইত না। আমাদিগের পথ বড় কষ্টকর। অনেক সময়ে ঠিক সরলভাবে পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে হইত। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৭০০০ ফিট। দলের সকলের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা পর্ব্বতের অপর দিকে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সহসা অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে উপস্থিত হইলাম। তুষারবৃষ্টি হইতে লাগিল। শীতল বাতাসে আমাদের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে পর্ব্বতগাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেখানে এত অধিক শীত বোধ হইতে লাগিল যে, তুষারবৃষ্টি সহ্য করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই ভাল বোধ করিলাম। * * * তাম্বু ফেলিবার উপযোগী স্থান দেখিতে পাইয়া আর অগ্রসর হইলাম না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। শীত আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আমাদের অনুচরবর্গের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তাহাদিগকে আমাদের অবস্থান-স্থান জানাইবার জন্য রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম। অবশেষে দূরে জনকলরব শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অশ্বতরগুলির মধ্যে কতকগুলি বেশ সুস্থ ও সবল ছিল, কিন্তু অন্যগুলি অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পথিমধ্যে ছয়টি অশ্বতর একেবারে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; তখন তাহাদিগকে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।"

প্রথম প্রথম পর্ব্বতীয়েরা তাঁহাদের ভ্রমণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। সুশাল নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের দলপতি বলিল, তাহারা পরবর্ত্তী গ্রাম "পাল"এ যাইবার রাস্তা জানে না; এমন কি, সে গ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অনেক বাদানুবাদের পর বলিল, সে পথ একবারে অগম্য। পরে এক দল সশস্ত্র লোক আসিয়া পথপ্রদর্শক ইসুকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল ও ভ্রমণকারীদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে, অগ্রসর হইলেই বিপদ ঘটিবে। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটি বাঁক ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ত্রেব হ্রদের নিকট তাঁহাদিগের গমনে বাধা দিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক লোক জমা হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান অস্ত্র পুরাতন প্রথায় নির্ম্মিত বন্দুক। কিন্তু সেগুলি একটি দণ্ডের উপর রাখিয়া তাহারা অব্যর্থসন্ধানে গুলি ছুড়িতে পারে। তাহারা শ্বেতকায়দিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল। কাপ্তেন ওয়েলবির অশ্বতরচালকেরা এই সময়ে ভীরুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। যদিও তাহাদিগকে গুলি ও বারুদ দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজেই পরাভূত হইল। বাধাপ্রদানকারীরাও মরিয়া হইয়াছিল। তাহাদের

বীরত্বের ও সাহসের দৃষ্টান্তে কাপ্তেন ওয়েল্‌বি লিখিয়াছেন,—"কয়েক হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া একটি লোকের বক্ষের উপর গুলি-ভরা রিভলবার ধরিলে সে আপনার জামা ছিঁড়িয়া অনাবৃত বক্ষ দেখাইয়া গুলি ছুড়িতে বলে। ইহাতে আমার বোধ হইয়াছিল, এরূপ দৃঢ় বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা কোনও ক্রমে ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। এই সকল তিব্বতীয়দিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা না করিয়া অগ্রসর হইবার আর কোনও উপায় ছিল না; কিন্তু নরহননের জন্য আমরা তথায় উপস্থিত হই নাই, সুতরাং নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

এই প্রতিবন্ধকের জন্য ভ্রমণকারীরা পুনরায় নাপুলী পার হইয়া ভ্রেব হ্রদের পূর্ব্বতীর বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে যাত্রা করিবার পর তাঁহারা আর কোনও বাধা পান নাই। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের যে মেষের দল ছিল,পথশ্রমে তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন কি, অনেকগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু ভারবাহী জীবগুলির মৃত্যু হওয়াতেই তাঁহাদিগকে অত্যধিক কষ্ট পাইতে হয়; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি তুষারপাতে মারা যায়। অবশেষে যখন তাঁহারা "ভারহারী" হ্রদের তীর উপস্থিত হইলেন, তখন সর্ব্বশুদ্ধ আটাইশটিমাত্র জীবিত ছিল। এই হ্রদের তীরে তাঁহাদিগকে অনেক বোঝা ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া হ্রদের উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। এত কষ্টেও একটি ছাগ জীবিত ছিল। ছাগটি ভ্রমণকারীদের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সেটিকে সঙ্গে লইয়া চীনদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরূপ—একদিন তাঁহাদের দুই জন পরিচারক একটি গুলি-পোরা বন্দুক লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল; এমন সময় সহসা গুলি বাহির হইয়া যায়। ঐ গুলিতে মন্নুনামক পরিচারকের মুখের নিম্নাংশ উড়িয়া যায়। তখন উক্ত ছাগটিকে মারিয়া তাহার মাংসের সুপ করিয়া এই হতভাগ্যের মুখে ঢালিয়া দিতে হয়। শীঘ্র তাহার মৃত্যু না হওয়ায়, অবশেষে তাহাকে একটি পোনির পৃষ্ঠে কোন রূপে বহন করিয়া ভ্রমণকারীরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে সুস্বাদুজলপূর্ণ একটি নালার নিকট উপস্থিত হইলে, মন্নু ও অপর একজন পরিচারক কোনমতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। নিকটেই লোকালয় আছে ভাবিয়া, ভ্রমণকারীরা তাহাদের নিকট কয় দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, লোকালয়ে পঁহুছিয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু লোকালয়ের কোনও চিহ্ন না পাইয়া, তাঁহারা স্থানে স্থানে অনুচরদ্বয়ের জন্য খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তখন ভারবাহী জন্তুগণের মধ্যে পনেরটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এইগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুশ্রীকার ছিল, সেটি শীতল জলে সাঁতার দিয়া মৃতপ্রায় হয়। ভ্রমণকারীরা আপনাদিগের জামা খুলিয়া তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন। এইরূপে অনেক কষ্টে সেটি বাঁচিয়া উঠে।

এই সময়ে ভ্রমণকারীরা শিকার করিয়া প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান করিতেন। এই প্রদেশের বন্য পশুই অনেক সময় তাঁহাদের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ করিত। শিকারলব্ধ জন্তুগণের মধ্যে য়্যাক, এণ্টিলোপ-জাতীয় হরিণ, কুরঙ্গ ও খরগোষ, মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভালুকও মিলিত। বন্য য়্যাকের মাংস খাইতে মন্দ নহে। এণ্টিলোপ ও বানরের মাংসও তাঁহাদের অতি সুস্বাদু বোধ হইয়াছিল। লোকে বলে, বন্য য়্যাক আহত হইলে শিকারীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও সে বিপদে পড়িতে হয় নাই। তাঁহারা য়্যাকের চর্ব্বির পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। সময় সময়

তাহাই আহার করা হইত। প্রাণী সকল মহম্মদীয় প্রথায় জবাই করা হইত না বলিয়া অনেকে মাংসাহারে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত এ আপত্তি অধিক দিন টিকে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনুচরগণের মধ্যে অনেকে প্রথম হইতেই অবাধ্য ছিল। মহম্মদ রহিম-নামক একজন অশ্বতর-চালককে পথ খুঁজিতে পাঠান হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ন্যায় দীর্ঘকায় বলবান লোককে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়াছিল। অবশেষে সে অনেক ফোঁপাইয়া বলিল, "আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" গোলাম হোসেনের অধীনস্থ লোকেরা একদিন দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহারা দিন কয়েক ভ্রমণকারীদের কাছে কাছে ছিল, ভাবিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু পাছে তাহারা অবশিষ্ট অশ্বতরগুলি চুরি করে, এই ভয়ে ভ্রমণকারীরা আর তাহাদিগকে দলভুক্ত করেন নাই। ইতিপূর্ব্বেই অশ্বতর ও পোনির সংখ্যা একুনে পনেরটি মাত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে বিষাক্ত গুল্ম খাইয়া তিনটি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি মরিয়া যায়। এই সময়ে ভারবাহী জন্তুর অভাবে ভ্রমণকারীরা বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অন্য কোনও জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শীত ও গ্রীষ্মের দুর্ব্বিবহ আতিশয্যবশতঃ এই সকল স্থানের ভূমি অনুর্ব্বর ও জনবসতি বিরল। পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় তিব্বতদেশীয় বণিকদলের সহিত ভ্রমণকারীদের সাক্ষাৎ হয়। লেখক বলিতেছেন, তাহাদের দলপতি দেখিতে অতি সুন্দর ও সুদীর্ঘকায়—উচ্চে প্রায় ছয় ফিটেরও অধিক। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকায় লোক আমরা এ দেশে দেখি নাই। দলের মধ্যে সে কুসক নামে পরিচিত। তাহার যথার্থ নাম জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে বৃদ্ধগণ জীবিতাবস্থায় এই নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এখন ইহা কেবলমাত্র স্নেহ ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কুসকের দলে পণ্যদ্রব্যবাহিগণের পনের শত য্যাক ছিল। ভ্রমণকারীরা কিছু দিন এই দলে গমন করিয়াছিলেন। কুসক ইহাদের আগমন শুনিয়াই বলিয়াছিল, ইহারা হয় ইংরাজজাতীয়, অথবা রুশীয়; অন্য কোনও জাতীয় লোক এইরূপ কষ্টসাধ্য ভ্রমণে বাহির হয় না। কুসকের সহিত প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা এইরূপ;—"তাহারা আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। পরে একজন ভৃত্য উষ্ণ-চা-পূর্ণ এক একটি পাত্র আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিল। তাহাতে সে মাখমের এক একটি ছোট পিণ্ড ফেলিয়াছিল ও চূর্ণ-বার্লি-পূর্ণ একটি থলিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল। আমরা প্রত্যেকে কয়েক চামচ চূর্ণ লইয়া চায়ে মিশ্রিত করিলাম ও তাহাতে আবশ্যকমত লবণ দিলাম। পরে সেই ভৃত্য আমাদের কিছু 'চপ্‌ষ্টিক' আনিয়া দিল। তখন আমরা সাগ্রহে আহার আরম্ভ করিলাম। সে দিন আমরা যে পরিমাণে আহার করিয়াছিলাম, সাধারণে বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন না। তাহারা পরে আমাদিগকে পণ্যদ্রব্যের স্তূপের উপর শয়ন করিতে দেয়। কিন্তু আমাদের তাহা প্রীতিকর না হওয়ায় রাত্রে উঠিয়া তাহাদের তাম্বুতে শয়ন করি। ইহাতে যদিও তাহারা বিরক্ত হইয়াছিল, তথাপি কিছু বলে নাই।"

তিব্বতীয় বণিকদের ব্যবহার মোটের উপর মন্দ নহে। তাহারা ভ্রমণকারীদিগের কোনও অনিষ্টচেষ্টা করে নাই। তাহারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি; মনোভাব গোপন রাখিতে বিশেষ চেষ্টিত। কিন্তু দয়ামমতাশূন্য নহে।

মঙ্গোলীয় যাযাবরদিগের নিকট ভ্রমণকারীরা ইহা অপেক্ষা সাদর আতিথ্য প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। ইহাদের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ এইরূপ,—"কয়েক দিন অনাহারে ভ্রমণের পর একটি ঘন ঝোপের অন্তরালে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় নাই। কতকগুলি ছোট বালক ও বালিকা চারণক্ষেত্র হইতে এক দল সুন্দর মেষ তাড়াইয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। তাহারা পর্য্যাণশূন্য ছোট ঘোড়ার উপর চড়িয়া যাইতেছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহারা কিছুই জানে না। মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল। আমি গোপনে এই সুখময় শান্তিপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটা অসঙ্গত চীৎকারে ফিরিয়, সহসা আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা প্রথমে বড় ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভীতি শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল। যাযাবরেরা অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সহিত অতিথিসৎকার করিয়াছিল। ইহারা ন্যায়পর, অতিথিবৎসল ও দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের আচার ব্যবহার বেশ সাদাসিদা রকমের। ভ্রমণকারীদিগের অসম্ভব ক্ষুধা দেখিয়া তাহারা নীরবে হাস্য করিয়াছিল। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম;—রন্ধনপাত্র হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। * * * গৃহস্বামী অগ্নিকুণ্ডের নিকটে একখানি কম্বল বিছাইয়া আমাদিগকে বসিতে দিলেন, এবং একটি পাত্রের ঢাকা খুলিয়া আমাকে এক খণ্ড সিদ্ধ ছাগমাংস দিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন আমাকে আর এক খণ্ড দেওয়া হইল। তাহাও অচিরে "যম সপুরে" প্রেরিত হইল। গৃহস্বামী আমাকে আরও খাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অতিশয় লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

এই মোগল জাতির বিবাহ ও সমাধিপ্রথা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী স্বামী এক জন বন্ধুকে দিয়া কন্যার পিতার নিকট একখণ্ড মসলিন কাপড় পাঠাইয়া দেন। ইহাকে কারটাগ বলে। যদি কন্যার পিতা তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জানা যায় যে, বিবাহ হইবে। তখন বর শ্বশুরকে অর্থ, মদ্য প্রভৃতি উপহার দেয় ও অবিলম্বে বধূকে গৃহে আনয়ন করে। কোন মঙ্গোলীয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার শব মুক্ত প্রান্তরে নীত হয় ও তাহার মুখের ভিতর [illegible] খণ্ড কাপড় গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পরে পক্ষী ও কুকুরেরা শবদেহের মাংস খাইয়া ফেলে। তখন মৃতের বন্ধুরা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট অস্থিগুলি চূর্ণ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেয়। তিব্বতে তিন প্রকার সমাধিপ্রথা প্রচলিত। সাধারণতঃ শবদেহকে কোনও পাহাড়ের উপর আসনপীড়ি করিয়া বসাইয়া রাখা হয়। পরে তৎপার্শ্বস্থ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শবদেহ তথায় বিহগের ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

উমা।

স্তব্ধ রাত্রি, চারি দিক শব্দহীন সুষুপ্ত নির্জ্জন,
শান্তিময় যোগেশের যোগমগ্ন হৃদয় যেমন।
[illegible]বিরাবরব বিহগেরা পশেছে কুলায়;
মুদিত কমল মাঝে শ্রান্তদেহ ভ্রমর ঘুমায়;
নিদ্রামুদিত আঁখি প্রাণিকুল ঘুমে অচেতন,
সুখনিদ্রায় করে দিবসের শ্রমনিবারণ;

স্বপনসঙ্গীত সম আসে শুধু পত্র-মরমর,
উপলব্যথিতগতি নির্ঝরের কল গীতস্বর ;
দু'একটি পাখী ভাবি চন্দ্রকরে অরুণ-কিরণ
ঘুমঘোরে গীতস্বরে চালিতেছে আনন্দবেদন ;
গিরিমল্লিকার বাসে গন্ধবাসী নৈশসমীরণ
প্রত্যগ্র কুসুমকুলে দোলাইয়া করে বিচরণ।
জ্যোছনা-প্লাবিত ঊর্দ্ধে শোভিতেছে অনন্ত অম্বর,
দিগন্তবিহীন যেন সীমাহীন ক্ষীরোদ সাগর ,
পথহারা একখানি শীর্ণদেহ শ্বেত জলধর
আলসে বিরাম লভে দূর অদ্রিশিখরের পর ;
ধবল তুষাররাশি শশধর-কর-পরশনে
দেখাইছে জ্যোতির্ম্ময় সীমাহীন নিশীথগগনে।

মধুর কুসুমরাশি প্রকৃতির স্নেহ আবরণ
পর্ব্বতের সানুদেশ করিয়াছে স্নেহে আচ্ছাদন।
বিষাদমলিনমুখ, নতদৃষ্টি, মৃদুমন্দগতি,
হরপ্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী একাকিনী আইলা পার্ব্বতী।
সুকঠিন শিলাঘাতে ব্যথিত সে চরণপরশে
ফুটিল কুসুমকলি আত্মহারা আকুল হরষে,
রাতুল চরণে যেন সানুদেশ দিল উপহার
কুসুমসুষমারাশি আপনার ভক্তি-অর্ঘ্যভার।
চরণচুম্বিত কেশে কর্ণিকার শোভা নাহি পায়,
আঁধার কেশের রাজি অযতনে চরণে লুটায় ,
সে কমল-করে আর নাহি শোভে লীলায় কমল ;
আভরণহীন কর্ণে আর নাহি শোভে কর্ণোৎপল ;
স্মিতহাস্য আর নাহি ফুটি রহে অধরযুগলে ,
থাকি থাকি আঁখি দুটি ভাসি উঠে নয়নের জলে ;
সতত চঞ্চল আর নহে এবে নীলাব্জনয়ন,
ধরাতলবদ্ধদৃষ্টি চাহে শুধু রাতুল চরণ ,
সুকোমল গণ্ডে আর নাহি শোভে রক্তিম বরণ ;
প্রবাল অধরযুগে রক্ত আভা মলিন এখন ;
তরুণ-অরুণরাগ বাস নাহি শোভে অঙ্গে আর,
শিরীষকোমল দেহ বেষ্টিয়াছে বল্কলের ভার।
তপস্যার তীব্র তাপে খিন্ন এবে নবীন যৌবন,
অকালজলদোদয়ে ম্লানমুখ পঙ্কজ যেমন।

শ্রান্তদেহ ধীরে ধীরে শিলাপরে করিয়া স্থাপন
তুলি নতদৃষ্টি দেবী—সানুপ্রান্তে করিলা দর্শন,—
নমেরুবেষ্টিত চারু তপোবন, যেথায় নিরত
যোগমগ্ন মহাদেব ব্যোমকেশ বাহ্যজ্ঞানহত ;

না বহে পবন বেগে ফুটাইতে কোরকনিচয়ে
সেই পুণ্য তপোবনে—ত্র্যম্বকের তপোভঙ্গভয়ে ;
ভুলি পাখী নাহি গাহে, ভুলি বেগে না বহে পবন
স্মরি স্মরনাশকালে শঙ্করের ভ্রুকুটী ভীষণ ;
যোগমগ্ন চন্দ্রচূড়, চারি দিক নিস্তব্ধ নিশ্চল—
আলেখ্যে লিখিত যেন তপোবন রয়েছে কেবল ।
সলিলস্তম্ভিত আঁখি চাহি ক্ষণ বাসু প্রান্তদেশে
কহিতে লাগিল দেবী মৃত্যুঞ্জয় কপর্দ্দী উদ্দেশে,—
বেদনাকম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারিত স্বর
তুলিল প্লাবিত করি শব্দহীন অসীম অম্বর,
বীণাবিনিন্দিত স্বর শব্দহীন গভীর নিশায়
ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে উঠি মিলাইল তারায় তারায়—

"ছাড়ি গৃহ, পরিজন, একধ্যানে মগ্ন নিরন্তর
তোমায় পাব না আমি কখনো কি—জন্মজন্মান্তর ?
শুকায়েছে দেহে মোর যৌবনের সৌন্দর্য্যসম্পদ
তুমি না দেখিলে তাহা, হে বাঞ্ছিত, কেবলি আপদ ;
তরঙ্গউত্থানহীন সিন্ধু সম ও তব হৃদয়,
কাহারো পরশে, দেব, হবে না কি বীচিমালাময় ?
নিবাত প্রদেশে স্থির শিখা সম ধ্যানমগ্ন মন
ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের তরে জানিবে না কভু কি কম্পন ?
বর্ষণবিহীন ঘন মেঘসম প্রণয় তোমার
ক্ষুদ্র একবিন্দু প্রেম বর্ষিবে না কভু একবার ?
ওই চন্দ্রকর ধৌত অভ্রভেদী গিরিচূড়া সম
তুমি কি বধির, দেব, হৃদয়ের প্রার্থনায় মম ।
তুমি কি উহারি মত প্রাণহীন,—মমতাবিহীন,
আর কিছু নাহি চাহ, আপনাতে আপনি বিলীন ।
তবু ত ও গিরিচূড়া আশ্রিতেরে দিতেছে আশ্রয়
হিমরাশি, ধারাধর লভে হোথা বিরামনিলয় ।
তুমি কি অনধিগম্য, শিতিকণ্ঠ, রহিবে কেবল ;
ফিরিবে তোমারে ঘিরি জন্ম জন্ম বাসনা বিফল ?
হে অব্যয়, হে স্বয়ম্ভু, তুমি কিগো কেবলি ভীষণ—
তব জটাজূটলীন বায়ুভক্ষ্য ভুজঙ্গ যেমন ?

"আর কিছু নাহি আশা, শুধু তব নয়নকিরণে
ফুটেছে যে প্রেম, লহ উপহার রাজীবচরণে ।
মৌলিবাসী সুরধুনী শিরে তব শোভে, দয়াময়,
আমি শুধু চাহি, শূলী, মোক্ষদায়ী চরণে আশ্রয় ।
ভক্ত যদি ভক্তিভরে বিল্বপত্র দেয় পদমূলে
প্রফুল্লরাজীবকরে, ভক্তিজের, লহ তাহা তুলে,

উপাসিকা দেয় যদি ভক্তি প্রেম চ ণ তোমার
তুমি কি প্রসন্নমনে লবে না সে প্রেম-উপহার?
হে অজ্ঞেয়, হে সুন্দর, হে কঠোর, হে চিরমধুর,
লহ পদে উপহার এ হৃদয় বেদনাবিধুর।

"ভ্রান্ত আমি। কখন কি মুক্তনেত্রে দেখে দিবাকর
তার করে কোথা ফুল ফুটিয়াছে কোন তৃণ'পর?
তার আছে শত কাজ,—জগতের আলোকবিধান,
সে কি দেখে তার পানে চাহে কার তৃষিত নয়ান?
সে কি দেখে কোথা কোন আন্দোলিত কমল-হৃদয়
ফুটিয়া উঠেছে, হেরি প্রাচীমূলে তাহার উদয়।
তবু দিবাকর-করে আত্ম ভুলি ফুটে শতদল,
জীবনে মরণে তার তপনের প্রণয় সম্বল।
চাহ বা না চাহ তুমি ধ্যানমগ্ন যোগেশ ঈশান,
তোমার চরণে, দেব, [illegible] কাতর পরাণ।
যোগঅন্তে একবার মৌন ধ্যানে চাহ যদি ভুলে—
আকুল উল্লাস জাগি উঠিবে এ হৃদয়ের কূলে;
তখন সফল হবে পার্ব্বতীর জীবনসাধন,
ত্রিনয়ন! ক্ষণতরে লভি তব নয়নকিরণ।"

ধীরে ধীরে গেল সরি নীল নভে জ্যোছনাপ্লাবন,
পাণ্ডুর গগন—যেন রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর আনন।
তার পর পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে উষালোক আসি
স্তরে স্তরে মেঘে মেঘে ফুটাইল দিবসের হাসি।
ভক্তিভরে যুক্তকরে দিবাকরে করি উপস্থান,
পিনাকী পূজিতে পুনঃ ধীরে দেবী করিলা প্রয়াণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র। "অধ্যাপক" গল্পটি সুখপাঠ্য। আখ্যানবস্তু সামান্য, কিন্তু বর্ণনার বিচিত্র ভঙ্গী, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষমা ও ইন্দ্রজালময়ী 'কাব্যমায়া'র বিচিত্র বিকাশে এই সামান্য গল্পটিও মনোরম হইয়াছে। গল্পের মহীন্দ্র এক জন অন্তঃসারশূন্য 'লিটারারী';—লেখক তাহার নিষ্ফল প্রয়াস, হাস্যরসাত্মক অহমিকা প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া পাঠকের সহানুভূতি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু একটি গুণে আমরা মহীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছি। মহীন্দ্রের অধ্যাপক প্রতিমুহূর্ত্তে শিষ্যের শূন্যগর্ভ সাহিত্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন; এবং মহীন্দ্র তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যাপককে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলিত;—সমালোচকের উক্তি তাহার মনঃপূত হইত না, এ জন্য সে নিজেকে 'বড়' এবং সমালোচকদের 'ছোট' মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিত। কিন্তু মহীন্দ্র বোধ

করি, কলেজের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজে পায়ের ধূলা দিবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে সমালোচকের বা তাহার চতুষ্পুল অধ্যাপকের অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াই নিরস্ত হয়;—বিশেষরূপে বা নীচতায় অতিশয্যে কেহ যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছে, বা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও এই অল্পবুদ্ধি 'নকল' কবির অন্তঃসারশূন্য বুদ্বুদবৎ চিত্তে একবারও উদিত হয় নাই। বিরুদ্ধ সমালোচনায় চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অপ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—এবং সরলহৃদয়ে বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকের শিরে কোনও অভাবের আরোপ করে নাই,—ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাই। এবং মনে হয়, কালক্রমে তাহার সাহিত্যব্যাধির উপশম হইলে, এই হৃদয়ের গুণে সহীয় এক প্রকার নির্বৃতিলাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেশের 'আসল' 'সাহিত্যিক'গণ যদি এই কবিশ্রেষ্ঠ 'নকল' কবির সরলতার অনুকরণ করিতেন। "ভাষা ও ছন্দ" একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ কবিতা,—তবু ভাষার কৃত্রিমতায় ও কষ্টকল্পিত ভাবের ভারে ইহার উৎকর্ষের অনেক হানি হইয়াছে। "মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে" একটি সাময়িক প্রসঙ্গ; সকলের অবশ্য-পাঠ্য। মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিলে ভাল হয়। "প্রাচ্য প্রসাধনকলা" একটি সুপাঠ্য রচনা।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "দক্ষিণের ভাষা" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লেখক বলেন, "এই হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী উভয়ে মিলিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য ভাষা দিগ্‌গজের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নাম মহারাষ্ট্রী বা মারাঠী।" মহারাষ্ট্রীর ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক এই নূতন মতটি শাস্ত্রী মহাশয় কোথায় আবিষ্কার করিলেন? বররুচি, হেমচন্দ্র, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈয়াকরণগণ বলেন,—সংস্কৃত হইতে মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃতভাষা উৎপন্ন। মহারাষ্ট্রী হইতে শৌরসেনী, শৌরসেনী হইতে মাগধী গৌড়ী প্রভৃতির উৎপত্তি,—শৌরসেনী ব্রজভাষার জননী। হিন্দীভাষা ব্রজভাষার কন্যা। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রী যে শৌরসেনী অপেক্ষা প্রাচীনা, তাহা নানা প্রমাণে সিদ্ধ হয়। ইংরাজ লেখকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সমস্ত ভাষা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অধিক; এমন কি, দশ ভাগের নয় ভাগ সংস্কৃত। মুসলমান শাসনকালে অনেক উর্দ্দু শব্দ মারাঠী ভাষায় প্রবেশ করিলেও সংস্কৃত কমে নাই। এবং অনেক উর্দ্দু (শাস্ত্রীর কথিত হিন্দুস্থানী) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া উর্দ্দুকে মারাঠীর জননী বলা অসঙ্গত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "মহারাষ্ট্র ভাষা শিখিতে কষ্ট না হইলেও ইহা অত্যন্ত কর্কশ ভাষা। ইহা শুনিতে কুশ্রাব্য এবং ইহার কবিতা বা গীত শুনিতেও ধৈর্য্য নষ্ট হয়।" শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অভিনব। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও কবিগণ প্রাচীন মহারাষ্ট্রীকে অতিশয় মিষ্ট ভাষা মনে করিতেন। সেই জন্য নাটকে রমণীদিগের "গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ" এই বিধি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যে ভাষার দশভাগের নয় ভাগ সংস্কৃত শব্দ, সে ভাষা সুমিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক বোধ হয়। Encyclopedia Britanica গ্রন্থের ১৫ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র জাতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই ভাষাকে "Copious, Flexible and Sonorous বলা হইয়াছে। "হিক্কড়ী, তিকড়ী" (কর্ণাটীভাষা) অপেক্ষা "হাম্‌লা তোম্‌লা" শাস্ত্রীর কর্ণে কেন কর্কশ বোধ হইল, তাহা আমরা বুঝিলাম না। "দক্ষিণের সাহিত্য কখনই চরিত্রগঠনের সহায় হইতে পারে নাই।"—এই মন্তব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে যথোচিত রূপে দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি?

দাদার কাণ্ড

সংসারের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের একমাত্র সহায় যে স্নেহময়ী জননী, তাঁহার শোকে প্রথমতঃ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে তাহাও সহিল। আমরা দুই ভাই; দাদা বড়, আমি ছোট। মার স্বর্গা-রোহণের সময়, আমার বয়স বার, দাদার উনিশ। ছেলেবেলাতেই দাদার বিবাহ হয়। বধূ ঠাকুরাণী তাঁর চারি বৎসরের ছোট। এই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকাই তখন আমাদের গৃহের গৃহিণী। কিন্তু সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূ ঠাকুরাণীর গুণের কথা আর কি বলিব? তাঁহার স্নেহে, তাঁহার যত্নে, আমার শৈশবের সকল অভাবেরই মোচন হইয়াছিল। আমি তখন বড় আদুরে ছিলাম, আমার সকল বায়না, সকল আব্‌দার রক্ষা করা বড় সহজ ছিল না। মাও সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু বৌমা আমার হাসিমুখে সকল দৌরাত্মাই সহিতেন। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, সম্ভবতঃ মার দেখাদেখি বধূ ঠাকুরাণীকে ছেলেবেলা হইতেই আমি "বৌমা" বলিতাম।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দাদা সতের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেন। কষ্টে কিছু দিন এল.এ.ও পড়িয়াছিলেন। মার হাতে সামান্য কিছু টাকা ছিল, তাহা হইতেই কোন রকমে সংসার চলিত। মার শ্রাদ্ধাদি 'যেন্ তেন প্রকারেণ' সম্পন্ন করিলেও, আমাদের পুঁজিপাটার অবশিষ্ট যা, সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। কাজেই, দাদাকে পড়া শুনা ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের গ্রামের নিকটেই এক মাইনর স্কুল ছিল, দাদা তার হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। বেতন নামে পঁচিশ, রসিদেও পঁচিশ টাকা লিখিয়া দিতে হইত, কিন্তু দাদা পাইতেন নগদ উনিশ টাকা মাত্র। আর ছয় টাকা না কি স্কুলের মাসিক চাঁদা। আমিও সেই স্কুলে পড়ি। মার কোলের ছেলে, বড় আদরের, পড়াশুনায় প্রথম প্রথম তেমন চাড় ছিল না। বলিতে লজ্জা করে, সেই বার বৎসরের ধেড়ে ছেলে আমি, তখনও মাইনর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর উপর উঠিতে পারি নাই। পড়া শুনায় মন নাই, সারাদিন খেলা আর খেলা। এ দিকে সেই অল্প বয়সেই দাদাকে ঘোর সংসারী হইতে হইয়াছিল। দাদা চিরদিন ধীর, স্থির, [illegible], অথচ বুদ্ধিমান।

লোকে বলে, বুদ্ধিটা না কি আমারও ছিল, সেটা কিন্তু বেশী খেলিত দুষ্টামিতে। পাড়ার সকল ছেলে, স্কুলের সকল সমপাঠী,—কথাটি নিতান্ত অবিশ্বাস করিও না,—স্বয়ং পণ্ডিতমহাশয়ও আমায় কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়কে না হউক, তাঁর বেত গাছটিকে ভয় না করে, এমন ছেলে দুনিয়ায় দুর্লভ। আমি ছিলাম কিন্তু সেই দুর্লভ বস্তুর একটি। পণ্ডিত মহাশয়ের বেত অন্য ছেলের নিকট শিকারভ্রষ্ট সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় ভীষণ আস্ফালন করিত, আর আমার বেলায় তার দশা হইত যেন প্রহৃত কুকুরের লেজটি। পড়াশুনা করিতাম না, তবু আমার প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের যে এতটা অনুগ্রহ, বলিতে হইবে কি, সে কেবল আমার নষ্ট বুদ্ধির জোরে? সে বুদ্ধির পরিচয়টা আর এ বয়সে দিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ গুরুনিন্দা, সেটা আর নাই করিলাম। কিন্তু কি বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, বার বৎসর বয়সেও আমার লেখাপড়া কিছুই হয় নাই! মার মৃত্যুর পরে দাদা আমায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "বিনু"—আমার নাম বিনয়, বাড়ীতে কিন্তু সকলে আদর করিয়া বলিত বিনু—"এখন ত একটু বড় হয়েছিস, নিতান্ত অবুঝও ন'স—লেখাপড়া না শিখলে কি করে চলবে বল? আমরা গরিবের ছেলে, মূর্খ হয়ে থাকলে দু' মুঠা খাবার উপায় আমাদের নাই। এই দেখ, যদি ভাল করে লেখাপড়া শিখিতে পারিতাম, তবে কি আর সামান্য টাকার জন্য রোজ দুই ক্রোশ মাটী হেঁটে এই পচা ষ্টেশনে কাজ কর্ত্তে হতো? না সংসারেরও এই কষ্ট থাকতো? মা ত দুঃখ কষ্ট সয়ে চলে গেলেন, আমরা কিন্তু এমনই হতভাগা যে, তাঁকে এক দিনও সুখী কর্ত্তে পারিলাম না।" বলিতে বলিতে দাদার চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিল। পণ্ডিতের বেতের ভয়ে যে হৃদয় একদিনও কাঁপে নাই, প্রতিবেশী সাধুদের গুরুগম্ভীর উপদেশেও যে মন বিচলিত হয় নাই, আজ সহসা সে [illegible]। পরদিন হইতে মাষ্টার, পণ্ডিত এবং সতীর্থবৃন্দ, সকলের বিষম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, আমি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। সে দুষ্টামিও [illegible] হইতে লাগিল; ক্রমে প্রকৃতই এক জন ভাল ছেলে হইয়া দাঁড়াইলাম। [illegible] বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু বৃত্তি পাইলাম না।

পাশের সংবাদে দাদা, বৌমা, সকলেই মহা খুসী! কিন্তু শীঘ্রই সকলের সে [illegible] পরিণত হইল। মাইনর ত পাশ করিলাম, কিন্তু তার পর? [illegible] পড়িতে হইবে।" দাদা [illegible]পুরের যে আত্মীয়ের বাসায়

থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন, সে আত্মীয়টি ত বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তবে উপায়! দাদা মোট পান উনিশ টাকা, জমীজারাৎ কিছু ছিল না, চারি পাঁচটি পরিবার, সুতরাং তাহাতেই টানাটানি পড়ে। তবে আমার পড়াশুনার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে?

দাদা বড় বিষণ্ণ, তাঁর মুখ দেখিলেই মনে হয়, কি যেন একটা দারুণ মনঃকষ্টে তিনি সদাই বিষম ব্যথিত। সহসা দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। বৌমা এক দিন বলিলেন, "এত ভাবনা কিসের? আমার যে গহনা আছে, ইহাতেই অন্ততঃ পাঁচ সাত শত টাকা হইবে, সেই টাকায় কিছু দিন ত চলুক, তার পর ঈশ্বর একটা উপায় অবশ্যই ক'রে দিবেন।" আমি সেইখানেই ছিলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না না, তা কি হয়?" বৌমা আমার দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন বিনু?" সে কথার উত্তর আর আমার মুখে আসিল না। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতেই বৌমা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইলাম, কষ্টও হইল। বৌমার প্রস্তাবে দাদার বুক হইতে যেন একখানা পাষাণ নামিয়া গেল।

এখন কথা উঠিল, কোন পথে যাই? এনট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িতে এখনও চারি বৎসর, আবার এনট্রেন্স পাশ করিলেই যে চতুর্ভুজ হইব, এমনও কিছু নয়। তার পর এল্.এ., বি.এ., সে ঢের দিনের কথা! শেষ কলিকাতায় ক্যাম্বেল স্কুলে পড়াই স্থির হইল। দাদার আন্তরিক ইচ্ছা, আমি জেনারেল লাইনে যাই। বৌমারও বড় সাধ, আমি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাদিগ্‌গজ হই। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় এবং আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শে সে সাধে বাদ পড়িল।

আমাদের গ্রামের নবীন ও ভূপেন কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটীতে তাঁহারা বাটী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেসে "সিট"ও খালি ছিল; সুতরাং কলিকাতায় গিয়া প্রথম ও প্রধান যে উদ্বেগ, তাহা দূর হইল। নবীনদের সহিত কলিকাতা যাওয়াই স্থির, শেষ যাত্রার দিন আসিল। আমার যাওয়ার ক্ষুদ্র আয়োজন প্রস্তুত। বৌমাই সব গুছাইয়া দিয়াছেন, একটি টিনের প্যাটরায় প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও একটি পুটুলিতে খানকতক আমসত্ত্ব, পাকা আমের আমচুর, আর আমি সুপারি বড় ভালবাসি বলিয়া 'মিছিসুপারি' সেরখানেক বাঁধিয়া দিলেন, আর দিলেন একটা ভাঁড়ে সের তিনেক গাওয়া ঘি। সঙ্গে সঙ্গে বৌমা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "শুনেছি কলিকাতায় [illegible] ঘি মেলে না; রোজ দু'বেলা ঘি অবশ্য অবশ্য খেও।" [illegible]

জুতা, জামা কিনিয়া লইবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। তার পর স্বহস্তে আম্রের শাখা ভাঙ্গিলেন, ঘট পুরিয়া আনিলেন। এখন আমার যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের বড় ঘরে একখানি আসন পাতা, বৌমা আমায় সেইখানে বসিতে বলিলেন; নিজেও আমার নিকট বসিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাকে আমার মঙ্গলের জন্য ভক্তিভরে অর্চনা করিয়া আমায় সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। শেষে আমার কপালে দধি ও সিন্দূরের ফোঁটা ও মাথায় "নির্ম্মাল্য" দিলেন। আবার পরক্ষণেই নির্ম্মাল্যটি আমায় ভাল করিয়া চাদরের খুটে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, শেষে দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে আমায় লইয়া যাত্রার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এ দিকে ট্রেনের সময় যায়; ভূপেন ও নবীন পথে দাঁড়াইয়া; দাদা শীঘ্র রওনা হইবার জন্য আমায় তাড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু বৌমা, সে সকল গ্রাহ্য করিলেন না, কিছু না খেয়ে কি যাওয়া হয়? কাজেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। 'পাথেয়' লুচি সন্দেশও বৌমা সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। আমি বৌমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, বৌমা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। আমরা রওনা হইলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, বৌমা খিড়কিতে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন।

ষ্টেশন আমাদের বাটী হইতে দেড় মাইল। দাদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। যাহা যাহা বলিবার, দাদা তা আমায় পথেই বলিতে বলিতে চলিলেন। দাদার সে কয়টি অমূল্য উপদেশ আমি চিরজীবন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা ষ্টেশনে পৌছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও আসিল। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। আমাকে নবীন ও ভূপেনের হাতে সঁপিয়া দাদা বিষণ্ণহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। গাড়ীও ছাড়িল, আর আমার মনটি কেমন হইয়া গেল। সেই অবস্থায় কলিকাতায় পঁহুছিলাম। মনটি বড় উড়ু উড়ু। ক্রমে আলিপুরের বাগান, মিউজিয়ম, কেল্লা, ইডেন গার্ডেন দেখিতে দেখিতে মনটা কতক বসিল। তখন [illegible] হইলাম। পড়ায় খুব মন। দেখিতে দেখিতে [illegible] আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। পাশের সুখবর

লইয়াই বাড়ী গেলাম। বৌমার মুখে আর হাসি ধরে না। দাদারও চিন্তা-ক্লিষ্ট বদনে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা দিল। তখন প্রশ্ন উঠিল, চাকরী লওয়া কি ব্যবসা করা? আসাম অঞ্চলে একটা পঁচাত্তর টাকা বেতনের কাজ পাইবার আশা পাইয়াছিলাম। বৌমা ত তা শুনেই বল্লেন, "সর্ব্বনাশ! আসাম?—না ভাই, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না; ঘরের ছেলে, ঘরে থাক।" সত্যই ঘরের ছেলে ঘরেই রহিলাম। দেশে তেমন ভাল ডাক্তার তখন কেহ ছিলেন না। সকলে দেশেই ডিস্পেন্সারী করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তা হ'লে ঔষধপত্র ও অন্যান্য আসবাব সংগ্রহ করিতে প্রথমেই যে অন্ততঃ দুই শত টাকার দরকার। বৌমা এবারেও বিপদে কাণ্ডারী হইলেন, বলিলেন, "আমার এখনও যে গহনা আছে, তাহাতে আড়াই শ তিন শ অনায়াসে হবে।" বৌমার কথার উপর কে কথা কহিবে? আমি ঔষধপত্র আনিবার জন্য অলঙ্কার সহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। বৌমার হাতে [illegible] শুধু দু' গাছি শাঁখা রহিল। যাইবার সময় দাদা খান কয়েক আইনের পুস্তক ফরমাইস দিলেন। বলিলেন, "একবার 'কমিটী'-পরীক্ষা দিতে হবে।" দাদা কিন্তু মতলবটি মন্দ ঠাওরান নাই।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। দশ, পনর, বিশ, পঁচিশ, ক্রমে ছ'মাসের মধ্যে আমার মাসিক আয় চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত হইল। পশারও বেশ জমিল। তবে দেশে যত পশার, পয়সা তেমন নহে। যা হোক, ভবিষ্যৎ বড় মন্দ মনে হইল না। যা কিছু পাই, সবই বৌমাকে আনিয়া দিই। মধ্যে একটা বড় দাঁও উপস্থিত হইল। দেশস্থ কোন ধনাঢ্য ও বদান্য জমীদারের স্ত্রী ও পুত্রকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া এককালে তিন শত টাকা পুরস্কার পাইলাম। সে টাকাটা কিন্তু আর বৌমাকে দিলাম না। গোপনে সে টাকার একটা সদ্গতি করিলাম। তখন সোনার বাজার সস্তা, সেই তিন শত টাকাতেই বৌমার হাতের বালা, গলার হার ও কাণের মাকড়ী হইল। গহনা দেখে ত বৌমার ভারি রাগ। আমাকে, "এ গিন্নিমি কর্‌তে কে বল্লে?" বৌমা কোথায় আমার সম্বন্ধের জোগাড় করিতেছেন, বিবাহে অন্ততঃ ছয় সাত শত টাকার দরকার, আর আমি কি না, বলা নাই, কহা নাই, মাঝ-খান হ'তে এতগুলো টাকা নয় ছয় করে ব'সে আছি? বৌমা তখন ব্যবস্থা করিলেন, "আচ্ছা থাক, এ হার মাকড়ি সব কনের হবে।" [illegible] আমার মুখ ফুটিল,—কোন দিন বৌমার সঙ্গে কথান্তর ঘটে নাই, [illegible]

ভারি কোঁদল। পাঠিকাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য এবং দুঃখি[illegible] হইবেন যে, সেই কলহে আমারই জয় হইল। শেষ বৌমাই সে অলঙ্কার ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলেন।

ক্রমে আমার আয় পঞ্চাশ, ষাইট টাকায় উঠিল। কোন মাসে বেশীও পাই। ষোল মাস ব্যবসায় করিতে না করিতে শুনিলাম, বৌমা আমার বিবাহের সমস্ত স্থির করে ফেলেছেন। বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকি। অবাক কারখানা! বৌমাকে হাসিয়া বলিলাম,—"এটা কি সত্যি বৌমা?"

"কোনটি বিনু বাবু!" বলিয়া বৌমাও হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

আমি। এই বিবাহের কথাটা?

বৌমা। তোমার মনে কি হয়?

আমি। আমার ত সম্ভব মনে হয় না।

বৌমা। অসম্ভবটা কিসে ভাবলে?

* * * * * *

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কনের চারি শত টাকার গহনা চেলি সমস্তই সংগৃহীত। এর উপর বিবাহের খরচ বলিয়াও বৌমার হাতে আড়াই শত টাকা মজুত। আমার উপার্জ্জিত একটি পয়সাও বৌমা ব্যয় করেন নাই। কিন্তু আজ সে সমস্তই একেবারে অপব্যয় করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, বৌমার নিকট মনে মনে হারি মানিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে বৌমাকে একটু খোঁটা দিতে ছাড়িলাম না। বলিলাম, "বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যে এ সংবাদটি জানিতে পারিনি, এও ভাল।" বৌমা কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন, "যা ভয় কচ্চ, তা নয়; কনে যেন গোলাপ ফুলটি, আমি যে নিজে দেখে ঠিক করেছি বিনু বাবু!"

"তা বেশ, ফুলদানিতে রাখ্‌বেন!" বলে আমি স্মিতমুখে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। আরে রাম, সেখানে কি আর দাঁড়াতে আছে?

যথাসময়ে বৌমার সেই অপব্যয়ের ফলটি আমার হাতে উঠিল। বৌমা আমায় মাঝে মাঝে আদর করিয়া "দেবর লক্ষণ" বলিতেন। আমিও তাই, বৌমার প্রদত্ত ফলটি কিছু কাল লক্ষণের 'ফল ধরা গোঁচ' ধরিয়া রহিলাম।

এবার আমার ব্যবসায়ের ভারি উন্নতি। ঘরে ঘরে জ্বর। লোকের সর্ব্বনাশ, আর আমরা ডাক্তার, কাজেই আমাদের পাথরে পাঁচ কিল। তিন মাসে আড়াই শত টাকা ভিজিট, এ ছাড়া ঔষধের দাম ত আছেই। সেও নিতান্ত

অল্প নহে। ... খাইয়া জলের দামে ডুর্নামের বিনিময়ে অনেক... বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করে। ডাক্তারি ব্যবসাতেও জলে উপার্জ্জন বড়... সুতরাং সে হিসাবে ডাক্তারি ব্যবসাটিকে Reformed গোয়ালার ব... চলে। তবে এতে Municipal officerদের দন্তস্ফুট করিবার যো নাই, ... যা বল। তা সে কথা যাক, আমার আয়বৃদ্ধি দেখে বৌমা এক দিন আমায় বলিলেন,—"দেখচ বিনু বাবু, কেমন পয়মন্ত বৌ এনেছি?"

"পয়মন্ত বটে, নইলে কি আর গ্রামে ঘরে ঘরে এত জর জ্বালা হয়!" বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে গেলাম।

বিবাহের ছ' মাস অতীত হইতে না হইতেই বৌমা নববধূকে বাড়ীতে আনিলেন। এরই জন্য তিনি বুঝি বিবাহের সময় "ধুলা পায়ে নবসত্ত" করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌমার কাজ বাড়িল। তার 'সাজগোজ' করা, চুল বাঁধা, খাওয়ান, ইত্যাদিতে বৌমা আমার সদাই ব্যস্ত। বালিকা প্রথম প্রথম দিনকতক বাপের বাড়ীর জন্য খুঁৎ খুঁৎ করিত। দুই এক দিন একটু আধটু কান্নাকাটি করিয়াছিল, তার পর সব চুপচাপ।

এক দিন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, ভৃত্য শ্রীমান চৈতন্য আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, একটি 'কল' আছে। কিন্তু এ ঘরের কলা বৌটিকে একা রাখিয়া যাওয়া চলে না, কাজেই বৌমাকে এ ঘরে থাকিবার জন্য ডাকিতে হইল। আমার প্রথম ডাকেই দাদা বলিলেন, "কে বিনু?" বলিয়া তিনি দোর খুলিয়া দিলেন। দাদা তখনও শয়ন করেন নাই, আইন-চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আমাদের কথাবার্ত্তায় বৌমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাদের নিকট আসিলেন। আমি তখন দাদাকে বলিতেছিলাম, "প্রত্যহ এত রাত্রি জেগে পড়াশুনা কল্লে শরীর মাটী হয়ে যাবে যে।" "না" বলিয়া দাদা একটু হাসিলেন। বৌমা আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "আমিও রোজ ঐ কথা বলি; তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব করে বলা হয়নি, এখন কিছুদিন ছুটী নিলেও ত চলে।" বৌমা ঠিক বলেছেন, আমি উদ্যোগী হইয়া দাদাকে বিনা বেতনে তিন মাসের ছুটী লইতে বাধ্য করিলাম।

তিন মাস অন্তেই দাদা কমিটীর পরীক্ষা দিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় পাশও হই-... সব্‌ডিভিসন আমাদের গ্রাম হইতে চারি মাইলও নয়। সেইখানেই

...্যাক্‌টিস্ করা স্থির হইল। কিন্তু দাদা আপাততঃ কিছু দিন চাকরী ...ভিপ্রায় জানাইলেন। ভেক নহিলে ভিক মিলে না। ঘড়ি, চেন, ...রিচ্ছদ ত চাই। আবার কয়েকখানি আইনের পুস্তকও সংগ্রহ ...হইবে। সুতরাং কিছু টাকার দরকার। আমার কিন্তু এ যুক্তি ...বোধ হইল না। শুভস্য শীঘ্রম্! আমি প্রস্তাব করিলাম, ধার ধোর করে কোন প্রকারে টাকা সংগ্রহ করেও সত্বরেই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বৌমা অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত আমার প্রস্তাব 'সেকেণ্ড' করি-...লেন,—অধিকন্তু বলিলেন,—"ধারই বা কর্ত্তে যাবে কেন?"

আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তখনও প্রায় দেড় শত টাকা জমা! দাদা আর বাক্যব্যয় করিলেন না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং, তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল। বাসাখরচের জন্য পঁয়ত্রিশটি টাকা হাতে লইয়া দাদা যাত্রা করিলেন! Practice আরম্ভ হইল—দাদা আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। তাঁহার জমাখরচে দেখিলাম, প্রথম মাসে উপার্জ্জন তের টাকা আট আনা; খরচ সাতাইশ টাকা পাঁচ আনা আড়াই পয়সা! দ্বিতীয় মাসে বাসাখরচের জন্য "পুঁজি" হইতে আড়াই টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় মাসে খরচ বাদে ছয় টাকা উদ্বৃত্ত হইল। পর মাসে আয় পঞ্চাশেরও বেশী। ক্রমে বৎসর অতীত হইতে না হইতে দাদার খুব নাম ছুটিল! ফৌজদারী কোর্ট যেন তাঁর একচেটিয়া হইয়া উঠিল! যে কোন মকদ্দমা হউক না, দাদা এক পক্ষে না এক পক্ষে আছেনই। ক্রমে মুনসেফি কোর্টেও দাদা "কেস্" পাইতে লাগিলেন! বোধ হয়, দাদার তখন বৃহস্পতিবার দশা। মুন্সেফিতেও তাঁহার বেশ পশার প্রতিপত্তি দাঁড়াইল। দুই বৎসরের মধ্যেই দাদা সব্-ডিভিসনের একজন প্রধান উকিল হইয়া উঠিলেন। মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট হইল। জেলার কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজা, জমীদার বাঁধা মক্কেল হই-লেন! আমাদের সংসারের শ্রীও ফিরিতে লাগিল। পাকা বাড়ী, জোত, জমা, পুষ্করিণী, বাগান, একে একে সবই হইল। তখন বৌমা দুর্গোৎ-সবের সাধ করিলেন! তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবার নহে! পূজা করা গেল। কিছু সমারোহও হইল।

দাদা কিন্তু তখনও নিঃসন্তান। সে জন্য দাদা বা বৌমা যে কিছুমাত্র দুঃখিত, এমনটি বুঝা যাইত না। তবে বাটীতে একটি কচি ছেলের অভাব কিছু কিছু অনুভূত হইতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু সকলে কার্ত্তিক...

উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের কথায় কুমার কার্ত্তিকেরও শরৎ ল... কুমারের অর্চ্চনাটা একেবারে বৃথায় গেল না। সংবৎসরের মধ্যে... অপরিসীম একটা আনন্দের কারণ—তাঁহার সাধের যে বনে ব... দশ বৎসর বয়সে, সন্তানসম্ভাবনা ঘটিল। মনের সাধে বৌমা "ভা... দিলেন। এবং যথাসময়ে, বৌমার ভাষায় "সাত রাজার ধন মাণিক"— "আঁধার ঘরের আলো"—একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বৌমার ফুর্ত্তি দেখে কে? বৌমা আর আমাদের দিকে ভাল করিয়া চাহেন... মেজাজ বড় গম্ভীর। ছেলের 'জেঠী'র কি আর ছেলেমানুষী ক... সময় আছে? মহাসমারোহে খোকার অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেল—বৌমা নিজেই ছেলের নামকরণ করিলেন—"হৃদয়-রঞ্জন"। বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিতে লাগিল। ষষ্ঠী দেবীও বিশেষ কৃপাবিতরণ আরম্ভ করিলেন! দুই বৎসরের মধ্যে আবার এক "কন্যারত্ন" গৃহ উজ্জ্বল করিল।

সব্‌ডিভিসনে দাদার পশার প্রতিপত্তি যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইল, তখন সকলে দাদাকে জেলা কোর্টে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার বাঁধা মক্কেল কয়েক ঘরও বিশেষ উৎসাহ দিলেন। দাদা কিছু দিন ইতস্ততঃ করিয়া জেলা কোর্টেই গেলেন। গ্রহ অনুকূল,—জেলা কোর্টে সত্বর দাদার সুনাম রটিল! আয়ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকল সুবিধা, অসুবিধা কেবল একটি, সব্‌ডিভিসনে থাকিতে দাদা প্রায়ই শনিবারে শনিবারে বাটী আসিতেন, এখন সেটি বন্ধ হইল! দুই মাস, তিন মাস, কখনও বা ছয় মাস অন্তর দাদার বাটী আসা ঘটে! জেলা হইতে বড় বড় মকদ্দমায় দাদাকে মাঝে মাঝে আমাদের সব্‌ডিভিসনে আসিতে হইত। দাদা সেই সময় বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান করিতেন, দুই তিন দিনের জন্য বাটী আসিতেন। এই এক অসুবিধা। বিশেষতঃ বৌমা গেলে সংসার অচল, কাজেই দাদার বাসায় সপরিবারে থাকা ঘটিত না। ঈশ্বরকৃপায় ক্রমে দাদার আয়বৃদ্ধি এবং আমার বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশে এখন প্রায় ঘরে ঘরে ডাক্তার, সুতরাং আমার উপার্জ্জন দিন দিন কমিতে লাগিল। আমি ষষ্ঠীগাছ হইয়া "ছেলেপিলে" আগুলিয়া বাটীতে "গেঁয়োমোড়ল" হইয়া রহিলাম। খরচপত্র সব দাদা পাঠান; আমি ঘুমাইয়া তাস পিটিয়া ও ছেলে কোলে করিয়া দিন কাটাই! দুটা একটা 'কল্‌' কখনও পাই, কখনও [illegible]ও পাই। কিন্তু তাতে সংসারের কিছু ক্ষতি-

... পরিবারের সকলেরই হৃদয়ে অনাবিল শান্তি, মুখে নির্মল হাসি, ... বিপুল আনন্দ। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সহসা ঘোর ... উপস্থিত হইল! পূজার তিন দিন অনবরত পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ করিয়া বিজয়া দশমীর প্রত্যূষে বৌমার কলেরা দেখা দিল। প্রথম হইতেই লক্ষণ বড় মন্দ, তার উপর বৌমা, গরমে অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া ...কেও না জানাইয়াই প্রাতে স্নান করিয়াছিলেন। গতিক ভাল নয় ... আমি প্রাতেই সব্‌ডিভিসনের এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জনকে আনিবার জন্য ... পাঠাইয়াছিলাম। নিজেও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু নিজের মাথার ঠিক ছিল না। মনে হইতে লাগিল, চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝি বা সব ভুলিয়া গিয়াছি। মধ্যাহ্নে এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন পঁহুছিয়া আমার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। তখন নূতন উৎসাহে ডাক্তার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই রোগ মানিল না। বৌমাকে বুঝি আর বাঁচাইতে পারিলাম না! বৌমা অন্তিমশয্যায় আমায় বলিলেন, "বিনু, আর কেন এত চেষ্টা ভাই? আমার যে সময় হয়েছে। আমার সব সাধই ত পূরেছে—আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি—এর চেয়ে আর আমার কি সুখ আছে?—আমি ত চলিলাম, ছোট বৌ ছেলেমানুষ, দেখ ওর যেন কোন কষ্ট না হয়!" তার পর বৌমা কাতরদৃষ্টিতে দাদার দিকে ...িলে আমি কি একটা উপলক্ষে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। দাদার ডাকে ...চ সাত মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরিলাম—দেখিলাম, দাদা চক্ষু মুছিতেছেন—বৌমারও চোখে জল। কই বৌমা! সব সাধ ত মেটে নাই? কিন্তু দেবি, তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম কই? দাদার পায়ে মাথা রাখিয়া আমায় সম্মুখে বসাইয়া বৌমা আমার চোখ মুছিলেন। সে চক্ষু আর মেলিলেন না। আমাদের সোনার প্রদীপ নিভিয়া গেল, গৃহ অন্ধকার হইল। বিজয়ার প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের সে দেবীপ্রতিমাও বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম।

ছেলেদের কান্নায় গৃহে আর তিষ্ঠান যায় না। "জেঠীমার কাছে যাব" বলিয়া তাহারা যে বায়না ধরে, তাহাদের গর্ভধারিণীও কিছুতে তাহা ভুলাইতে পারে না।

দাদার ব্যবহারে, বাহিরের লোকে শোকের চিহ্নমাত্র ধরিতে পারিল না। অন্যে না বুঝুক, কিন্তু আমি বুঝিলাম, দাদা আমার "অনন্ত শোকের আগুন" বুকে ধরিয়া গর্ভাগ্নি অচলের মত ...য়া দিবারাত্রি পুড়িতে-

ছেন। আহার করিতে করিতে দেখিতাম, দাদার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। একত্র শয়ন করিয়া দেখিতাম, দাদা রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বলিতেন, "রাণী! তুমি যে এমন, তা ত আগে জানিতাম না", কোন দিন বা "এসেছ, চল যাই!" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেন। আমি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "কি দাদা!" "না কিছু নয়, স্বপ্ন দেখিলাম" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া দাদা আবার শুইয়া পড়িতেন।

বৌমার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। দাদা বৌমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ [illegible] একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৌমার [illegible] তাহার নাম হইল "রাণীসায়র"।

দাদা এবার আদালত খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই ব্যবসায়স্থানে যাইবার দিনস্থির করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। এ কয়টি দিন থাকিয়া গেলে হয় না? দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, সেখানে কাজকর্ম্মে তবু অনেকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব। আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

ক্রমে বৎসর অতীত হইতে চলিল। দাদা আর বাটী আসেন না; অবশ্য খরচপত্র বাটীতে রীতিমতই পাঠাইতেন। দাদা বাটী আসেন নাই বটে, কিন্তু দেশস্থ অনেক আত্মীয়বন্ধু দাদার বাসায় পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমি দাদার নিকট যাইতাম; শুনিতাম, সমাগত আত্মীয়গণ দাদাকে পরামর্শ দিতেছেন, "এত অল্প বয়সে কি বিপত্নীক অবস্থায় [illegible] আছে?" ইত্যাদি। তাঁহারা কেবল এই অমূল্য উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নিঃস্বার্থভাবে আপন আপন বয়ঃস্থা কন্যা দান করিতেও প্রস্তুত। দাদা কিন্তু তাঁহাদের এহেন ত্যাগস্বীকারেও উপকৃত হইতে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। কেহ কেহ দাদাকে অনুরোধ করিবার জন্য আমাকেও ধরিলেন; কেহ বা এমনও জানাইলেন যে, দাদার ত বিবাহ করিতে ষোল আনা মত, কেবল আমি কি মনে করিব, এই চক্ষুলজ্জাতেই দাদা বিবাহ [illegible]তেছেন না। পূজার সময় দাদা বাটী আসিলেন। বোধ হয়, বৌমার [illegible] স্মরণ করিয়াই দাদা পূজা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু পূজা না পূজা। সে উৎসব ত শোকেই কাটিয়া গেল। আর বৎসর এমনই দিনে হায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জগদম্বে! তোমার সহিত বৌমাকে যে একদিনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তুমি ফিরিলে, কিন্তু [illegible] কই?

পূজা ত কোনরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু নিত্য নূতন কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়কুটুম্বগণের সমাগমে গৃহ আমাদের ভরপূর। দাদা সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। এক দিন দেখি, বৌমার এক মেসো—ঠিক ধান সম্বন্ধে নহে,—সপরিবারে আমাদের গৃহে উপস্থিত। মেসোটি নিতান্ত মাসীমা রকমের! কিন্তু মাসীমা বড় জমকাল লোক! কথায় বার্ত্তায় মৌখিক আলাপ আপ্যায়িত প্রভৃতি রমণীসুলভ গুণে যেন মূর্ত্তিমতী! [illegible]মার বিষয়বুদ্ধিতে রমণীমণ্ডলে দুর্লভ। স্বয়ং বৃহস্পতি আর কি! মেসো-মহাশয়-রূপ নাবালকটির তিনিই না কি 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্'।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই মাসীঠাকুরাণী, বৌমার নাম ধরিয়া "রাণী, মা আমার, তোর এ সোনার রাজ্য ফেলে কোথা গেলিরে মা" ইত্যাদি করুণ ক্রন্দনে গৃহ অনুরণিত করিয়া তুলিলেন। তার পর দাদার আগমনে, বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; ক্রন্দনের সুর পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। "আমাদের কি একবারেই ভুলে থাকতে হয় রে বাবা, রাণী যে আমার মাসীমা মাসীমা করেই পাগল ছিল রে বাবা!" ঠাকুরাণীর আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। উপস্থিত রোদনাবেগ কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তার পর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অঞ্চলে অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক, শোকবিজড়িত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "বলি বাবা ত আমাদের পর করেছেন, আমরাই একবার [illegible] খবর নিয়ে আসি। আর সৈরিন্ধ্রিও তোমাদের নামে লাল পড়ে, আহা রাণী আমার সৈরিন্ধ্রিকে কত ভালই না বাসত। ভাল জামাটি, ভাল কাপড়খানি, সৈরিন্ধ্রিকে না দিলে আর তার মন উঠত না। আহা, অমন মেয়ে কি আর হয়?" নির্ব্বাপিত বহ্নি বুঝি আবার প্রধূমিত হয়, কিন্তু না, এবার সংক্ষেপেই পালা শেষ হইল। কিঞ্চিৎ আর্দ্রকণ্ঠে ঠাকুরাণী বলিলেন, "সৈরিন্ধি, কাঁদচিস্ বুঝি? কেঁদে আর কি করিবি মা! আয় এখন, তোর বোনাই বাবুকে প্রণাম করবি আয়!" আমি সম্মুখের ঘরেই ছিলাম, দে[illegible] আলো করিয়া মন্থরগমনে আসিয়া ব্রীড়াবনতমুখে এক [illegible]কে প্রণাম করিলেন, এবং দাদা স্বাগতবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, ডাইন হাতের দুই অঙ্গুলিতে বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুলের [illegible] খুঁটিতে খুঁটিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন?" দাদা যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া [illegible]ন, "হ্যাঁ, তুমি ভাল ছিলে?" [illegible]রিন্ধ্রী স্মিতমুখে "যেমন রেখে[illegible]দাদার প্রতি একবার সলজ্জ

আঁখি ছুটির কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবার মুহূর্ত্তেই, মাটীর পানে মুখ নামাইলেন। দাদাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী বসুন না বলিয়া সপ বিছাইয়া দিলেন। দাদা বসিলেন।

*   *   *   *

মাসীঠাকুরাণী তখন আমার নিকট আসিয়া গল্প ফাঁদিলেন। এ কথা, সে কথা, বৌমার নানা গুণের কথা তুলিয়া, শেষ দাদার বিবাহের কথা পাড়িলেন। আমাকে সে জন্য অনুরোধ করিতেও বলিলেন। আসল কথাটা কিন্তু তখনও ভাঙ্গিলেন না। ঠাকুরাণীর ব্যবহারটি আমার আগাগোড়াই কেমন কেমন মনে হইতেছিল, আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারেই বলিলাম, আপনারাই চেষ্টা করে দেখুন, বলিয়া আমি বাহিরে গেলাম। কিন্তু ক্ষণপরে ফিরিয়া শয়নঘরে যাইতে যাইতে শুনিলাম, কক্ষান্তরে, কুটুম্ববাড়ী হইতে আগত ঝি বলিতেছে—"ভাল দেখেছ ঠাকরুণ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—তাই গিয়েছ কাজিকে শুধুতে ছুগোাচ্ছবের পরবের কথা। আরে বিয়ে কল্লে ক্ষতিটা হবে কার? তখন কি আর এমন করে পায়ের উপর পা দিয়ে দাদার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাওয়া চল্‌বে? না, দাদাকে বোকা বুঝিয়ে সর্ব্বস্ব [illegible] নিতে পার্‌বে?" মাসীঠাকুরাণী বলিলেন, "নে বাপু চুপ কর, ও সব [illegible] তোর কাজ কি?" কথাটা ঝির পছন্দসই হইল না। সে সৈরিন্ধ্রীকে [illegible] মানিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তা আমি কি আর মিথ্যা বল্‌চি, কি বল গো সৈরিন দিদি?"

এখন আমাদের বাটীর যেটি গৃহিণী, সেটির ত সাত চড়েও মুখে রা নাই; বোঝা বহিতে বেচারা বড় মজবুত। কিন্তু হুকুম তামিলে যেমন তৎপর, হুকুম চালাইবার ক্ষমতা তেমন নাই। তা হোক, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের সেবা করিবার শিক্ষা সে বৌমার নিকট লাভ করিয়াছিল। [illegible] মাসীঠাকুরাণীদের যত্ন সে বেচারা প্রাণপণেই করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম দুই এক দিন, দাদা মাসীঠাকুরাণীর কথা তুলি[illegible] বলিলেন, "ভাই কি বিপদেই পড়েছি!" তার পর দাদার মুখে [illegible] দুই দিন শুনিলাম না। দাদা যেন এখন সদাই কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক! যাহা হউক, নূতন কুটুম্বদের প্রতি দাদার আদর যত্ন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে দাদাতে আমাতে নির্জ্জনে [illegible]ই, বৌমার কথা উঠিত। সে প্রসঙ্গে দাদা যেন থাকিতেন[illegible] কয় দিন হইতে দাদা আর

তেমন তন্ময় হইয়া এক স্থানে বসিতে পারেন না। আর বৌমার প্রসঙ্গও বড় উঠে না। দাদার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—এখনকার মনের ভাবটিও যেন কতকটা না বুঝিলাম, তা নয়। কিন্তু দাদা আমায় এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুই এক দিন কি যেন বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। অন্য প্রসঙ্গ তুলিতেন, লজ্জায় আর আসল কথাটি বলা হইত না।

তবে দাদা ত আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক,—তিনি যাহাতে সুখী হন, সেই ত ভাল—তখন দাদার লজ্জার বাঁধ আমিই ভাঙ্গিয়া দিলাম। এক দিনে বাটীর মধ্যে সকলের সমক্ষেই, দাদাকে বিবাহের কথা বলিলাম,—কথাটা তুলিতেই, সেই ঝি, মাসীঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া একটু আঁচাআঁচি করিল। ঠোঁট ফুলাইয়া একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চখ মটকাইল! দৈবক্রমে সেটাও আমার চক্ষে পড়িল। ঝির মনের ভাবটা—"উনি না বল্লেই যেন সব আটকাচ্ছিল!" তা যাই হোক, আমার বিবাহের প্রস্তাব, আর অমনি দাদার সম্মতিপ্রকাশ আর কি? একবার যখন চক্ষুলজ্জা ঘুচিয়া গেল, তখন আর বাধা কিসের বল? দাদা আমার উদ্যোগী হইয়া অগ্রহায়ণের প্রথমেই মৈত্রিকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের দশ পনর দিন দাদা সস্ত্রীক বাটীতেই থাকিলেন। বড় বধূঠাকুরাণী, এই কয় দিনের মধ্যে ঘর সংসার বেশ চিনিয়া লইলেন। এই জন্যই বলে,

"যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।"

দাদা আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসার স্থানে গেলেন। মাউই ঠাকুরাণীও—ভূতপূর্ব্ব মাসী মহাশয়া—স্বামী কন্যা সহ গৃহে গমন করিলেন। [illegible]মা যাইবার সময়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া যাইতে [illegible]লেন না।

দাদা এখন মাঝে মাঝে শ্বশুরবাটী যান। বিবাহের ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে জানিলাম, বড় বধূঠাকুরাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। বড় সুখের কথা। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ [illegible]। দাদার পুত্র হইয়াছে, এর চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে[illegible] এই সন্তান যদি বৌমার, যাক্—সুখের দিনে সে [illegible] কথায় আর কাজ কি?

বিবাহের পর প্রায় [illegible] এইরূপ বিধিনির্ব্বন্ধনায় বড় বধকে

পিত্রালয়ে থাকিতে হইল। তবে দাদা অবশ্য ২।১ মাস অন্তর শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। এ দুইবারের পূজার কয় দিন বাটী থাকিয়া, অবশিষ্ট ছুটিটাও দাদা শ্বশুরালয়ে কাটাইলেন। নবকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বড় বধূঠাকুরাণীর আগমন হইল। দাদাও সে সময় বাটী আসিলেন, আর দুই চারি দিনের মধ্যেই মাউইমা (দাদার এ পক্ষের শাশুড়ী) তাউই মহাশয় (দাদার হালি শ্বশুর) এবং তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গের, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝিরও আবির্ভাব হইল। বাড়ীখানি যেন হইল কাকসমাকুল বটবৃক্ষ। ছোট বধূ একা, এতগুলি লোকের তত্ত্বাবধান করিতে হিম সিম খাইয়া গেল। বড় বধূ ত এখন কুটুম্ব মানুষ বলিলেও চলে,—তবে, এ চাই, ও চাই, ইত্যাদি ফরমাইসে তিনি ঘরের লোকের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই যা রক্ষা !

অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেলে, কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাউইমা যাইবার সময় আমার দু'খানি হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখ বাবা, তোমাদের বড় বৌ রইল, ছেলেমানুষ, ওর কোন দোষ টোষ ধরো না।" বাটীর মধ্যের ওদের কাছেও নাম ধরিয়া, "মা পিয়ু, (প্রিয়ম্বদার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, বৌমা-সম্পাদিত) তুমি বড়, সৈরিণ ছোট, ছোট বোনের কোন অপরাধ নিও না ;" ইত্যাদি আপ্যায়িত সুধাবর্ষণ করিয়াছিলেন।

মাউইমা যাই বলুন, এবার বড় বধূঠাকুরাণী কিন্তু পাকা গৃহিণী হইয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত স্পষ্ট কথা না বলিলেও 'জনান্তিকে' ফাই ফরমাইসটা চলে, অর্থাৎ আমার সমক্ষে ছোট বধূকে উপলক্ষ করিয়া "দিদি, ঠাকুরপোকে বলো" ইত্যাদি।—কিন্তু যাহাকে বলিতে বলিতেন, তাহার কোন কথা বলার প্রয়োজন হইত না,—আর বলিবেই বা কে ? বড় বধূর [illegible] আমার সহিত কথা কওয়া দূরে থাক; সে এক গলা ঘোমটা দিয়া জুজু [illegible] এক পায়ে দাঁড়াইত। বধূর ও সব বালাই ছিল না। তাঁহার একটি [illegible] [illegible]য়াছে, অতএব ঘোমটা মাথায় আশ্রয় পাইয়াছিল ; ছোট বধূ এখন [illegible] পুত্র ও তিন কন্যার জননী, কিন্তু কেমন অবুঝ, এ পর্য্যন্ত ঘোম[illegible] [illegible] কমাইল না। আমার উপদেশ, নজির, সব বৃথায় [illegible] কি ?

[illegible]। বড় বধূ ক্রমে ক্রমে গিন্নিপনার গুরুভার হইতে ছোট

বধূকে মুক্তি দিতে থাকিলেন। সে বেচারাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাটীর যে ঝি ছিল, সে নীচজাতীয়া, সে বাসনাদি মাজিত, উঠান ঝাঁট দিত, ফাইফরমাইস খাটিত, সুতরাং ছোট বধূর এখন কেবল কাজ রহিল, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, ছেলেদের খাওয়ান, জল আনা, বাটনা বাঁটা, রাখাল কৃষাণদের ভাত দেওয়া, গৃহদেবতার সেবানুষ্ঠান করা, আর দুটি বেলায় কেবল চারি রান্না আর পরিবেশন, এইমাত্র। আর বড় বধূর হাতে ভাঁড়ার ঘর খোলা, দেওয়া, আবার তেলটুকু নুনটুকু বের করা পর্য্যন্ত সব কাজ। যে ঝি আসিয়াছিল, সে কুটুম্ববাড়ীর লোক,—কাজেই সে শুধু খোকাকে লইয়াই থাকিত, আর মধ্যে মিশেলে, বড় বধূর ভাণ্ডারগৃহের কার্য্যে সাহায্য করিত। বড় বধূ এখন রাঁধিবার চাল নিজে মাপিয়া দেন, গণা গুণিয়া ঘি দেন, আর এক পোয়ার স্থানে পাঁচ ছটাক তৈল লাগিলে, পাকশালের অধিকারিণী ছোট বধূর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। আমি শুনি, আর হাসি, আর ছোট বধূকে বলি, "এবার কেমন শক্ত গিন্নির পাল্লায় পড়েছ?" সে বেচারীও হাসে। কিন্তু হায়! আগে কে জানিত বল, হাসি হবে আঁখিজল,—বড় বধূর ব্যবহার ক্রমে কটু হইতে কটুতর হইতে লাগিল। ছোট বধূর আর না কাঁদিয়া দিন যায় না। সে তবু নীরবে সকলই সহিত। তা, রামের বাণ না হয় সহা গেল, কিন্তু ঐ যে রামের অনুচর, তার কিচমিচি, আর দন্তবিকাশন, সেটা নিতান্তই অসহ্য। ঝিও কি না মাঝে মাঝে ছোট বধূকে তিরস্কার করিতে সাহস পায়। আমি এক দিন স্বকর্ণে শুনিলাম, ঝি ছোট বধূকে উপলক্ষ করিয়া তীব্রকণ্ঠে হাত নাড়িয়া বলিতেছে—"রোজ রোজ বারণ করি, তা শোন না কেন? চাকরদের অত ভাল তরকারী দেবার কি দরকার? তোমাদের ত আর রোজগার করতে হয় না যে, দরদ লাগবে? সোয়ামীর কড়ি হতো ত বুঝতে পারতে।" ছোট বধূ কিছু উত্তর দিল কি না শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার আর সহ্য হইল না। ঝিকে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "ঝি, তুমি ঝি, ঝির মতই থাক্‌বে, ছোট মুখে বড় কথা কেন? মুখ সামলে চলো।" আর কি রক্ষা আছে! [illegible] উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও "তোমার সঙ্গে এসে, আমার [illegible] [illegible]চনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বধূঠাকুরাণীর কর্কশ কণ্ঠে [illegible] [illegible]মে বাঁধা। বধূঠাকুরাণী বলিতেছেন, [illegible] কারু খায় না পরে? না কারু গলগ্রহ হয়ে [illegible]

একটা কথা গায়ে না সয়, তবে নিজে রোজগার করে, আলাদা সংসার কল্লেই ত চুকে যায়। একটা ঝি আছে,—তা আর হিংসেয় বাঁচেন না,—কেন রে বাপু! আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, সাত জনার হাততোলায় পড়ে আছি, আমার সঙ্গে এত কেন? সাধ্যি থাকে, নিজের পয়সায় ঝি রেখে, যত ইচ্ছে অপমান কল্লেই ত হয়। আমার ঝিকে, কিছু বল্লে ভাল হবে না কিন্তু।"

আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। সেই ক্রোধান্ধ অবস্থায় কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলাম, পিছু হইতে কে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, "ছি! তুমিও কি পাগল হলে?" তাই ত ছোট বধূ ঠিক বলিয়াছে, বড় বধূর যে মেজাজ, তাতে আমি যদি সামান্য একটা কিছু বলি, তবে আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং সে দিন আমি আর বাক্‌নিষ্পত্তি করিলাম না। ভাবিলাম, দাদা আগে আসুন, তার পর যা হয় করা যাবে। কিন্তু এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। দাদা ইহার ভিতর দুই বার বাড়ী এলেন; বলি বলি করিয়া, দাদাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেমন বাধ বাধ ঠেকিল।

এক দিন দাদা আর আমি বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, সহসা বড় বধূর কণ্ঠ, কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া মরমে পশিল। "বসে বসে কেবল শূয়রের পাল বিওবেন, আর জ্ঞাতিবাদ সাধবেন!" বেশ বুঝা গেল, সে বাক্যবাণ ছোট বধূর উদ্দেশেই বিক্ষিপ্ত। কিন্তু দাদাও যেন সে স্বরশরে কিঞ্চিৎ আহত হলেন। আমি কথাটি শুনিয়াছি কি না, সন্দেহে দাদা আমার দিকে চাহিলেন; আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া শেষ মুখ নত করিলেন। দাদা বড়ই [illegible] হইলেন। "কি পাগলামি করে"—বলিয়া উঠিয়া বড় বধূর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবার বড় বধূর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কি অন্যায় কথাটাই বলেছি,—অত ভয় করে থাকা আমার পোষাবে না। * * * তা আর চুপ চুপ কি? আমার কাছে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, আমার স্পষ্ট কথা। আমি অত অসইরন সইতে পারিনে। * * * কেন, আমি চুরী করেছি [illegible] রেছি। ওঁরা বসে বসে গেরস্থালিটা পয়মালে দেবেন, আর [illegible] দেখতে হবে? অত আহ্লাদ আমার কাছে খাটবে [illegible]

এবার দাদার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দাদা কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তোমার তাতে কি? তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?" আর যাবে কোথা? বড়

বধূর রোদনে ঘর [illegible] গেল। রোদনের সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেল, "তা ত বটে, আমার মাথা ব্যথা হবে কেন? বড় ব্যথা ওঁর ভাইয়ের আর ভাজের। তা থাক না কেন ভাই আর ভাজ নিয়ে; আমার বল্‌বার কি গরজ? আমাকে আজই বিদায় করে দাও। না দাও ত দিব্যি আছে।" দাদা উর্দ্ধফণ ফণীর মত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন রণে ভঙ্গ দিয়া ফিরিলেন যেন কেঁচোটি! দাদা আপন মনে বলিতে বলিতে এলেন—"কি আপদই জুটিয়েছি।" দাদা যে ক'দিন বাড়ী ছিলেন, তাঁর দিন বড় অশান্তিতেই কাটিল। বড় বধূ কিছুতেই বর্গ মানেন না। হাত চেয়ে আম বড়, এঁবড় প্রবাদ। দাদা বাটী হইতে রওনা হইবার দিন, আমায় কাতরভাবে বলিলেন, ভাই! "আমার প্রায়শ্চিত্ত [illegible] হয়েছে; কিন্তু এখন আর উপায় কি? মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার এই ভোগ ভুগতে হবে। আমার মুখ চেয়ে, সব সহ্য কর ভাইটি আমার! গায়ের ক্ষত, এ যে ফেলবার নয় বিনু। আর, ও লোক নিতান্ত মন্দ নয়, তবে মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেলে, পাগলের মত হয়ে যায়, এই বড় বিপদ।" দাদার অবস্থা বুঝিতে বড় বাকী ছিল না, আজ আরও বুঝিলাম। তাঁর জন্য বড় ব্যথিত হইলাম।

দাদা এবার প্রায় তিন মাস বাটী আসিলেন না।

পূজার পূর্ব্বে আর বাটী আসিতে পারিবেন না, লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। খরচপত্র সব আমার নামেই পাঠাইতে লাগিলেন। বাটীর অশান্তি কাজেই দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

পূজার প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে বড় বধূর সহসা যেন একটা পীড়া দেখা দিল। তিনি আর ভাল করিয়া আহার করেন না। মাথায় তেল দেন না। ফরসা কাপড় পরেন না।

পূজা আসিল, দাদাও বাটী আসিলেন। বড় বধূর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মূর্ত্তি মলিন, শরীর কৃশ, গায়ে খড়ি উঠিতেছে, মাথাটা যেন কাকের বাসা।

পূজার কয় দিন কোনরূপে কাটিয়া গেল। একাদশীর দিন প্রাতে, দাদা বাটীস্থ সমস্ত পরিবারবর্গের সাক্ষাতে আমায় বলিলেন, "বিনয়! আর আমাদের [illegible] থাকা পোষায় না। তোমার হাতে সংসারের ভার থাকিতে বাটীর বড় [illegible] কিনা ছেঁড়া কাপড়, মাথা রুক্ষ, আর খাওয়া অভাবে মানুষটি যেন [illegible] রোগী, আমি ত মাসে মাসে মুঠো মুঠো টাকা পাঠাই, তবে এমন হয় কেন? 'লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা!' এ সব কি সহ্য হয়! "আমি ত অবাক; পরে

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আসল ব্যাপার বলিতে যাইতেছিলাম, দাদা বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্, আর ঢাকিবার দরকার নাই। ঝির মুখে ও সব শুনেছি।"

আমার কথায় দাদার অবিশ্বাস, বড় মর্ম্মাহত হইলাম, চক্ষে জল আসিল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে দাদাকে বলিলাম, "আপনি যাহা ভাল বুঝেন, করুন।" অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

দাদা যে এমন করিবেন, তা যে স্বপ্নের অগোচর! বৌমা, আজ তুমি কোথায়? বেলা ১১টার সময় বাটী ফিরিলাম। দেখি, সব ঠিকঠাক। ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র, বিছানা, দাদা সব বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, চুল চিরে ভাগ। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি যা—সবই যে দাদার নামে, আমার হাতে একটি পয়সাও না[illegible] তিনটি কন্যা গলায় বাঁধা।

ছোট বধূ বিষণ্ণবদনে রাঁধিতেছেন, আর ছেলে মেয়েগুলি তাহার কাছে বসিয়া আছে, সকলেই যেন স্ফূর্ত্তিহীন।

আমিও সেইখানে একটু দূরে বসিলাম।

বড় বধূর আজ বড় ধুমধাম, আজ তাঁহার রন্ধনের আয়োজনই বা কত সেই ঝি কাছে বসিয়া জোগাড় দিতেছে, আর মাউইমাকে আনিবার ব্যবস্থা-পত্রের খশড়া করিতেছে। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা জানিতে পারিয়াই যেন তাঁহাদের কথোপকথন অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ হইল ঝির কি একটি কথার উত্তরে বড় বধূ বলিলেন, "দেখুক এখন—কত জলে [illegible] মুগুরি ভেজে।"

আমি বসিয়া বসিয়া সব শুনিতেছি, আর কত কি ভাবিতেছি, এ[illegible] দাদা বাড়ী আসিয়া আমার বড় মেয়ে সুশীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "[illegible] বৌমার কাছ থেকে একটু তেল আন্ত। স্নান করে আসি।" আমি প্রা[illegible] স্নান করিতাম। দাদা তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলেন, গামছা মাথাতেই ছিল। "বৌমার কাছ থেকে তেল নিয়ে আয়!" দাদার আবার একি ছল [illegible] কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কি?

ভাত প্রস্তুত। ছোট বধূ আমায় আহার করিতে ডাকিলেন। [illegible] আমার কান্না আসিল। "দাদার সহিত পৃথক হইয়া খাইতে হইবে[illegible] ছেলের আর আমার দু'খানি আসন পাতা। আমি তখনও কি ভা[illegible] ইতিমধ্যে দাদা স্নান করিয়া আসিলেন; আমারই একখানি কাপড় প[illegible]

ছাড়িলেন; তার পর, "বিন্দু, চল খেতে যাই" বলিয়া সেই আসনে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "বৌমা ভাত আন!" আমি ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। দাদার দ্বিতীয় ডাকে, মন্ত্রমুগ্ধবৎ আহারে বসিলাম। দাদা বেশ হাসিতে হাসিতে অন্য দিনের মত গল্প করিতে করিতে আহার শেষ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, দাদার একি কাণ্ড!

ঝি আমার সহিত দাদাকে আহার করিতে দেখিয়া গিয়া বড় বধূ ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল। ভীমমূর্ত্তি বড়বধূ তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই ত গালে হাত দিলেন। তার পর, কি বলিতে যাইতেছিলেন, দাদা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌চ? তোমার ভিন্ন হতে বড় সাধ, তাই তোমাকে ভিন্ন করে দিলাম। আমি আর বিন্দু কি ভিন্ন?"

আনন্দে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল,—তবে দাদা আমার সেই দাদাই আছেন।

ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া লাগিল। বড়বধূর মেজাজ যেন কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। সে ঝি কিন্তু বিদায় পাইল।

সেক্সপীয়র।

তৃতীয় প্রস্তাব।

...পীয়রের চরিত্রচিত্রণের প্রণালী কিরূপ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার চিত্র সুসম্পূর্ণ; বিকৃত, অপর্য্যাপ্ত, ...অসঙ্গত নহে। তাঁহার চরিত্রচিত্রণ সত্যনিষ্ঠ, যথাযথ, এবং সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ...স্বাভাবিক। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী বিবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ, এবং তাঁহার চিত্রণে আমরা মানবচরিত্র বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞানের পরিচয় পাই। ...ঙ্গে তাঁহার উদার অপক্ষপাতিতা এবং অপরিসীম উপেক্ষাভাবে ...হইতে হয়। এবং ধারণা হয় যে, তিনি সর্ব্বত্র সমান সহানুভূতিশালী। ...সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রাণময় জীবন্ত নরনারী, এক কথায় সজীব মনুষ্য। ...চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করেন।

চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা, একটা বিপুলতা, একটা হ্রাসবৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ নহে; তাহাদের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি আছে।

এক কথায় বলিতে গেলে সেক্সপীয়র চরিত্রচিত্রণে সিদ্ধহস্ত। চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার দক্ষতা, নিপুণতা অদ্ভুত ও অপরিসীম। এই দক্ষতা নিপুণতা তিনি কোন্ প্রতিভাবলে লাভ করিয়াছিলেন? অমানুষী কল্পনাশক্তিতে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

আমি দেবদত্তকে ঘনিষ্ঠরূপে চিনি, তাঁহার চরিত্রের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি অনুমান করিয়া বলিলাম যে, দেবদত্ত অবস্থার বিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইলে অভিমানে লোকালয় বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা গেল যে, দেবদত্ত দারিদ্র্যভাবে প্রপীড়িত হইয়াও জনসমাজে পূর্ব্বের মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা। আমি মনে করিতাম, দেবদত্তকে চিনি; এখন বুঝিলাম, তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার বাস্তবিক পরিচয় ঘটে নাই। প্রকৃত দেবদত্তকে আমি চিনি না। আমার আর এক পরিচিত ব্যক্তি রত্নদত্ত। তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। রত্নদত্ত ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, উন্নত চরিত্রের পুরুষ। রত্নদত্তের একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা হইল। আমি অনুমান করিলাম, ইহাতে রত্নদত্তের ঈশ্বরভক্তি দৃঢ়তর হইবে, ফলতঃ তাহাই হইল। রত্নদত্তের ব্যবসায় বাণিজ্য সঙ্কটাপন্ন হইবার উপক্রম হইল। আমি অনুমান করিলাম, ইহাতে রত্নদত্তের হৃদয়ে প্রগাঢ় বৈরাগ্যের উদয় হইবে; ফলতঃ তাহাই হইল। দেখিলাম, আমার অনুমান সত্য। বস্তুতঃই রত্নদত্তের চরিত্রের সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় হইয়াছে।

আমি রত্নাবলীর সহিত পরিচিত নহি; তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র। সংবাদপত্রে এক দিন তাঁহার একটা কীর্ত্তির কথা পড়িলাম। আর এক দিন শুনিলাম, তিনি একটা প্রকাণ্ড লোভের মধ্যে পড়িয়া আত্মসংবরণ করিয়াছেন। পরে তাঁহার সম্বন্ধে একটা গণনা করিলাম। স্থির করিলাম যে, অমুক অবস্থায় পড়িলে রত্নাবলী এইরূপ করিবেন। আমার গণনা ফলিল না; আমার অনুমান মিথ্যা হইল। বুঝিলাম, রত্নাবলীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক জ্ঞান জন্মে নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বিজ্ঞান উন্নতির চরম ফল গণনা-সাফল্য। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র যতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ভবিষ্যৎগণনা ততটা সঠিকরূপে করা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই জন্য এক শতাব্দী পরে যে সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হইবে, আজ তাহার সঠিক গণনা করা যায়। বৃষ্টি-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে নাই, সেই জন্য কত দিনে কি পরিমাণ ঝড় বৃষ্টি হইবে, তাহা ঠিক গণিয়া বলা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলেন, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের বিষয়েই তাহা বলা যায়। জ্ঞানের স্বধর্ম্মই এই যে, জ্ঞানবানকে গণনা-শক্তি-সম্পন্ন করে। দেবদত্তের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ ঠিক গণিয়া উঠিতে পারি নাই ; তাহার কারণ এই যে, দেবদত্তের চরিত্র সম্বন্ধে আমার যথার্থ জ্ঞান ছিল না। রত্নাবলীর প্রকৃতি বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয় নাই বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইল। আর রত্নদত্তের স্বভাব বিষয়ে আমার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাহার ভাবী কার্য্যাকার্য্য আমি ঠিক গণিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম। অতএব গণনার সাফল্য-বৈফল্য জ্ঞানের প্রকর্ষ-নিকর্ষের সম্পূর্ণতা-অপূর্ণতার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। রত্নাবলী, দেবদত্ত ও রত্নদত্তের অনুরূপ নরনারীকে নাটকের পাত্রপাত্রী করিয়া আমি এক মহা-নাটক লিখিয়া অমরতা সঞ্চয় করিবার সংকল্প করিলাম। একটা যে বড় দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা প্রথমটা বুঝিলাম না। আখ্যায়িকা হইলে, যাহা হয় একটা করিয়া তুলিতে পারিতাম। কারণ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা আছে, চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া কাহাকে বা নিন্দাবাদ, কাহাকে বা সাধুবাদ উপহার দিয়া হয় ত একটা জাঁকাল রকমের চরিত্র বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটিল না। কারণ নাটককারের পক্ষে চরিত্রবর্ণনা যথেষ্ট নহে, চরিত্রচিত্রণ আবশ্যক। এখন বর্ণনা ও চিত্রণে অনেক প্রভেদ। কারণ চরিত্র চিত্রিত করিতে হইলে পাত্রপাত্রীর ঘটনাবিশেষের সংস্থানে যেরূপ কার্য্য করা সঙ্গত, ভাববিশেষের আবেশে যেরূপ কথা সম্ভব, নাটকের মধ্যে আমাকে সেইরূপ কার্য্য করাইতে হইবে, সেইরূপ কথা বলাইতে হইবে। মনে করুন, রত্নাবলীর হৃদয় প্রথম প্রণয়ের অরুণরাগস্পর্শে বিকশিত হইয়াছে ; সে এরূপ অবস্থায় যেরূপ কথা বলা সম্ভব, আমাকে তাহার সঠিক অনুমান করিতে হইবে।

দেবদত্ত প্রণয়িনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছে। সে এরূপ ঘটনায় কিরূপ কার্য্য করিবে, কিরূপ কথা বলিবে, আমাকে তাহা ঠিক গণিয়া বলিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক পাত্রপাত্রী যে কয়টি কথা বলিবে, বা যে কয়টি কার্য্য করিবে, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে গণনা করিতে হইবে। যদি আমার অনুমান প্রকৃত হয়, যদি আমার গণনা ঠিক হয়, তবেই আমার চরিত্রাঙ্কন সত্যানুগত হইবে, তবেই আমার চরিত্রসৃষ্টি যথাযথ হইবে। তাহা হইলেই আমার অমরতালাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে, অন্যথা নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গণনার সাফল্য বৈফল্য জ্ঞানের প্রকর্ষ-নিকর্ষ সাপেক্ষ। অতএব নাটকের পাত্রপাত্রীর চরিত্র যদি আমার যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকে, তবেই আমার অনুমান সত্য হইবে, আমার গণনা সফল হইবে, অন্যথা হইবে না।

উক্ত নাটকের দুই অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম যে, এক জন দেশভক্তের অবতারণা না করিলেই নয়। এবার বড় বিপদে পড়িলাম। কারণ রত্নদত্ত, দেবদত্ত ও রত্নাবলীর চরিত্র আমার পরিচিত নরনারীর চরিত্রের প্রতিকৃতি লইয়া আঁকিতেছিলাম; কিন্তু দেশভক্তের প্রকৃতি আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কিন্তু উপায় কি? অমরতার সাধে ত আর সহসা জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। সুতরাং কল্পনার সাহায্য লইতে [illegible] দেশভক্তের যেরূপ ভাব ভঙ্গী ভাষা কার্য্য, সেই সমস্তের সমাবেশ করিয়া এক অভিনব চরিত্রের সৃষ্টি করিলাম। যদি আমার কল্পনা তেজস্বিনী হয়, যদি চরিত্রের উপাদান সকল মিশাইতে পারিয়া থাকি, তবেই একটি ঠিক মানুষ গড়িলাম। সে সজীব সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইল। আর যদি আমার কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হয়, যদি আমি চরিত্রের উপাদান সকল পুঞ্জীভূত করিয়া থাকি মাত্র, রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এক কিম্ভুতকিমাকার জীবের গঠন করিলাম মাত্র। আমার অমরত্বের সাধ হৃদয়েই বিলীন করিতে হইল। আমার নাটক পাঠোপযোগী হইল না।

উপরে আপনাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া চরিত্রচিত্রণের যে সকল প্রণালী সূত্রের সূচনা করিলাম, সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে তাহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে সেক্সপীয়রসৃষ্ট চরিত্রাবলীর যাথাতথ্য সত্যানুগততার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, সেক্সপীয়র যেরূপ যথাযথ চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, অন্য কবির কার্য্যে

তাহা মুর্তি। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেক্সপীয়র তাঁহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথায়ও অতিরঞ্জন বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। অতএব মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল, মানবচরিত্র যে তাঁহার বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সেক্সপীয়র সৃষ্ট চরিত্রাবলীর একটি প্রধান বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। জগতের কোন কবিই এত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেক্সপীয়র শত শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। তাঁহার সৃষ্ট কোন দুইটি চরিত্র অস্বতন্ত্র নহে। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। কেলিবন ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম্, থিসিয়ুস এবং প্রস্পেরো; পেরোলিস ও হটস্পার এবং পঞ্চম হেনেরি; ডোলটিয়ারসিট ও ইসাবেলা এবং ক্যাথিরিন; ক্লিয়োপেটরা ও রোজালিন্দ এবং ইমোজেন; জষ্টিস স্যালো ও জেক্স এবং হ্যামলেট—তাঁহার মহা নাটকের পাত্রপাত্রীগণ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অশেষ প্রকার মানবচরিত্রের সহিত সেক্সপীয়রের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। মানব-প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানবের প্রকৃতি বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তবৃত্তি বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। মানুষের যত প্রকার ভাব আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রেম—সেক্সপীয়রের নাটকে সকল ভাবেরই যথাযথ সমাবেশ দেখিতে পাই। অতএব মানবের বিবিধ বিচিত্র চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধেও তাঁহার প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল—প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা, মানুষের চিত্তবৃত্তিবিষয়ে এই প্রভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, সেক্সপীয়র কোথা হইতে পাইলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি?

এ সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া সমালোচকগণ কিছু ফাঁফরে পড়িয়াছেন। কেহ তাঁহার নাটকে ব্যবহারাজীবের প্রণালী পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে আইন-ব্যবসায়ী, অন্ততঃ উকিলের অতি নিকটস্থ ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ তাঁহার নৌ-বিদ্যা বিষয়ে

প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নাবিক স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কেহ তাঁহাকে ডাক্তার, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ যোদ্ধৃপুরুষ, কেহ কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও চেষ্টার সফলতা হয় নাই। কারণ, একের সিদ্ধান্তের সমর্থন পক্ষে যে প্রমাণ, অপরের পক্ষেও ঠিক তাহাই। তাঁহাকে উকিল প্রতিপন্ন করা যত সহজ, ডাক্তার প্রতিপন্ন করা তদপেক্ষা এক রতিও কঠিন নহে। যে যুক্তিবলে তিনি ধর্ম্মযাজক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ঠিক সেই প্রণালীর যুক্তিপ্রয়োগে তাঁহাকে সেনানায়ক প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্ববিধ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমান অভিজ্ঞতা। তিনি যখন ফরাসিদেশের প্রান্তরে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সৈনিকের ছবি অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, তিনি বুঝি আজীবন কেবল সেনাসংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিযাছেন। তিনি যখন বীচিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে নেপলসরাজের মজ্জমান অর্ণবযানের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, বুঝি তাঁহার সারা জীবন নাবিক-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরবাণী ক্লিয়োপেট্রাব বিলাস-শয্যার উপান্তে সারল্য ও বর্ব্বরতার প্রতিমূর্ত্তি সাপুড়িয়াকে স্থাপন করেন, তখন মনে হয়, বুঝি জন্মাবধি এই শ্রেণীর জীবই তাঁহার আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। আবার যখন তিনি অ্যান্টনি অথবা কোরায়োলেন্স অথবা ম্যাকবেথ অথবা ইয়াগো অথবা ফলষ্ট্যাফ অথবা প্রস্পেরো অথবা সাইলক অথবা লিয়র অথবা হ্যামলেট অথবা টাইমনের বেশে বহুরূপী সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি কি ছিলেন এবং কি না ছিলেন, কি জানিতেন অথবা কি না জানিতেন, কোন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, কোন্ বিষয়ে না ছিল, এ সকল নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা বিভোর মনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকি, এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করি যে, তিনি সাধারণ মানুষের মত দেখিয়া শিখিয়া, বুঝিয়া শুনিয়া কিছু জানেন নাই বুঝেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শনজনিত নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী স্বতন্ত্র।

এইরূপে তাঁহার নাটকে বিচিত্র চিত্তবৃত্তির, বিবিধ ভাবের যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিয়া অনেক সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি যে সকল ভাবের স্বরূপচিত্র তাঁহার নাটকে ফুটাইয়াছেন, তাহা স্বয়ং অনুভব করিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্য কিংজন নাটকে পুত্র আরথরের বিয়োগবিধুরা জননী কনস্টন্সের মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিয়া

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি পুত্রবিয়োগের অসহ্য যাতনায় পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-জীবনের শেষভাগে বিরচিত সিম্বেলিন বা উইন্টারস্ টেল নাটকে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর পতি-পত্নীর পুনর্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে সেক্সপীয়র গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিয়া নির্য্যাতিতা প্রণয়িনীকে পুনর্বার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। আবার কোন সমালোচক প্রেমবৈচিত্র্যে তরঙ্গায়িত প্রণয়-কাব্য-জগতের সারভূত সেক্স-পীয়রের সনেট কবিতাবলীর রসাস্বাদ করিয়া—পূর্ব্বরাগ রসাভাষ মিলন বিরহ ঈর্ষা অভিমান নৈরাশ্য নির্য্যাতন প্রভৃতি ভাবশবলতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সেক্সপীয়রকেই সনেটে চিত্রিত প্রেমনাটকের নায়ক, তাঁহার এক বা একাধিক প্রণয়িনীকে তাহার নায়িকা, এবং তাঁহার এক অবিশ্বাসী বন্ধুকে তাহার উপনায়ক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সকল সিদ্ধান্ত যে একবারে অসম্ভব বা অমূলক, তাহা বলিতেছি না। হয় ত ইহাদের ভিত্তিতে কতকটা সত্য নিহিত আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, যদি ঐ ঐ কারণে সেক্সপীয়রকে পুত্রশোকাতুর, পত্নী-মিলন-হর্ষোচ্ছ্বসিত, অথবা প্রেমবৈচিত্র্যে উদ্বেল হৃদয় মনে করা সঙ্গত হয়, তবে প্রেমাতুর রোমিওর প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া, ঈর্ষ্যাকলুষিত ওথেলোর মর্ম্মবেদনা শুনিয়া, নির্য্যাতন-গ্রস্ত লিয়রের অভিশাপবাক্যে নির্দগ্ধ হইয়া, শোণিতকর্দ্দমাক্ত ম্যাকবেথের নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবসাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, কবি দার্শনিক হ্যামলেটের জীবনসমস্যার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানে কর্ণপাত করিয়া, এবং নরদ্বেষী টাইমনের বিকট আর্ত্তনাদে বধিরিত হইয়া আমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? ইহা হইতে কি এই নিশ্চয় করিব যে, সেক্সপীয়র ঐ সকল অসাধারণ ভাব স্বয়ং অনুভব করিয়া তবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন? অর্থাৎ, তিনি একাধারে ম্যাকবেথ হ্যামলেট ওথেলো লিয়র টাইমন আণ্টনি সিজার পসথুমস ব্রুটস্ রোমিও হটস্পার হেনরি কোরিবন প্রস্পেরো ফলস্টাফ প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। এ মতে তিনি পুরুষ হইয়াও নারীহৃদয়ের অসাধারণ ভাবনিচয় অনুভব করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ংই দেসদিমোনা ওফিলিয়া মিরন্দা পর্দিতা হেলেন পোর্সিয়া রোজালিন্দ এমিলিয়া কুইকলি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিশালিনী রমণীও ছিলেন। তাহা কোন রূপেই সম্ভবপর মনে

হয় না। পরন্তু ইহাই মনে হয় যে, কি মানব-প্রকৃতি, কি মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি, কোন বিষয়েরই অভিজ্ঞতা সেক্সপীয়র ভূয়োদর্শন দ্বারা লাভ করেন নাই। তাঁহার এ সম্বন্ধে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালী কি? যদি সে প্রণালীর আমরা স্বরূপনির্ণয় করিতে পারি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার কি মূলতত্ত্ব বা বীজশক্তি, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিব। অতএব একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ঐ প্রণালীর স্বরূপনির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু পদার্থ আমাদের জ্ঞান অথবা কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, বৃক্ষ নদী পর্ব্বত পশু পক্ষী নরনারী, প্রত্যেকই কতকগুলি গুণ এবং ক্রিয়ার সমষ্টি। প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি অবয়বের সংহতি। একদা পথে যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষ আমার নয়নগোচর হইল। দেখিলাম, পত্র-পুষ্পমণ্ডিত হইয়া বৃক্ষটি পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া বৃক্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, বৃক্ষটি পত্র শাখা কাণ্ড ফুল ফল ইত্যাদি নানা অংশে বিভক্ত। দেখিলাম, বৃক্ষটির আকার আছে, গঠন আছে, রূপবর্ণ আছে, মধুর গন্ধ আছে, কঠিন স্পর্শ আছে, আরও কত কি গুণ আছে। আরও দেখিলাম যে বৃক্ষটি বায়ুতে স্পন্দিত হইতেছে। শিকড় মুখে রস শোষণ করিতেছে। পত্রহস্ত বিস্তার করিয়া সৌরকররাশি আদান করিতেছে, আরও কত কি ক্রিয়া চলিতেছে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, বৃক্ষ আর কিছুই নহে, কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। প্রত্যেকেই বহুতর অবয়বের সংযোগে রচিত। প্রত্যেকেই বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। কোন পদার্থের গঠন জটিল, কাহারও গঠন সরল; অর্থাৎ, কোন পদার্থের সংহত অবয়বসমূহ সংখ্যায় অত্যল্প, কাহারও অত্যধিক। আবার কোন পদার্থ ক্ষুদ্র, কেহ বা মহান্, অর্থাৎ কোন পদার্থের পরিচায়ক গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি অল্প, কাহারও বৃহৎ। এইরূপে পদার্থের মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। বুঝিয়া দেখিলে মানবচরিত্রের মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ, ইহার সংহত অবয়ব[illegible] সংখ্যায় অত্যধিক। আর মানবচরিত্রের পরিচায়ক গুণ ও ক্রিয়ার স[illegible] বৃহৎ। সেই[illegible]

মানবপ্রকৃতিকে অতি মহান্ পদার্থ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে পদার্থের গঠন সরল যে পদার্থ ক্ষুদ্র, তাহার জ্ঞান অনায়াসগম্য, সাধারণ বুদ্ধির লভ্য। কিন্তু যে পদার্থের গঠন দুর্গম জটিল, যে পদার্থ মহান্, তাহার জ্ঞান সহজে লাভ করা যায় না, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহার ধারণা করা যায় না।

আমি একান্তে বসিয়া কল্পনার সাহায্যে কোন পদার্থ রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ চেষ্টার প্রণালী কিরূপ ? সেই পদার্থ যে যে অবয়বসংযোগে গঠিত, প্রথমতঃ সেইগুলি কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। মনে করুন, আমি বৃক্ষ কল্পনা করিতেছি। বৃক্ষের শাখা কাণ্ড পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি কল্পনাবলে গঠিত করিতে হইবে। যদি আমার কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হয়, তবে বৃক্ষের সমস্ত অবয়বগুলি আমি এককালে চিত্তে ধারণা করিতে পারিব না। সুতরাং আমার দ্বারা বৃক্ষরচনা দুঃসাধ্য হইবে। যদি কল্পনার বিষয়ীভূত পদার্থের গঠন সরল হয়, সে পদার্থ যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে কল্পনাবলে তাহার সৃষ্টি করা সহজ হইবে। কিন্তু সে পদার্থ যদি মহান্ হয়, তাহার গঠন যদি দুর্গম জটিল হয়, তবে তাহার সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হইবে।

এইরূপে বৃক্ষের সংহত অংশগুলি রচনা করিয়া ক্রমশঃ যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, সেই সমষ্টি কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সমষ্টি যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার কল্পনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। কিন্তু এই সমষ্টি যদি বৃহৎ হয়, তবে তাহার রচনা অতি কঠিন হইবে। আমার কল্পনাশক্তি যদি দুর্ব্বল হয়, তবে এ কার্য্য বোধ হয়, আমার অসাধ্য হইবে। কিন্তু আমার যদি প্রবল কল্পনাশক্তি থাকে, তবে হয় ত আমি সেই বৃহৎ সমষ্টিকে কোন মতে কল্পনাবলে পুনর্গঠিত করিতে পারিব। যদি কল্পনীয় পদার্থের সমস্ত অবয়ব ধারণায় আনিতে পারি, কল্পনার সাহায্যে তাহার নিখিল গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির পুনর্গঠন করিতে পারি, তবেই আমার মনঃসৃষ্ট পদার্থ সুসম্পূর্ণ সত্যানিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না।

কল্পনীয় পদার্থ যদি সাকার না হইয়া নিরাকার হয়, স্থূল না হইয়া যদি সূক্ষ্ম হয়, কল্পনার বস্তু যদি বৃক্ষ না হইয়া মানবচরিত্র হয়, তবে এই কল্পনা-সৃষ্টিকার্য্য কিরূপ গুরুহ ব্যাপার হইবে! আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানবচরিত্রের মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর নাই! আর যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া মানবচরিত্র সে সমষ্টিও অতি বৃহৎ। অতএব কল্পনাবলে মানব-চরিত্রের গঠন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। অতিতেজস্বিনী কল্পনার অধিকারী না

হইলে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করা যায় না। অতি পরিচিত ব্যক্তি কল্পনার সাহায্যে কেহ যদি পুনর্গঠিত করিতে প্রয়াস করেন, তবে সে চরিত্রের যথাযথ অনুকৃতি রচনা কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা পরীক্ষা অনুভব করিতে পারেন। আর সে চরিত্র যদি অর্দ্ধপরিচিত কিংবা অপরিচিত হয়, তবে মানস-সৃষ্টিকর্ত্তার রচনাপ্রয়াস যে সর্ব্বথা বিফল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে আমি কল্পনাবলে বৃক্ষরচনা করিতে বসিয়াছি। যে সকল অবয়বসংযোগে বৃক্ষের গঠন, কল্পনার সাহায্যে তাহার পুনর্গঠন করিয়াছি। পরে যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, কল্পনা-বলে তাহারও সৃষ্টি করিয়াছি। অনেকে হয় ত ভাবিবেন যে, এত দূরে আমার বৃক্ষরচনা শেষ হইয়াছে। আমি কল্পনার সাহায্যে একটি সত্য-সঙ্গত যথাযথ বৃক্ষের প্রতিরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে তাহা নহে। রচনার জন্য যাহা প্রধান কার্য্য, যাহা অত্যাবশ্যক কার্য্য, তাহা আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী, নর, নারী, সমস্তই জীবন্ত, কেহই প্রাণহীন মৃতবস্তু নহে। প্রত্যেক পদার্থের অভ্যন্তরে একটা জীবনী-শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সেই পদার্থের নিখিল অবয়ব সুসংহত থাকে, যে শক্তি দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া সংসাধিত হয়, সমগ্র গুণ নিয়মিত হয়। সে শক্তি সেই পদার্থের জননী ও পালনী। ধান্যবীজে ধান্য হয় কেন, আম্র হয় না কেন? আম্রবীজে আম্র হয় কেন, ধান্য হয় না কেন? ইহার একমাত্র হেতু এই যে, প্রত্যেক পদার্থের এক একটি স্বতন্ত্র বীজশক্তি আছে। সেই শক্তির আধার বলিয়াই পদার্থের গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত; বৈজ্ঞানিক সংযোগে মিলিতমাত্র নহে। সেই জন্য বিভিন্ন বহু গুণের সমবায়ে এক পদার্থের সৃষ্টি হয়। বহুবিধ ক্রিয়া একই পদার্থে লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমি কল্পনাবলে বৃক্ষ সৃষ্টি করিতেছি। যদি কোন মতে বৃক্ষের যাহা বীজশক্তি, সেই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আমার মনের মাটিতে বপন করিতে পারি, তাহা হইলে আম্রবীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে যেমন কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প-সমন্বিত আম্রবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ বীজশক্তি আমার মানসক্ষেত্রে বৃক্ষের একটি সত্যানুগত যথাযথ প্রতিরূপ সৃষ্টি করিবে। সেই প্রতিরূপে বৃক্ষের নিখিল গুণ ও সমগ্র ক্রিয়া রাসায়নিক সংযোগে সম্বদ্ধ হইয়া একীভূত হইবে। তখনই আমার প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষসৃষ্টি হইবে। অতএব

[illegible] কোন পদার্থের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভূতস্রষ্টা [illegible] অনুকরণে সৃষ্টি [illegible] প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথমতঃ, কল্পনাধ্যানে [illegible] পদার্থের বীজশক্তিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। পরে সেই বীজ মানস-ক্ষেত্রে [illegible] করিয়া প্রকৃতির প্রণালীমতে ভিতর হইতে সেই পদার্থকে [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] পদার্থের যথার্থ পুনর্গঠন সিদ্ধ হইবে।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, মানবচরিত্র সম্বন্ধেও ঐ কথাই বক্তব্য। প্রত্যেক চরিত্রেরই একটি বীজশক্তি আছে। ঐ শক্তিবলে তাহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ভাব, সমস্ত ভাষা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চিন্তা নিয়মিত হয়। যদি কোন মতে ঐ বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া আমরা চিত্তভূমিতে বপন করিতে পারি, তবেই মানসপটে সেই চরিত্রের যথাযথ প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিবে। তাহা হইলেই আমাদের সৃষ্ট চরিত্র সত্যানিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না। কারণ, চরিত্রের গুণ দোষ কাছাকাছি মিলিত করিলেই মনুষ্য সৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা তাহাদিগকে মিলিত করিতে হইবে। এক যুগকাল তৈল ও জল মিলাইয়া রাখিলেও তাহা মিশ্রিত হয় না, কিন্তু অম্লজান ও জলজান রাসায়নিক সংযোগে মিলিত একীভূত হইয়া নূতন বস্তুর সৃষ্টি করে। তদ্রূপে চরিত্রের বীজশক্তির সাহায্যে সমস্ত গুণ দোষ কাছাকাছি একীভূত হইয়া সজীব মনুষ্য চরিত্র সৃষ্ট হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, ইংরাজ কবি ড্রাইডেন তাঁর বিদ্রূপের [illegible] জিমার নাম দিয়া বাকিংহামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র বিরোধী বর্ণের সমাবেশে উজ্জ্বলীকৃত; বিদ্রূপকাব্যের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঔপন্যাসিক স্কট তাঁহার উপন্যাসবিশেষে বাকিংহাম-চরিত্রের অবতারণা করিয়া ড্রাইডেনের বর্ণনার অনুকরণে সেই চরিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ, স্কট প্রতিভা-[illegible] বাকিংহাম চরিত্রের যে বীজশক্তি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি বাকিংহামে যে দোষগুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা [illegible]দিগকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। তাহারা পুঞ্জীভূত হইয়া এক বীভৎস জীবের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, মিশ্রিত ও একীভূত হইয়া মানবচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সেক্সপীয়র যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, [illegible] সহিত তুলনা করিলে তাঁহার প্রণালীর ভেদ লক্ষিত

হইবে। তাঁহার ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরায়োলেন্স, হেনেরি, হটস্পার ঐ[illegible] চরিত্র। ইতিহাসে তাহাদের দোষগুণ কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ আছে[illegible] পীয়র সে বিবরণের কোথাও অপলাপ করেন নাই। ঐতিহাসিক ব্রু[illegible] অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরি যে যে দোষগুণের অধিকারী, যে যে কার্য্যাকার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরীতে তিনি সেই সেই দোষগুণের, সেই সেই কার্য্যাকার্য্যের আরোপ করিয়াছেন। অথচ সেই সকল চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সেই সকল দোষগুণ কার্য্যাকার্য্য এমন ভাবে মিশ্রিত করিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সজীব মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরি জীবিত অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, তাঁহার কাব্যে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ঠিক সেইরূপই আছেন।

সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতেন। এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে বুঝা যায়, কেন তাঁহার চরিত্রচিত্রণ সজীব, সত্যনিষ্ঠ, সুসঙ্গত। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, সে সমস্তই ঐরূপে চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিবার অবশ্যম্ভাবী ফল। এমতে আমরা ঐ সকল বিশেষত্বের প্রকৃত হেতু অনুধাবন করিতে পারি। সেজন্য আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণের কষ্টকল্পনার ধাঁধায় পড়িয়া পথ হারাইতে হয় না।

চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করা কত কঠিন ব্যাপার, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। কি কৌশলে, কোন প্রতিভাবলে, সেক্সপীয়র এই কঠিন ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন? অতঃপর ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থ কয়েকটি অবয়বের সংহতি, এবং কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি বীজশক্তি আছে,—ঐ শক্তির প্রভাবেই সমস্ত অবয়ব সংহত থাকে, এবং সমগ্র গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত হয়। সাধারণ মানব কল্পনাবলে ঐ অবয়বসংহতি, ঐ গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি আপন চিত্তদর্পণে কথঞ্চিৎমাত্র প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিবিম্ব

সত্যনিষ্ঠ হয় না। কারণ, যে দর্পণে ঐ প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা হয় স্থুল, না হয় কুজ; কদাচ সমতল নহে। সেই জন্য ঐ দর্পণ যথাযথ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিবিম্বের সহিত বিম্বগ্রাহক চিত্তের উপরাগ * মিশ্রিত হইয়া যে প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে, তাহাতে পদার্থের স্বরূপ যথাযথ প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য সে প্রতিবিম্ব সত্যনিষ্ঠ হয় না।

সেক্সপীয়রের ব্যাপক সহানুভূতি, উদার অপক্ষপাতিতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বত্র সহানুভূতিশালী; কোনও পদার্থেরই প্রতি দ্বেষযুক্ত নহেন। সেই জন্য তাঁহার চিত্তরূপ জাগতিক-পদার্থের যথাযথ প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ ছিল; কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিকৃতির সহিত তাঁহার বিম্বগ্রাহক চিত্তের কোনরূপ উপরাগ মিশ্রিত হইত না। এই সহানুভূতিবলে তিনি সকল প্রকার চরিত্রে আত্মনিমজ্জন করিতে পারিতেন, নদী যেমন আপনা হারাইয়া সাগরে মিশ্রিত হয়, সেক্স-পীয়র সেইরূপ আপনার ব্যক্তিত্ব যখন যে চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন, তাহাতে মিশাইয়া দিতেন। সৃষ্ট চরিত্রের সহিত একীভাব তাঁহার প্রতিভার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। সেই জন্য তাঁহার এত গ্রন্থ মধ্যে কোথাও তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানা যায় না। তিনি এত বিভিন্ন ভাবায় কথা কহেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা কি, তাহা জানা দুর্ঘট। যাহার মুখে যে কথা সাজে, যে মতামত যাহার প্রকৃতিসঙ্গত, তিনি তাহার মুখে সেইরূপ কথা, সেই মতামত বসাইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকমধ্যে একই বিষয়ে বিভিন্ন ও বিরোধী মতামতের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

সাধারণ কল্পনাসৃষ্ট পদার্থের প্রতিরূপ সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ হয় না। কেন সত্যনিষ্ঠ হয় না, তাহা আমরা বুঝিয়া দেখিলাম। কেন সুসম্পূর্ণ হয় না, তাহার হেতু ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতে অপারগ বলিয়া সাধারণ কল্পনাশক্তি তাহার সুসম্পূর্ণ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু এই কল্পনাশক্তি যদি অসাধারণ হয়, অমানুষী হয়, তবে সেই কল্পনার অধিকারী অমানুষ কবি কল্পনীয় পদার্থের সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপের সৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি প্রতিভাবলে কল্পনাধ্যান করিয়া সেই পদার্থের বীজ-শক্তি আয়ত্ত করেন। পরে সেই বীজ তাঁহার চিত্তভূমিতে উপ্ত হইয়া সমগ্র

* ইংরাজীতে এই উপরাগকে Personal element বলে।

পদার্থকে বিকশিত করিয়া তুলে। এইরূপে পদার্থের সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়রের কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল, তাহারই সাহায্যে তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ চরিত্রাবলী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন। বিজ্ঞানবিৎ যেমন বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে কোনও বিলুপ্তজাতীয় পশুর ভূমধ্যপ্রোথিত অস্থির একাংশ দেখিয়া সমগ্র পশুশরীর পুনর্গঠিত করিতে পারেন, সেক্সপীয়রও সেইরূপ অমানুষী কবি-কল্পনার বলে চরিত্রের লেশমাত্র দেখিয়া সমগ্রচরিত্রের পুনর্গঠন করিতে পারিতেন। শুনা যায়, কুভিয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ অতীত কল্পের মাসটাডুন জন্তুর অস্থিপঞ্জরের একখান মাত্র হাড় দেখিয়া মাসটাডুন পশুর কিরূপ আকার গঠন দৈর্ঘ্য উচ্চতা ছিল, তাহা স্থির করিয়া তাহার একটা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রও সেইরূপ ওথেলো, হ্যামলেট, ক্লিওপেটরা, হট্‌স্পার, ব্রুটস, ম্যাকবেথ প্রভৃতির বিবরণ ইতিহাসে উপাখ্যানে বা নাটকান্তরে পাঠ করিয়া ঐ চরিত্রের কোন একটা গুণ বা ক্রিয়ার লেশমাত্র অবলম্বন করিয়া অমানুষী কল্পনাশক্তির সাহায্যে সেই সেই চরিত্র পুনর্গঠিত করিতে পারিতেন। যে সকল চরিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকপোলকল্পিত, তাহাদিগের সম্বন্ধেও ঐ প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিত না। সেই সেই চরিত্রের কোন একটা কল্পিত ঘটনা বা গুণ (যাহা নাটকের আখ্যানবস্তুর উপযোগী বা যাহার অবতারণা উপাখ্যানের পরিণামসাধনের জন্য আবশ্যক) উপলক্ষ করিয়া সেই সেই চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতেন; পরে তাহার উপর ভিত্তিরচনা করিয়া সমগ্র চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। শুনা যায়, ঐন্দ্রজালিক যাদুকর যাদুবিদ্যার প্রয়োগস্থলীভূত ব্যক্তির সম্পর্কিত কোন একটা কিছু পাইলেই তাহার সমগ্র জীবনের উপর প্রভুত্বস্থাপন করিতে পারে। সেইরূপ সেক্সপীয়র কল্পনীয় চরিত্রের লেশমাত্রের সাক্ষাৎকার পাইলেই সমগ্র চরিত্র কল্পনাবলে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিপ্রতিভার এমনই অদ্ভুত সামর্থ্য ছিল যে, তিনি চকিতমাত্রে যে কোন চরিত্রের সমগ্র প্রতিকৃতি চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। সাধারণ মনুষ্য যেমন কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার মানসে একে একে তাহার অবয়বসমূহের সংস্থান করে, ক্রমে ক্রমে তাহার গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির যোজনা করে, সেক্সপীয়র সেরূপ করিতেন না। তিনি অমানুষী কল্পনাবলে পদার্থের বীজ[illegible] আয়ত্ত করিয়া প্রতিভার বিদ্যুৎ আলোকে পদার্থের [illegible] প্রতিরূপ [illegible] দেখিতে পাইতেন। চরিত্রের দেহ মন

আত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ভাবভঙ্গী, প্রকার, পদ্ধতি, সমস্তই দেখিতে পাইতেন। সেই জন্যই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এমন সজীব সত্যনিষ্ঠ সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইত। সেক্ষপীয়রের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক ছিল না। তিনি লাটিন ও গ্রীক অত্যল্পই জানিতেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল। ইংরাজি ভাষায় তখন অনেক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। সেই অনধিকসংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে কখন পদার্পণ করেন নাই। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত পর্য্যাপ্ত জ্ঞান, মানব ইতিহাস বিষয়ে প্রগাঢ় প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? অমানুষী কল্পনাশক্তির নিকট হইতে। এই অমানুষী কল্পনাশক্তিই তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব, ইহার অধিকারী বলিয়াই তিনি মহাকবি সেক্ষপীয়র।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফতেপুর শিকৃরি।

আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর শিকৃরি আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণ অশ্বযানে আগ্রা হইতে যাইতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পথে দেখিবার জিনিসের অভাব নাই। পথের উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল উর্ব্বরক্ষেত্র ও দুই একখানি বৃহৎ পল্লীগ্রামও দৃষ্ট হয়। নানা ক্ষুদ্র বিহঙ্গম নির্ভয়ে পথোপরি বিচরণ করে। শকুনি ও বায়সকুল পথিপার্শ্বে বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া স্তিমিতলোচনে বিশ্রাম করে, লোক জনের গতায়াত গ্রাহ্যও করে না; কেহ নিতান্ত নিকটে আসিলে অলসভাবে এক আশ্রয় হইতে উঠিয়া অন্য আশ্রয়ে গিয়া উপবেশন করে। পথিপার্শ্বে পল্বলে সারসবলাকাদি নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গম ক[illegible] করে। বিহগকূজিত প্রান্তরে সমুজ্জ্বলপক্ষধারী ময়ূরও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন দেখিতে পা[illegible]ীয় ঝাঁক উড়িতেছে, বসিতেছে; আর চিরচঞ্চল কাঠ[illegible] বৃক্ষান্তরে গমনাগমন করিতেছে।

ফারগুসনের মতে আকবরের স্থপতিশিল্পরুচিকৌশলের বিচার করিতে হইলে, ফতেপুর শিক্রি দেখিতে হয়। আকবরই এখানে গৃহাদিনির্ম্মাণের আরম্ভ করেন, তিনিই সে সকল সম্পূর্ণ করিয়া যান। অপর কোনও সম্রাট এখানে কোনও গৃহাদির প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড় শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর শিক্রি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর শিক্রি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানীনির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দরগায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ আকবর সপরিবারে পদব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। বাদশাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাণাৎ (পর্দ্দা) সংস্থাপিত হইয়াছিল। আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে পাছে বাদশাহের, ততোধিক বেগমের কোমলপদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেই জন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, নবাব ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। দরগায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে শিক্রির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী সেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। সেই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, যোধাবাইয়ের গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। যোধাবাই তখন গর্ভবতী; কাজেই [illegible] হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানেই বাস করিতে [illegible] খৃষ্টাব্দে ৩১শে অগষ্ট তারিখে যোধাবাই একটি পুত্র প্রসব [illegible] ধ্বনিত হইল। সেই সাধু-[illegible]রের নামানুসারে, [illegible] সেলিম নামকরণ করিলেন। [illegible] মির্জ্জা সেলিমই [illegible] নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন শিক্রিতে রাজধানীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন শিক্রিতে রীতিমত দুর্গনির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার এক স্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এ স্থান হইতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগ্রা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়া রাজধানী; রাজার বাসস্থানপরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন। সম্রাটের আদেশে আগ্রার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর শিক্রি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর শিক্রিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে পথে আর মানবপদধ্বনি ধ্বনিত হয় না, যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃতনগর; যেন কুশপরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে কুসুমামোদ চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু ঝঙ্কৃত চরণে,
আপনার পথ হেরি মুখের উজ্জ্বায়,
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।"

"খোদিত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হয়ে রয়েছে এখন;
তক্ষ অহিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর-ত্যাগের কারণ।

দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই "বুলন্দ দরওয়াজায়" মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফারগুসনের মতে, ভারতবর্ষে [illegible], আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় [illegible] স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে [illegible] লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর [illegible] সেই সরোবরসলিলে [illegible]ইয়া পড়ে। বুলন্দ দ্বারের উপর [illegible], পরিত্যক্ত নগরী [illegible]

বর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়নসমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গনের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গনের অপর তিন পার্শ্বেই তীর্থযাত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি তিনটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ যাত্রিনিবাসের ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ খিলান করা ও হর্ম্ম্যতল নানাপ্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রে সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান খিলানে লিখিত খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে সেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্ত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমলধবল মর্ম্মরের গঠন। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ধবলপ্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণবস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি সেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধিমন্দিরাভ্যন্তরে শুক্তিখচিত মর্ম্মর আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধিনির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজি লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাট ফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিলে, আবুল ফাজেলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফয়জীর জন্মস্থান নিবাসগৃহে উপনীত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা ; এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে ; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে আজও কিছু নষ্ট হয় নাই। তৎপরে যোধাবাই-এর মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে ও দক্ষিণে প্রস্তরের দ্বারদিয়া অনেকগুলি

প্রকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা-করা। প্রাসাদ রক্ত-প্রস্তরের গঠন; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নাভিরাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে কতকগুলি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহ-নির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল রক্তবর্ণ বালু-প্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতিসুন্দর কারুকার্য্য-খচিত;—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, যেন কোন জাপানী শিল্পী দন্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরি-তল কয়টি গম্বুজে সুশোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গনের অপরাংশে আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত। কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান মহিষীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকা উভয় পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি?—বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তঃপুরচারিণীগণ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ "পঞ্চমহল"। ইহার প্রথম তলে ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ, তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি ও ত্রিতলে পনেরটি, চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলার কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীরসেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিজড়িত; অপরটি, একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফলচয়নে রত। কথিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধমন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়টি ফোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের

শয়নমন্দির। প্রকোষ্ঠভিত্তি পারসীক রচনায় শোভিত। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বাদশাহের প্রশংসাসূচক।

এই খাসমহলের এক কোণে আকবরের তুর্কি পত্নী স্বামুলী বেগমের আবাসগৃহ। সমস্ত ফতেপুর শিক্‌রিতে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ অল্পই আছে। প্রাসাদাঙ্গে পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র ক্ষোদিত। একাংশে একটি অতি সুন্দর আরণ্য বৃক্ষ চিত্রিত। স্তম্ভগাত্রে নানাপ্রকার ক্ষোদিত পত্রপুষ্পে সুশোভিত।

আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গনপ্রান্তে "দেওয়ান-ই-খাস" অবস্থিত। হর্ম্ম্যতল দশ পঁচিশ খেলার ছক। এই অদ্ভুত অট্টালিকানির্ম্মাণের কোনও কারণই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ইহা একটি costly architectural freek মাত্র। বহির্দ্দেশ হইতে অট্টালিকাটি দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম অপনোদিত হইয়া যায়। হর্ম্ম্যতল হইতে ছাদপর্যান্ত কোনও ব্যবধানই নাই। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল স্তম্ভ। স্তম্ভ গাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত। স্তম্ভশির হইতে প্রকোষ্ঠের চারি কোণ পর্য্যন্ত এক একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুবৎ পথ; প্রতি পথের শেষ হইতে হর্ম্ম্যতল পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর স্তম্ভশোভিত প্রাঙ্গনমধ্যে "দেওয়ান-ই-আম"। অনেকে অনু-মান করেন যে, ইহা বন্যপশুর ক্রীড়াদর্শন ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ফতেপুর শিক্‌রিতে আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা, "আঁখমিচৌলি"। প্রদর্শকগণ বলেন, এখানে স্বয়ং আকবরসাহ পারিষদবর্গের সহিত "কাণা-মাছি" খেলা করিতেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, উত্তরকালে সমগ্র ভারতভূমি যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল, সেই জাহাঙ্গীরের বাল্যক্রীড়ার জন্য এ গৃহ নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রাসাদের ধনাগার ছিল। দ্বারের গঠন দেখিলে এই শেষোক্ত মতই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এই অট্টালিকার সম্মুখেই একটি জৈন ধরণে নির্ম্মিত সুন্দর ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য।

এই প্রাসাদসমূহের বহির্দ্দেশে "হাতিপোল।" দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর শুণ্ডদ্বয় জড়িত হইয়া এই দ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম। কিন্তু আওরঙ্গজেব মুসলমানসুলভ প্রতিমাপূজাবিদ্বেষের আতিশয্যে

হস্তিদ্বয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন! যোধাবাইয়ের মহল হইতে হাতিপোলের উপরিস্থিত গৃহে আসিবার একটি আবৃতপথ আছে।

হাতিপোলের নিকটেই "হীরানমিনার"। ইহার নিকট দিয়া মৃগাদি তাড়িত হইলে বাদশাহ তাহাদের শিকার করিতেন। ইহা আদৌ সুরম্য নহে।

ফতেপুর শিক্‌রিতে এই সকল অট্টালিকা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রাণ-তোষিণী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু অট্টালিকা বর্ত্তমান।

আকবর ফতেপুর শিক্‌রিতে দুর্গনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ না হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাতিপোলের নিকটেই সেই অসম্পূর্ণ দুর্গের নমুনা—"সাঙ্গিয়া বুরুজ।" এই বুরুজের নিকটেই রাজ-দরবারে পণ্যবিক্রয়লোলুপ বণিকদিগের জন্য সরাই।

এখন এই সকল প্রাসাদ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন। মোগলগৌরবের এই প্রাণ-হীন অবশেষে আছে কেবল পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি।

এখন এই বিজন প্রাসাদে সেখ সেলিম চিস্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত কতকগুলি প্রদর্শক বাস করে।

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অশোকের গিরিলিপিমালার মুখ্য উদ্দেশ্য,—তাঁহার ধর্ম্মানুশাসনের ঘোষণা। শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই সকল ধর্ম্মলিপি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে কলিঙ্গ বিজয় করিয়া আসিলে অশোকের অনুশোচনা হয়; এবং তজ্জন্য তিনি স্বরাজ্যে ও অপরান্তদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। (১) অভিষেকের দশম বৎসর পরে রাজাজ্ঞা হয় যে, পূর্ব্বে সুখলাভাভিলাষে যে বিহার-যাত্রার অনুষ্ঠান হইত, এখন হইতে তাহা ধর্ম্মযাত্রায় পরিণত হইবে। সে যাত্রায় শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা হইত, এবং তাঁহাদিগকে দান করা হইত; এতদ্ভিন্ন জনপদস্থ জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করা হইত, এবং ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসাও সম্পন্ন হইত। (২) অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর

(১) ত্রয়োদশ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (২) অষ্টম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

পরে অশোক ধর্ম্মপ্রচারের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন, এবং তাঁহার সাধারণ ধর্ম্মানুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেন। রাজাজ্ঞায় চারি দিকে ধর্ম্মভেরী বাজিয়া উঠিল, এবং ধর্ম্মার্থ জনগণের সম্মুখে হস্তী, রথারূঢ় দেবগণ ও অন্যান্য দিব্য রূপ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণের অহিংসা, জীব ও কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতার ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা প্রভৃতি সৎধর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। (৩) রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের প্রতি এই আজ্ঞা প্রদত্ত হয় যে, নানা রাজকার্য্যের জন্য ও নিম্নলিখিত ধর্ম্মঅর্থ প্রচারের জন্য, তাঁহাদিগকে প্রতি পঞ্চম বৎসরে স্ব স্ব ইলাকায় ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে—

পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের শুশ্রূষা সাধু,

জীবে দান সাধু,

অপভণ্ডদিগের প্রতি নিন্দাবিমুখতা সাধু। (৪)

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা আদেশ করেন যে, প্রজাগণের কথা কিম্বা অমাত্য ও পক্ষের বিবাদ বা প্রবঞ্চনার কথা জানাইবার জন্য প্রতিবেদকগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন; তাঁহার ভোজনকালেই হউক, আর তিনি শুদ্ধান্তে, "খাসকামরা"য়, রথে, বা সুখোদ্যানেই থাকুন, প্রতিবেদকগণ যখন ইচ্ছা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন। (৫) সর্ব্বলোকহিতের জন্য কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহার মূলে পরিশ্রম ও (ক্ষিপ্র) কার্য্যকারিতা।

রাজা আজ্ঞা প্রচার করেন যে, আহারার্থ কোন জীব নাশ করা উচিত নহে, যজ্ঞযূপে জীবনাশ করাও অনুচিত। অধিকাংশ সমাজ-(পর্ব্বমেলন)-ও মন্দ, কেবল কতকাংশে ভাল। ভবিষ্যতে রাজরন্ধনশালায় আহারার্থ কোন জীব নাশ হইবে না। (৬) জীবের জীবনরক্ষার জন্য নিজ রাজ্যে ও অপররাজ্য রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়;—এক প্রকার মানবের জন্য, অপর প্রকার পশুর জন্য। যেখানে ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেখানে রাজাজ্ঞায় নূতন বীজ রোপিত হইল। সাধারণের হিতার্থ স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইল। (৭) ঐই সকল ধর্ম্মানুশাসনের প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য হইতেছে।

(৩) চতুর্থ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৪) তৃতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(৫) ষষ্ঠ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৬) প্রথম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(৭) দ্বিতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

না, তাহা দেখিবার জন্ত, অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ চতুর্দশতম বৎসরে) অশোক ধর্ম্মমহামাত্য নামক এক অমাত্যশ্রেণী নিযুক্ত করেন। (৮)

অশোকের গিরিলিপিসমূহের প্রধান অনুশাসনগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

১। প্রাণীর অহিংসা,

২। পিতামাতার শুশ্রূষা,

৩। বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার,

৪। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান ও তাঁহাদিগের শুশ্রূষা,

৫। দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার,

৬। বিধর্ম্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখতা,

৭। শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ় ভক্তি। (৯)

এই সকল ধর্ম্মনীতি নীতিবিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় ;—উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রশংসনীয়। দ্বিসহস্রার্দ্ধ বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, এই মহান্ উপদেশের প্রচার করা যে অসাধারণ ধর্ম্মোন্নতির পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য এই সকল ধর্ম্মানুশাসন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের নিকট হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল ; সুতরাং ইহাতে অশোকের কোনও মানসিক বিশেষত্ব নাও থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল উন্নত মত জন কতক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের উপদেশে বা রচনাতেই বদ্ধ ছিল, সাধারণ জনগণের নিকট আদৃত হয় নাই। অশোকের গৌরব এই যে, তিনি প্রবল ধর্ম্মেচ্ছাপ্রণোদিতচিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাভাবিক কার্য্যকুশলতাসহকারে শীঘ্রই এই সকল উন্নত মত স্বীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যে ও অপরাস্ত প্রদেশসমূহে বহুলভাবে প্রচারিত করেন, এবং আংশিকরূপে কার্য্যে পরিণত না করাইয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে কয়জন নৃপতি মানবজীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে যুগাবতার বলিয়া ভ্রম হয়, সেই কয় জনমাত্র নরপতির মধ্যে অশোকের স্থান যে অতি উচ্চ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অনেকে মনে করেন যে, প্রথম হইতেই অশোক বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এই গিরিলিপিমালা হইতে দেখাইতেছি যে, সে ধারণা ভ্রমমূলক। রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অশোকের সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বনের যথোপযুক্ত প্রমাণাভাব সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। উপরি-উক্ত অনুশাসনসমূহ, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধারণ

(৮) পঞ্চম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৯) সপ্তম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

সম্পত্তি। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র, উপনিষদ, স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবম্বিধ অনুশাসনের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। কাজেই, আমেরিকার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের আমেরিকায় গমনের পূর্ব্বে রচিত ইংরাজী সাহিত্য যেমন ইংরাজের ও আমেরিকানের সাধারণ সম্পত্তি, সেইরূপ এই সকল অনুশাসন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত অশোক পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে মান্য করিবে। সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ হইলে তিনি কখনই প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাদিগকে দান করিতে বলিতেন না।

প্রথমাবস্থায় অশোক নির্দ্দয় ও অধর্ম্মী ছিলেন; দ্বিতীয়াবস্থায় তাঁহার এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, ইহার কোনও সন্তোষজনক কারণ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ একাধিক কারণসমন্বয়ে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ, অবশ্য উদ্দামযৌবনান্তে প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণতি ও তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির পরিপাক। দ্বিতীয় কারণ, পঞ্চনদ প্রদেশত্যাগ ও মৃদুস্বভাব মাগধগণের উপর রাজত্ব। তৃতীয় কারণ, অশোক স্বয়ং ত্রয়োদশ লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—কলিঙ্গবিজয়কালে এত মানবজীবন বিনষ্ট হয়, এত লোক বন্দী হয় ও যুদ্ধের নিত্যসহচর নানা উপদ্রবে এত লোক কষ্ট পায় যে, তদ্দর্শনে অশোকের চিত্তে প্রবল অনুশোচনা জন্মে। চতুর্থ কারণ, বৌদ্ধজনশ্রুতি মতে, আচার্য্য উপগুপ্তের উপদেশ। (১০)

আচার্য্য উপগুপ্তের কোন ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক বৃত্তান্ত এখনও পাওয়া যায় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি মথুরাবাসী ও বৈশ্যবংশীয় ছিলেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে ভিক্ষু ও বিংশতি বৎসরে অর্হৎ হয়েন। হিওনথসাঙ্গ মথুরার নিকটে কতকগুলি গহ্বর দেখেন ও শুনেন যে, সেগুলি উপগুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১১) তাঁহার প্রিয়শিষ্য অশোক পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার জন্য কয়েকটি প্রস্তরগৃহ (গুহা) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (১২) হাওনথসাঙ্গ সিন্ধুদেশেও তাঁহার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। (১৩) আমাদিগের অনুমান হয়, তিনি একজন জিতেন্দ্রিয়,

(১০) Beal's Si-Ya-Ki vol II. pp. 88-90. (১১) Beal's Si-Ya-Ki vol I. pp. 181-2.
(১২) Si-Ya-Ki vol II. p. 93. (১৩) Si-Ya-Ki vol II. p. 273.

পর হুওয়েও, সাধুপুরুষ ছিলেন। বৌদ্ধ পুস্তক হইতে তাঁহার যৌবনকালীন একটি গল্প উদ্ধৃত করিলাম,—

মথুরা নগরে বাসবদত্তা নাম্নী এক বিখ্যাত বারস্ত্রী বাস করিত। এক দিন তাহার দাসী মথুরাবাসী বণিক যুবা উপগুপ্তের নিকট সৌগন্ধ ক্রয় করিতে যায়। দাসী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাসবদত্তা পরিহাসচ্ছলে তাহাকে কহিল, "সখি, দেখিতেছি, এই যুবা তোমার প্রিয়; কারণ তুমি সর্ব্বদাই তাহার নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাক।" দাসী উত্তর করিল, "স্বামিকন্যে, বণিকপুত্র উপগুপ্ত সুন্দরদর্শন, গুণবান ও মৃদুস্বভাব, তিনি কেবল ধর্ম্মচর্য্যায় সময় অতিবাহিত করেন।" ইহা শুনিয়া উপগুপ্তকে দেখিবার জন্য বাসবত্তার মনে প্রবল বাসনা জন্মে; সেই বাসনা হইতে ক্রমে উপগুপ্তের প্রতি তাহার প্রেমসঞ্চার হয়।

কিছু দিন পরে বাসবদত্তা সেই দাসীকে দিয়া উপগুপ্তের নিকট সংবাদ পাঠাইল, "আমার ইচ্ছা যে, আমি তোমার নিকট যাই, তোমায় দর্শন করি, তোমার নিকট থাকিয়া সুখভোগ করি।" এই সংবাদ পাইয়া বণিক যুবা সেই দাসীকে দিয়া এই উত্তর প্রেরণ করিলেন, "ভগিনী, তোমার এখনও আমাকে দেখিবার সময় হয় নাই।" বাসবদত্তার নিয়ম ছিল যে, তাহার সঙ্গসুখাভিলাষীকে প্রতিরাত্রে পাঁচ শত পুরাণ (ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা) দিতে হইত; হয় ত অর্থাভাবেই উপগুপ্ত তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই আশঙ্কা করিয়া বাসবদত্তা পুনরায় দাসীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল, "স্বামিপুত্রের নিকট আমি এক কার্ষাপণও চাহি না, আমি কেবল তাঁহার প্রীতিসুখের প্রার্থিনী।" এই সংবাদ পাইয়া উপগুপ্ত পুনরায় পূর্ব্বের মত বলিয়া পাঠাইলেন, "ভগিনী, তোমার এখনও আমাকে দেখিবার সময় হয় নাই।"

সেই নগরের শিল্পিক চৌধুরীর সহিত বাসবদত্তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। একবার এক ধনী সাধুপুত্র তথায় আইসে ও বাসবদত্তার যৌবনপুষ্পিতা রূপলাবণ্যসম্পন্না দেহলতা দেখিয়া তাহার জন্য পাগল হয়। তাহার প্রচুর ধন দেখিয়া সেই রূপাজীবার লোভ হয়; কিন্তু পাছে শিল্পিকের প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে আপনার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হয়। শেষে একদিন নির্জ্জনে পাইয়া সে চৌধুরীকে হত্যা করে ও তাহার শব গোময়স্তূপমধ্যে লুকাইয়া রাখে। চৌধুরীর বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার সন্ধান করে ও পরে রাজদ্বারে বার্ত্তা-

দত্তার নামে অভিযোগ করে। মথুরারাজ বিচারে তাহাকে দোষী স্থির করিয়া আজ্ঞা করেন যে, তাহার হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসিতে হইবে। রাজাজ্ঞা পালিত হয়; রক্ষিগণ তাহার শোণিতাক্ত দেহ শ্মশানে ফেলিয়া আইসে। পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাহার দাসী কেবল বাসবদত্তাকে ত্যাগ করিল না। সে অতিযত্নে তাহার শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল।

বাসবদত্তার এইরূপ দুর্দ্দশার কথা উপগুপ্তের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক জন ছত্রধারী ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া দাসী বাসবদত্তাকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইল। লজ্জা-বশতঃ বাসবদত্তা দাসীকে দিয়া আপনার ছিন্ন ভিন্ন দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করাইয়া রাখিল। উপগুপ্ত সম্মুখে আসিলে সে বলিল, "স্বামিপুত্র, এই দেহ যখন বিকশিত বিসপ্রসূনবৎ রমণীয় ছিল, যখন ইহা বহুমূল্য বসনে ও ভূষণে সুশোভিত থাকিত, যখন ইহা নিজগুণে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত, তখন আমি এমনই দুর্ভাগ্য ছিলাম যে, আপনার দর্শন পাই নাই। এখন এ দেহে আর কি আছে? এখন ইহার দুর্দ্দশা দেখিলে নয়ন ক্লিষ্ট হয়। এখন এ দেহ হইতে আনন্দ, ভোগ, সুখ, সৌন্দর্য্য, সকলই অপসৃত হইয়াছে। এখন এ কর্দ্দমাক্ত, রক্তাপ্লুত, ঘৃণার উদ্দীপক দেহ দেখিতে আসিলেন কেন?" শুনিয়া উপগুপ্ত কহিলেন, "ভগিনী, আমি ভোগাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসি নাই। আমি এখন দেখিতে আসিয়াছি, মানবের ভোগতৃপ্তিকারী বস্তু কতই না দুর্দ্দশাকর।"

ইহার পর তিনি সেই মরণাহতা পণ্যস্ত্রীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। (১৪) তাঁহার উপদেশে বাসবদত্তার হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, এই তিনে আশ্রয় লইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

---

(১৪) সেই ধর্ম্মোপদেশের ভাবার্থ Paul Carus কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছে—"I have seen with mine eyes the Tathagata walking upon earth and teaching men his wonderful doctrine. But you would not have listened to the words of righteousness while surrounded with temptations while under the spell of passion and yearning for worldly pleasures. You would not have listened to the words of the Tathagata, for your heart was wayward and you set your trust on the charm of transient charms.

সতী।

গাথা।

১

"তুমি নাথ, তুমি নাথ!" হয় না প্রত্যয়!
ধরিতে ধরিল বুকে যদি স্বপ্ন হয়।
স্বপ্ন নয়, সত্য সেই আপনি দেবতা
বহিয়া এনেছে মৃত্যু-মঙ্গল-বারতা!
নয়নে সে চিরস্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ-ফল,
সেই সিন্ধু-বিধূনিত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থল।

"হে দেবতা!" রুদ্ধ কণ্ঠ স্ফুরে না বচন,
বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে প্রাণে মহারণ।
অবিরল অশ্রুজল—ধরা বাষ্পময়,
সবলে ধরিছে বুকে—অকূলে আশ্রয়!
সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপি সমুদ্র-উপরি,
দুলে যথা জলত্রস্ত কূলে অবতরি।

"কি দুর্দ্দিন সেই দিন—কেন নদীকূলে
গেছিনু আনিতে জল তব কথা ভুলে।
মনে করিনি পাপ—এক ভ্রম-পাপ
মর্ম্মে বজ্রাঘাত—নরক-সন্তাপ।
ক্ষম মোর দাসী আমি।" রক্তাক্ত কপাল।
"ইহকাল গেল, নাথ, রাখ পরকাল।"

হায় রূপ—ছার রূপ—পাপরূপে ধিক্,
নারকী নরক দেখি পাগল-অধিক।
তরীতে তুলিল বলে চকিতে আমায়—
অনুনয় অভিশাপ ক্রন্দন বৃথায়।
ডুবিতে দিল না জলে, করিল বন্ধন—
আকাশে অশনি নাই, জগতে মরণ।

দিন নাই রাত নাই, নিত্য এ কাননে
প্রবোধিতে আসে চেড়ী নানা আভরণে,
কহে কত পাপ কথা। ও পদ স্মরিয়া
এখনো এ দেহে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া।
এত দিনে, হে দেবতা, হলে কি সদয়!
মিলিল মরণমুখে হৃদয়ে হৃদয়!

পবিত্র কৃতার্থ দাসী, গৃহে যাও, স্বামী,
আশার অধিক ফল লভিয়াছি আমি।
আজি সে নির্দ্দিষ্ট দিন, পাপিষ্ঠ দানবে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আলিঙ্গিতে হবে।
যাও প্রভু হাসিমুখে, বল দাও মনে,
লুটে না পূজার ফুল দানব-চরণে।

সহসা খুলিল দ্বার, আলোক ঝলিল,
ভয়াল বালার মুখ, নবাব দেখিল।
যুবক দাঁড়াল ফিরে স্থির নির্ব্বিকার,
বাম করে প্রিয়া-কটি, অঙ্গে তরবার।
নবাব হটিল পিছে, রোষে চক্ষু জ্বলে—
"লয় করি দগ্ধ কর দোঁহে চিতানলে।"

২

রাজপথে জনতায় পথ চলা দায়,
জ্বলিছে জ্বলন্ত রবি মধ্যাহ্ন-রেখায়।
আকাশ নিষ্কম্প স্থির, জগত নীরব,
নীরব বিহঙ্গ সব, নড়ে না পল্লব,
ঘোষিত হইল দণ্ড, জনতা উদগ্রীব,
বাজে ঘন জয়ঢাক, ফুকারে নকীব।

The charms of a lovely form are treacherous and quickly lead into temptations, which have proved too strong for you. But there is a beauty which will not fade, and if you but listen to the doctrine of our Lord, Buddha, you will find that peace which you never would have found in the restless world of siuful pleasures"

বদ্ধ করি দু'নয়ন, করজোড়হাতে
ভিন্ন মুখে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধিল শৃঙ্খলে।
কি সুন্দর!—শালতরু-বিশাল শরীর,
প্রতি স্ফীত ধমনীতে শোণিত অধীর।
নয়ন নাসিকা-লগ্ন, প্রসন্ন বদন,
"ভগবন্, তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"

কি সুন্দরী!—রোমে রোমে রবিরশ্মি পড়ি—
আলোকে আলোকময়ী ধবলা-শিখরী!
কি সৌন্দর্য্য অচঞ্চল! যৌবন-মত্ততা
কূলে কূলে গেছে ঢেলে নিজ অকুলতা!
নাহি পাপ-অন্ধকার, প্রত্যেক শোণিমা
বিকাশিছে আপনার পবিত্র মহিমা।

সজ্জিত হইল চিতা, উদ্ভ্রান্ত জনতা
সভয়ে হটিল পিছে, এলো দুষ্ট তথা।
"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" সহচরগণ
হাসিল, ভাষিল কত বিরূপ বচন।
নতমুখী স্বর্ণলতা, রুদ্ধ আঁখিতারা,
কপোলে অবাধে ছুটে স্থূল মুক্তাধারা।

"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" "তোমার নিকটে
এই এক ভিক্ষা মম—মরণের তটে,
আমায় মরিতে দাও পতিপদ চাহি।"
"আর কিছু?" ব্যঙ্গ হাসি। "কিছুমাত্র নাহি।"
"তাই হোক।" দিল বহ্নি করি মুখে মুখ।
জ্বলিয়া উঠিল চিতা—হোতা সর্ব্বভুক্।

কি সুখ—পতির অঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গন!
জীবনের চিরসাধ প্রেম-উদ্‌যাপন।
সজল করুণ দৃষ্টি, সহাস অধর,
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাষা অব্যক্ত সুন্দর!
কি চেতনা—কি সান্ত্বনা—যন্ত্রণা-মোহিত—
অস্থিতে পড়িছে অস্থি, শোণিতে শোণিত।

ধূধূ জ্বলিছে চিতা, স্তম্ভিত জনতা,
অনলে দুলিছে কিবা কনকের লতা!
অন্ধ দৃষ্টি—তবু সেই কাতর নয়ন
অনলে খুঁজিছে যেন পতির চরণ!
দগ্ধ দেহ—তবু সেই স্থির ওষ্ঠাধর
প্রকাশিছে কত সুখ, কি প্রেম নির্ভর!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

সাধনাবস্থা।

মহারাষ্ট্রদেশে, গোদাবরী নদীর উত্তর তীরে, বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত "বীড়" পরগণার সন্নিকটে, জম্বুগ্রাম বা জাম্বগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যাজী পন্ত নামক এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সেই গ্রামের কুলকরণী বা গ্রামলেখক ছিলেন। গ্রামাধ্যক্ষের নীচেই গ্রামলেখকের পদ। এই কারণে গ্রামে সূর্য্যাজী পন্তের প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। তাঁহাকে গ্রামের যাবতীয় পতিত ভূমি, কৃষিক্ষেত্র ও পথ ঘাট প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইত। করসংগ্রহ-কার্য্যে গ্রামাধিকারীকে সাহায্য করা ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাও তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসলেখকগণ

তাঁকে "পরম তপস্বী, ভাগবতধর্ম্মপরায়ণ ও ষট্‌কর্ম্মনিরত" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কৌলিক রীতির অনুসারে রামোপাসনায় তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রগাঢ় নিষ্ঠাসহকারে কুলদেবতা রামচন্দ্র ও মারুতির "শত্রুভিরাম তাম্রময়ী মূর্ত্তির" অর্চ্চনা করিতেন। তিনি সমস্ত দিন জপ ধ্যান ও পূজার্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে স্বীয় বৃত্তিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

সূর্য্যাজী পন্তের সহধর্ম্মিণীও অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পতী প্রত্যহ হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণশ্রবণ ও অতিথিসৎকার করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকায় সূর্য্যাজী পন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সৌরব্রতের আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই ব্রতাচরণের অল্পকাল পরেই (১৬০৬ খৃঃ) তিনি গঙ্গাধর নামক একটি পুত্র লাভ করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে রামনবমীদিবসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ গঙ্গাধর বাল্যাবধি অতিশয় শান্তচরিত, ভক্তিপরায়ণ ও জনকজননীর আজ্ঞাবহ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আজীবন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকপট স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বাভাবিক বৈরাগ্য অনেক সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস অপেক্ষাও মহনীয় ছিল। গঙ্গাধর উত্তরকালে মাতৃভাষায় "ভক্তিরহস্য"-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বদেশীয় বিবুধসমাজে ভগবদ্ভক্ত সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (১)

কনিষ্ঠ নারায়ণ বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। শৈশবেও তাঁহার হৃদয়ে ভীতির লেশমাত্র ছিল না। কেহ "জুজুর ভয়" দেখাইলে আধ আধ কথায় তিনি বলিতেন, "জুজু কোথায় আমায় দেখাও, আমি জুজুকে মারিয়া ফেলিব।" অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি পিতা মাতার নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত দিন গ্রামের বালকদিগের সহিত দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন। বৃক্ষারোহণ ও ধাবন উল্লম্ফনাদি তাঁহার নিত্যক্রীড়া ছিল। (২) কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইলে, তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিদিগকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে বিব্রত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কখনও বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগকে উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং বৃক্ষতল হইতে

---

(১) রামদাস স্বামীর বখর।

(২) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ৭২ হইতে ৭৭ এবং ১২৩ হইতে ১২৭ শ্লোক। বখরকার এ বিষয়ে নীরব।

তাহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেন। (৩) এক দিন তাঁহার [illegible] ও উপদ্রবাদির জন্ম তিরস্কার করিয়া তাঁহার জননী রাণু বাঈ তাঁহাকে বলেন, "চিত্ত স্থিরপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও ধনধান্য উপার্জ্জন করিতে না পারিলে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না। বাছা! তোমার চিত্ত যেরূপ অব্যবস্থিত দেখিতেছি, তাহাতে তোমার গতি কি হইবে ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি।" এই কথা শুনিয়া নারায়ণ ধনধান্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি পরদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, তথায় ধান্যপূর্ণ গোণীর অভাব নাই। অমিত-বলশালী নারায়ণ প্রতিষ্ঠালাভের উপায় সম্মুখে দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে একটি গোণী তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শস্যস্বামী পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। নিরুপায় বণিক পরিশেষে তাঁহার মাতার শরণাপন্ন হইল। বণিকের অভিযোগে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, নারায়ণ সত্বর তাহার শস্যগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আঃ! অকারণ গোলমাল করিতেছ কেন? শস্য লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, নতুবা বাবা আসিয়া জানিতে পারিলে তোমায় তাড়না করিবেন!" (৪) নারায়ণ

---

(৩) রামদাস স্বামীর বখর (৺মহাদেব বিনায়ক চৌধল কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত) দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২। এবং গোবর্দ্ধন দাস লক্ষ্মীদাস ঠাকুরের প্রকাশিত বখরের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১২৯ হইতে ১৫২ শ্লোক। রামদাস স্বামীর বখর নামক গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভক্তচরিতাধ্যায়ক মহীপতি বখরকার অপেক্ষা ৫০।৬০ বৎসরের প্রাচীনতর লেখক, সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ তথ্যমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী নারায়ণের বাল্যাবস্থার দুরন্তপনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবকাশ পাইলেই কোমলমতি নারায়ণ কলনাদিনী গোদাবরীতটে বা ঘনচ্ছায় ন্যগ্রোধমূলে বসিয়া পরিণতবয়স্ক দার্শনিকগণ যে সকল চিন্তায় "ব্যামোহিত" হন, সেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তনির্ণয়ের জন্য গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতেন। তিনি ব্রাহ্মণধর্ম্মের অবনতিদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া উহার অবনতির কারণনির্ণয়ে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়সের সময় ইন্দ্রিয় [illegible] অন্তর্বিষয়ে লীন করিয়া নারায়ণ এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক "ভারতচিন্তায় চিন্তিত" থাকিতেন। নারায়ণকে ইহার জন্য অসীম ভর্ৎসনা ও সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইত, ইত্যাদি। (শিবাজীর জীবনচরিত ১০২।৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কোনও মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে আমরা এ সকল কথার নামগন্ধও পাই নাই। কোনও দেশের অষ্টমবর্ষীয় [illegible] চিত্তে এরূপ জটিল বিষয়ের গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে আমাদিগের গভীর সন্দেহ আছে।

[illegible] রূপ দুর্দ্দান্ত ও সপ্রতিভ ছিলেন, এই ঘটনায় তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েও তাঁহার বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। তিনি এমন মেধাবী ছিলেন যে, পঞ্চমবর্ষ বয়সে শিক্ষারম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই তিনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে মৌঞ্জীবন্ধনের পর তিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বেদাভ্যাসে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তদীয় অধ্যাপক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। (৫)

নারায়ণ বাল্যকালে যেমন দৌরাত্ম্যে অকুতোভয় ও দুর্নিবার ছিলেন, "কুলদেবতার" প্রতি ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগও তাঁহার তেমনই প্রগাঢ় ও প্রবল ছিল। ধর্ম্মশীলতায় তিনি যে কেবল পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার জনকজননী অপেক্ষাও তদীয় চরিত্রে অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছিল। একদা সূর্য্যাজী পন্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রদিগকে লইয়া মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন মহাপুরুষ একনাথ স্বামীকে দেখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান নগরে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, "শ্রীনাথজী" (একনাথ) মাসকতিপয়মাত্রবয়স্ক নারায়ণের লক্ষণাদি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সৌভাগ্যশালী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক জগতের (দেশের) উদ্ধারসাধন ও কোনও শকপ্রবর্ত্তক নরপতির দ্বারা ভূভারহরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবে।" মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী বিফল হয় নাই। উত্তরকালে এই নারায়ণই "সমর্থ রামদাস স্বামী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে আসীন হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করিয়া "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

গৃহে নিত্য হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণ পাঠ, দেবার্চ্চনা এবং সদাচারপরায়ণ পিতামাতার ধর্ম্মশ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সুদৃষ্টান্তে অতি অল্প বয়সেই নারায়ণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল ভানুজী গোঁসাই একনাথ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তিনি পর্ব্বকালে ও

---

(৫) [illegible] বিজয় ১ম অঃ ৭৮।৭৯ এবং ৯৮ শ্লোক। সত্য বাবু বখরকারের মতানুসরণ করিয়া ৫ম বর্ষে নারায়ণকে উপনীত করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাচীন লেখক মহীপতির মতানুসরণ করা সঙ্গত বোধ করিলাম।

হরিসংকীর্ত্তনাদি উৎসবের সময় সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে উপস্থিত [illegible] দ্বারা "অদ্বৈতনিরূপণ" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। রামনবমী প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে বহু সাধুর সমাগম হইত। গৃহস্বামী অবসর পাইলেই স্ত্রী পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশের প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষদিগের সন্দর্শনের জন্য তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিতেন। এই সাধুসহবাসের ফলে ও গার্হস্থ্য শিক্ষার গুণে নারায়ণের ভগবন্নিষ্ঠা ও কুলদেবতার প্রতি ভক্তি অল্প দিনের মধ্যে ঐকান্তিক ভাবে পরিণত হইয়াছিল। পৌরাণিক ভক্তকথা শুনিয়া তাঁহার শৈশবসুলভ সরলচিত্তে ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের দর্শনলাভবাসনা সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপুরশ্চরণ না করিলে ভগবদ্দর্শন ঘটে না। এই কারণে, কৈশোরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য নারায়ণের অতীব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর তদীয় সংকল্পে বাধা প্রদান করিলে অভিমানক্ষুব্ধ নারায়ণ মারুতির মন্দিরে গিয়া সরল শিশু-হৃদয়ের স্বত-উচ্ছ্বসিত ভাষায় "অভঙ্গ" (কবিতা) রচনা করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। স্তবপাঠ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ভক্ত বালক এক দিন দেবমন্দিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (৬) অদ্যাপি মহারাষ্ট্রবাসীর বিশ্বাস, ভগবান্ রামচন্দ্রের "একনিষ্ঠ সেবক ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ" মারুতির অনুগ্রহ ভিন্ন রামচন্দ্রের দর্শনলাভ অসম্ভব। এই কারণে বালক নারায়ণ মারুতির প্রসাদ-

---

(৬) বখরকার বলেন, সেই দিন মারুতি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া নারায়ণকে ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া "রামদাস" আখ্যা প্রদান করেন। পরন্তু নারায়ণের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনও ঘটে। কিন্তু মহীপতির সন্তবিজয় ও ভক্তবিজয়ের বর্ণনামতে ইহার বহু বর্ষ পরে নাশিকের নিকটস্থিত পঞ্চবটীতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর প্রামাণিক জীবনীলেখক মল্লার রামরাও চিটনীসের লিখিত বিবরণও মহীপতির উক্তির পরিপোষক। বলা বাহুল্য, মল্লার রাওয়ের গ্রন্থ সমালোচ্য বখর অপেক্ষা প্রাচীন। স্বয়ং রামদাস স্বামী আপনার দীক্ষাবিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও মহীপতির উক্তিই সমর্থিত হয়। সত্যচরণ বাবু এখানেও অন্ধভাবে বখরকারের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অষ্টম বর্ষীয় নারায়ণকে দীক্ষালাভের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ভারত-উদ্ধারের [illegible] সাজিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত বক্তৃতা করিতে দেখিতে পাই। দুঃখের [illegible] মহারাষ্ট্রীয় বখরে এ প্রসঙ্গে রামদাস স্বামীর মুখে স্বদেশের হিতসাধন বা [illegible] সন্ন্যাস গ্রহণের কোনও প্রস্তাবই আমরা দেখিতে পাইলাম না।

তাঁহার [illegible] ন্যায় রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্বভাবের যে দুর্দ্দমনীয়তায় তিনি পিতামাতার শাসন অতিক্রম করিয়া গ্রামের সকল বালককে "দুরন্তপনা"য় পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবের সহিত ক্রমে তাহা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মসাধন-বিষয়ে একাগ্র ও অবিচল করিয়াছিল।

উপনয়নের অল্পকাল পরেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় নারায়ণের স্বচ্ছন্দাচার অব্যাহত হইয়াছিল। (৭) ক্রমে নারায়ণ দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তথাপি তাঁহার দৌরাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলে তাঁহার দুরন্তপনার কিছু লাঘব হইতে পারে বিবেচনা করিয়া রাণুবাঈ তাঁহাকে পরিণীত করিবার সংকল্প করিলেন। (৮) ইষ্টদেবতার উপাসনায় পুত্রের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ও মারুতির আরাধনায় তাঁহার বৈরাগ্যশীলতার আভাস পাইয়াও হয় ত তিনি পুত্রকে সংসারপাশে বদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাধরের বিবাহ সূর্য্যাজী পন্তের জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তিনি গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণের ইষ্টদেবতার দর্শনলাভবাসনা এরূপ দুর্দ্দম্য ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি অভীষ্টদেবের সান্নিধ্যলাভ আশায় ভগবান্ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত মারুতির ন্যায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতের পালনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং মাতার মনোভাব অবগত হইবামাত্র তিনি গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক কাননাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার পর তিনি পুনরায় গৃহে আনীত হইলেন বটে, কিন্তু কেহই সেই তেজস্বী বালককে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারিলেন না! বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেই তিনি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন। বিবাহের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একবার এক ঘনপল্লব বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুকাইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ দেখিতে পাইয়া অবতীর্ণ হইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে তিনি নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে ঝম্পপ্রদান করিয়া সকলকে ভীত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পতনে তাঁহার যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় তাঁহাকে

(৭) [illegible]তু ইহার পরও প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের অধিক কাল সূর্য্যাজী পন্তকে জীবিত রাখিয়া [illegible] পতিত হইয়াছেন, বোধ হয়।

(৮) দ্বীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১৫৫ শ্লোক।

কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ললাটে ঐ আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

ফলতঃ নারায়ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তদীয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর তাহা জননীকে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু "মাতার অবোধ প্রাণ" সে কথা বুঝিয়াও বুঝিল না। (৯) তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় সহোদর ভানুজী গোঁসাইর কন্যার সহিত নারায়ণের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। (১০) যথাকালে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। নারায়ণ বররূপে বিবাহমণ্ডপে উপনীত হইলেন। কন্যাদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে পুরোহিতগণ বরকন্যাকে "শুভকার্য্যে সাবধান" হইতে বলিলেন। নারায়ণ পূর্ব্বাবধি সতর্ক ছিলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে সংসারবন্ধনে জড়ীভূত হইবার পূর্ব্বে সাবধান হইতে বলিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া তিনি সহসা বিবাহ-মণ্ডপ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিলেন। (১১) তৎক্ষণাৎ কয়েক জন লোক তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইল। কিন্তু

---

(৯) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী বলেন, বালক নারায়ণ একবার মাতাকে জন্মভূমির সেবার নিমিত্ত আত্মোৎসর্গের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, জননী পুত্রকে "মাতৃদেবো ভব" এই বেদোক্তির অর্থ জিজ্ঞাসিলে নারায়ণ বলেন, "পণ্ডিতগণ জন্মভূমিকেও জননী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এ কারণে জননীর ন্যায় জন্মভূমির সেবার জন্য আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত, ইহাই বেদের আজ্ঞা।" শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল মহনীয় কথা কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন, জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই সকল কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

(১০) মহারাষ্ট্র দেশে ক্ষত্রিয়গণের প্রভুত্বকালে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা মারাঠা-ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে "মাতুলীকন্যার" পাণিগ্রহণের রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মারাঠাগণ আপনাদিগকে যাদববংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। যাদবগণের মধ্যে প্রাচীনকালে মাতুলকন্যার পাণিগ্রহণের প্রথা ছিল। প্রদ্যুম্ন স্বীয় মাতুলকন্যা শুভাঙ্গীকে এবং তৎপুত্র অনিরুদ্ধ রুক্মবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৬১ অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে। ইদানীং মরাঠাগণের প্রভাব হ্রাস হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

(১১) শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "সকলে সাবধান হও। বলিয়া নারায়ণ পলায়ন করেন।" এখানে বখরে বর্ণিত উক্তির ভাবগ্রহণে তাঁহার ভ্রম ঘটিয়াছে।

তরুণী নারায়ণ সকলকে অতিক্রম করিয়া জম্বুগ্রামের সন্নিহিত কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জননীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ও অভ্যাগত জনসমাজের বিস্ময়-বিষাদে বিবাহ-মণ্ডপ ম্লানভাব ধারণ করিল। গঙ্গাধর শোকপরীতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। (১২)

জম্বুগ্রামের সন্নিহিত কাননে তিন দিন লুকাইয়া থাকিয়া নারায়ণ নাশিক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি তত্রত্য পঞ্চবটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, রামদাস নাম ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্র ও মারুতির আরাধনা ও তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গুহানিবাস, মন্ত্র-পুরশ্চরণ, রামায়ণ-শ্রবণ, ভজন-সংকীর্ত্তন, সাধুসহবাস, শাস্ত্রচর্চ্চা, লোকোপকারসাধন, শীতোষ্ণপর্জ্জন্য-সহন, অষ্টাঙ্গযোগসাধন এবং কখনও ভিক্ষাটন, কখনও বা ফলপর্ণাহার করিয়া দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। (১৩) কথিত আছে, রামদাসের কঠোর সাধনায় মারুতি প্রসন্ন হইলেন। মারুতির প্রসাদে রামদাসের চির-বঞ্ছিত রামচন্দ্র ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত ও প্রত্যক্ষগোচর হইয়া, তাঁহাকে "স্বকীয়দিব্যগুহ্যজ্ঞান" প্রদান করিলেন। (১৪) বাল্যকালে তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও অটল সাধনার বলে, তাহা সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে চরম পরিণতি লাভ করিল।

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সাধক ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরম মোক্ষপদবী লাভ করেন, যে পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটিলে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত ও সর্ব্বপ্রকার কামনার চরম পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, রামদাস সাধ-

---

(১২) ১৬২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (মাঘ মাসে) এই ঘটনা ঘটে। এই অব্দ মহারাষ্ট্র ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরেই মালিক আম্বেরের মারাঠা সেনানী শাহজী ভোসলে (শিবাজীর পিতা) ও লুখজী যাদবরাও (শিবাজীর মাতামহ) মহারাষ্ট্র-বীর্য্যপ্রভাবে মোগলদিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। যে বীর্য্যপ্রভাবে মোগলরাজ্যের ধ্বংস হয়, তাহার প্রথম পরিচয় মোগলগণ এই অব্দে প্রাপ্ত হন। রামদাস স্বামীর সংসারত্যাগও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় ও মোগলদিগের অধঃপতনের পূর্ব্বচিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। মোগলরাজ্যের ধূমকেতু অওরঙ্গজেব ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৩) মল্লার রাও চিটনীস প্রণীত শিবাজীর বখর ১ম সংস্করণ, রামদাস স্বামীর বখর, এবং সন্তবিজয় ২য় অধ্যায়।

(১৪) সন্তবিজয় তৃতীয় অধ্যায় ১০৭ শ্লোক।

নায় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যোগিগণ সাধারণতঃ নির্জ্জন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পার্থিব জগতের ভালমন্দ হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া ধ্যানমগ্নচিত্তে অক্ষয় ব্রহ্মানন্দভোগে নিরত হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবদ্দর্শনজনিত সাত্ত্বিক আনন্দলাভের আশায় অকিঞ্চিৎকর সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিশোরবয়সে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কেবল আত্মসুখানুসন্ধায়ী হইয়া জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্যপালনে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন না। তিনি মোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ও ভূমানন্দের আস্বাদন করিয়াও দুঃখযাতনাসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাপত্রয়ক্লিষ্ট, দীনভাবাপন্ন ও পরস্পর-বিবদমান স্বদেশীয়গণের ক্লেশবিমোচন ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মোন্নতিবিধানে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দেশময় পর্য্যটন পূর্ব্বক, তাঁহার বহু দিনের সাধনালব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া মহারাষ্ট্র জাতিকে সঞ্জীবিত, সম্মিলিত ও স্বধর্ম্মানুরক্ত করিবার বাসনা, তাঁহার প্রবলধর্ম্মানুরাগপরায়ণ উন্নত হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসরের তপস্যায় তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ ও শাস্ত্রজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র জাতির শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে নানাদেশ-পরিভ্রমণজনিত যে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার আবশ্যক, তখনও রামদাস স্বামীর তাহার সংস্থান ছিল না। এই কারণে এবং শাস্ত্রানুসারে, "পৃথিবী-প্রদক্ষিণ"-পূর্ব্বক তীর্থদর্শন না করিলে সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভ হয় না বলিয়া, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "পৃথিবী-প্রদক্ষিণ" ও তীর্থাটনকার্য্য পরিসমাপ্ত করিবার মানস করিলেন।

এই সংকল্পানুসারে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রামদাস স্বামী পৃথিবী-প্রদক্ষিণে (ভারতভ্রমণে) যাত্রা করিলেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিমাহাত্ম্য ও রামোপাসনার প্রচারপূর্ব্বক শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে করিতে ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। প্রথমে বারাণসীক্ষেত্র ও তৎপরে যথাক্রমে অযোধ্যা, গয়া, প্রয়াগ, গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবন ও পিণ্ডারক প্রভাসাদি ক্ষেত্র পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীমূর্ত্তির (রামচন্দ্র মূর্ত্তির) প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে জ্ঞানধর্ম্মে ও রামোপাসনায় দীক্ষিত করিয়া দেবভূমি হিমাচলের উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি শ্রীনগর, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, উত্তর মানস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থসমূহের দর্শন ও

তথায় কিয়ৎ কাল অবস্থান করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রামদাস পূর্ব্বাঞ্চলের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় স্বমতপ্রচার ও মঠস্থাপন করিয়া, তিনি দক্ষিণসমুদ্রতীরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিলেন। কথিত আছে, বিভীষণের রাজধানী দর্শন করিবার মানসে সিংহল দ্বীপেও গমন করিয়াছিলেন। রামদাস তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদিনান্তে পুনর্ব্বার গোদাবরীতীরে নাশিকের সন্নিহিত পঞ্চবটীতে প্রত্যাগত হইলেন। পৃথিবীপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া তিনি "গঙ্গা-প্রদক্ষিণ" (১৫) করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি গোদাবরীর (গঙ্গার) উৎপত্তিস্থান সহ্য-পর্ব্বতস্থিত "ত্র্যম্বকেশ্বর" হইতে পূর্ব্বসাগরের তীরবর্ত্তী "রাজমহেন্দ্রী" পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ পরিক্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভারতের যে সকল অংশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত পরমার্থ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। এইরূপ দেশপরিভ্রমণে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। (১৬)

এত দিনে রামদাস স্বামীর সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সহিত অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছিলেন। (১৭) যৌবনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও শাস্ত্রবিচারে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে

---

(১৫) মহারাষ্ট্রীয়গণ গোদাবরী নদীকেই গঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শিব-পুরাণে লিখিত আছে যে, মহর্ষি গৌতমের আশ্রম পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে ছিল। তিনি একদা গোহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্য শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান ত্রিলোচন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহর্ষি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করের বরে গঙ্গা গৌতমের আশ্রমের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইলেন। সেই গঙ্গাই কলিযুগে গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধা হন।

(১৬) রামদাস স্বামীর বখরের উত্তর সংস্করণেই "পৃথিবী-প্রদক্ষিণের বিবরণ" সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(১৭) রামদাস স্বামীর বখরে ও মহীপতিকৃত সন্তবিজয়ে রামদাস স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অভ্রান্ত-লক্ষ্যতা সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আমরা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। সেকালের প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় বালক অশ্বারোহণাদি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। রঙ্গনাথ স্বামী প্রভৃতি রামদাসের সহযোগিগণও অশ্বারোহণাদিতে নিপুণ ছিলেন। গ্রামলেখকের ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র—বিশেষতঃ রামদাসের ন্যায় দুর্দ্দান্ত বালক যে বাল্যকালে সে শিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন, ইহা আমাদের কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। সেকালের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও যে অশ্বারোহণাদি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, শিবাজীর বখরে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেশ পর্যটনের ফলে লোকচরিত্র, ব্যবহারনীতি এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি, ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। মলিনতা প্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্মের পরিমার্জ্জন ও নিষ্কাম ধর্ম্মমূলক ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করিয়া, স্বদেশবাসিগণকে জ্ঞান ধর্ম্মে গরীয়ান্ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল। পৃথিবী পর্যটন পরিসমাপ্ত হইলে তিনি শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনাবিধানের জন্য কিয়দ্দিবসমাত্র জন্মগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজাতির হিতসাধন মানসে কৃষ্ণাতীরে—মহারাষ্ট্র দেশের কেন্দ্রস্থলে গমন করেন। কথিত আছে, তাঁহার ইষ্টদেবতার আদেশই তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ কৃষ্ণাতীরে গমনে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর করিয়াছিল।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রামদাস প্রথমতঃ কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থান মহাবলেশ্বরে আশ্রম স্থাপন করিলেন এবং হরিসংকীর্ত্তন, কথকতা, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নানা স্থানে "সগুণ-রামোপাসনার" প্রচার করিয়া "ভক্তিমার্গ বিস্তার" করিতে লাগিলেন। ক্রমে জয়রাম স্বামী, মোরয়াদেব, কেশব স্বামী, রঘুনাথ স্বামী ও তুকারাম প্রভৃতি তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয় সাধুবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবন্নিষ্ঠা ও সদাচার প্রভৃতি গুণে সামসময়িক ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধুপুরুষগণের শীর্ষস্থানীয় হইলেন। রামদাস যাঁহাদিগকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারাই তদীয় আধ্যাত্মশক্তি দর্শনে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে "সমর্থ" এই গৌরবাস্পদ উপাধি প্রদান করিলেন।

আমরা এইখানে রামদাস স্বামীর সাধনাবস্থার ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সাধনালব্ধ শক্তির বলে মহারাষ্ট্র সমাজে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, বারান্তরে তাহা আমাদিগের আলোচ্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

শ্রীমতী ইভেরার্ড কোট্‌স্।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ইংরাজ, আমেরিকান ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পাঠকসম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে পরিচিতা ও সমাদৃতা। অল্প দিন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও তাঁহার শ্লেষপূর্ণ ও আনন্দপ্রদ রচনার ইতিমধ্যেই তিনি পাঠকসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নূতন পুস্তক, A Voyage of Consolation প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে "বুকম্যান" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব।

বংশপরিচয়।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ক্যানেডিয়ান। তিনি অণ্টেরিও প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্র্যাণ্টফোর্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিষ্টার চার্লস ডন্‌কান যৌবনে জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। এখানে তিনি এক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্মানিত নাগরিক। তিনি নানা উচ্চ নাগরিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষা; বাল্যরচনা।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ব্র্যাণ্টফোর্ড ও টরণ্টো এই দুই স্থানে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষার কোনও বিশেষত্ব ছিল না; সাধারণতঃ সকলের যেরূপ শিক্ষা হয়, তাঁহারও সেইরূপ হইয়াছিল। বাল্যে বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশের জন্ত সম্পাদকদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে সকল রচনা অধিকাংশ লেখকের বাল্যরচনার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রকাশের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। দুই একটি রচনাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহার রচনাস্পৃহাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীমতী কোট্‌স্ তাঁহার পিতার প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতাকে বৃহৎ সংসার চালাইতে হইত, সেই জন্ত তিনি প্রথম হইতেই কন্তার সাহিত্যসেবায় জীবিকা-অর্জ্জন-স্পৃহার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রসেবা।

তিনি প্রথমেই কয়খানি দৈনিকপত্রের সংবাদদাতা হইয়া নিউ-অর্লিন্স প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। আমেরিকায় সাধারণতঃ বালিকাগণ একটু অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং তদীয় পিতা তাঁহার বিদেশগমনে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। যৌবনসুলভ অদম্য উৎসাহসহকারে, যে প্রকারেই হউক জীবনসংগ্রামে সাফল্যলাভ করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি অখণ্ড মনোযোগসহকারে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। প্রথমাবধিই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনলালসা ও রচনায় দক্ষতালাভস্পৃহা বিশেষ বলবতী ছিল। এবার গৃহের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে মুক্ত জগতে জনতার সংঘর্ষে আসিয়া নানা ঘটনা ও নানা পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন। ধ্যানযোগীর পক্ষে আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া কেবল পুস্তকপাঠে যে জ্ঞান দুষ্প্রাপ্য, কর্ম্মযোগীর পক্ষে বিপুল জনতাসংঘর্ষে সে জ্ঞান সহজপ্রাপ্য। এবার জগতে বাহির হইয়া তিনি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন, সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁহার রচনা বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

নিউ-অর্লিন্স হইতে তিনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, সেগুলি সাদরে গৃহীত হওয়াতে, তিনি সংবাদপত্রসেবাতেই নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি "ওয়াশিংটন পোষ্ট" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তখন কুমারী ডন্‌কানের বয়স বিংশতিবৎসরমাত্র। এই অল্প বয়সে সম্পাদকের সহকারিরূপে তিনি পুস্তকের সমালোচনা করিতেন, এবং কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধরচনাও করিতেন। সময় সময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরচনার ভারও তাঁহাকে লইতে হইত। ওয়াশিংটন হইতে টরণ্টোয় গমন করিয়া তিনি "টরণ্টো গ্লোবে"র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি প্রথিতকীর্ত্তি অধ্যাপক গল্ডইন স্মিথের মুখপত্র "টরণ্টো উইক" নামক সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক তাঁহাকে রচনাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহদান করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম হইতেই তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, এই জন্য কিছু দিন পরে তিনি "মন্ট্রিয়েল ষ্টার" পত্রের সহকারিসম্পাদকরূপে তথায় গমন করেন। তখন "ক্যানেডিয়ান প্যাসেফিক ষ্টীমার লাইন" খোলা হইয়াছে। ব্রিটিশ বাষ্পীয়পোতে ভূপ্রদক্ষিণাভিলাষে তিনি ও আর একজন মহিলা দেশভ্রমণে বাহির হন। শীতকালের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন। এখানেই তাঁহার সহিত মিষ্টার ইভেরার্ড কোট্‌সের সাক্ষাৎ হয়। মিষ্টার কোট্‌স্ তখন ভারতগভর্মেণ্টের বিজ্ঞানবিভাগে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া পরিণয়পাশে বদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ভ্রমণ।

ভূপ্রদক্ষিণকালে আমেরিকার সংবাদপত্রে যে সকল পত্র লিখিবার কথা ছিল, সে সকল লেখা হইলে, লেখিকা তাঁহার ভ্রমণাভিজ্ঞতা উপন্যাসে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করেন;—তাহার ফল তাঁহার A Social Departure গ্রন্থ। তিনি এই পুস্তক "লেডিস্ পিক্‌টোরিয়াল্" পত্রে প্রকাশের প্রস্তাব করিলে, তৎপত্রের সুচতুর সম্পাদক সাদরে সে পুস্তক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। সম্পাদক বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই মনোরম ভ্রমণকাহিনীপূর্ণ উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে। এই সম্পাদকের অনুরোধেই লেখিকা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আমেরিকান সহচরী মহিলাকে ইংরাজবালিকারূপে বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলেই, পাঠকগণের নিকট আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা লেখিকার একখানি অতি সুখপাঠ্য উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

উপন্যাস ও গল্প।

লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অবলম্বন করিয়া, An American Girl in London রচনা করেন। অনেকের মতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় গ্রন্থ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ, প্রথম গ্রন্থের রচনাকালে তাঁহার রচনা-চাতুর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; অধিকন্তু, বহু দিন সংবাদপত্রসেবার ফলে ও সেই গ্রন্থ সংবাদপত্রের জন্য লিখিত হওয়ায়, পুস্তকের রচনা সংবাদপত্রেরই উপযোগিনী হইয়াছিল।

দুই বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত হইবার জন্য কুমারী ডন্‌কান কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রথমে বঙ্গদেশে অবস্থানকালে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া, The Simple Adventures of a Memsahib রচনা করেন।

Idler পত্রে তাঁহার Vernou's Aunt নামক গল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্য হিসাবে ইহাই তাঁহার নিকৃষ্ট রচনা। ইহার পর সাময়িকপত্রে পুরস্কার ... The Story of Sonny Sahib রচনা করে... তিনি পুরস্কার ...

কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি অত্যন্ত মনোরম। তাঁহার এক বৃদ্ধা আয়ার নিকটে তিনি সিপাহীবিদ্রোহের বিবিধ গল্প শুনিয়াছিলেন। ইংরাজের সেই ভীষণ দুর্দ্দশার সময় ইংরাজ শিশুদিগের হত্যার বর্ণনা করিতে করিতে আয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়াই এই পুস্তকরচনার কল্পনা লেখিকার মনে উদিত হয়।

A Daughter of To-day নামক পুস্তকই তাঁহার প্রকৃত উপন্যাস রচনার প্রথম উদ্যম। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্ধতা আধুনিক মহিলাদিগের আত্মগরিমার ভাব দেখানই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

কিছু দিন য়ুরোপে বাসের পর ভারতবর্ষে আসিয়া লেখিকা তাঁহার His Honour and a Lady রচনা করেন; কলিকাতার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের জীবনকাহিনীর বর্ণনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বার য়ুরোপের অভিজ্ঞতার ফলে লেখিকা তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের ভাষা তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোট্‌স্ দম্পতী আর ভারতবর্ষে আসিবেন না স্থির করিয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই লণ্ডনে অবস্থানকালে মিষ্টর কোট্‌স্ কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র "ডেলি নিউসের" সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। পূর্ব্বে মিষ্টার কোট্‌স্ ভারত গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু সংবাদপত্রসেবাই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। এই অনুরোধ পাইয়া সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া বিদুষী পত্নী সহ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। দুই বৎসর কাল "ডেলিনিউস্" সম্পাদন করিয়া, কলিকাতায় গ্রীষ্মকালযাপন কষ্টসাধ্য এবং সম্পাদকের কর্ম্মভারও গুরুতর বলিয়া, সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়া সংবাদদাতৃ-রূপে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাজধানী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত রাজধানী চিরশৈত্যময়ী সিমলায় গমন করেন। এখানে গিয়া প্রথম বৎসরেই লেখিকা তাঁহার নবপ্রকাশিত উপন্যাসের অধিকাংশ রচনা করেন।

অন্যান্য কথা।

শ্রীমতী কোট্‌স অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়া ও তন্বী। তাঁহার কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উজ্জ্বল চক্ষু ধূসর। তাঁহার সরস মনোভাব যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মুখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অবধান নাই। পুস্তকরচনাতেই তাঁহার আনন্দ। তিনি প্রত্যহই কিছু কিছু রচনা করেন—গড়ে প্রতি দিন ৩০০ হইতে ৪০০ কথা লিখিয়া থাকেন। তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া রচনা করেন বলিয়া তাঁহাকে আর বড় রচনার সংশোধন করিতে হয় না।

কলিকাতার ও সিমলার ইংরাজ-সমাজের প্রায় সকল উৎসবেই কোট্‌স্ দম্পতী যোগদান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী কোট্‌স্ অশ্বারোহণ, দ্বিচক্র-রথচালন প্রভৃতি নানা ব্যায়ামে অভ্যস্তা।

ইতিহাস।

শিবজী।

বিগত মাসের "মান্দ্রাজ রিবিউ" পত্রে মাননীয় জষ্টিস্ রাওবাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ [illegible] মহোদয় মহারাষ্ট্র জাতির স্বরাজ্যলাভচেষ্টা সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট চিন্তাপূর্ণ [illegible] প্রকাশিত করিয়াছেন। রাও বাহাদুরের লিপিকৌশল ও প্রগাঢ় ইতিহাসজ্ঞান এই [illegible]রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

শিবাজীর অকালমৃত্যুর পর, মহারাষ্ট্র রাজ্যে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে অনেকে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন না। শিবাজীর জীবদ্দশায় —যখন তিনি মহারাজ জয়সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও পরে দিল্লী গিয়া সম্রাট অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, তখনই এইরূপ একটি বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও সৌভাগ্যের বলে তাহা প্রতিহত করিয়াছিলেন ও অবশেষে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট তাঁহাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিবাজী বুঝিয়াছিলেন, অওরঙ্গজেবের এই সন্ধি কেবল বলসংগ্রহ ও আক্রমণের সুযোগানুসন্ধানের অবসরমাত্র। সুবিধা পাইলেই সম্রাট তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। এই অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়নির্দ্ধারণে শিবাজীর জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় গৃহবিবাদ হইতে নিরস্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ও মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সন্ধি দ্বারা উক্ত নরপতিদ্বয়ের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। কারণ মোগলসেনা যখন উক্ত রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করিল, তখন তাঁহারা শিবাজীর সাহায্যবলে আত্মরক্ষা ও শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহারা শিবাজীকে কর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু শিবাজী ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বসংস্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের আশঙ্কায়, দাক্ষিণাত্যে কাবেরী উপত্যকায় অসময়ে আশ্রয়গ্রহণের জন্য "বিজয় ও বন্ধুতা" দ্বারা একটি নিরাপদ স্থান প্রস্তুত করিলেন। সহ্যাদ্রি, ঘাট ও অন্যান্য গিরিমালার শিখরস্থ পার্ব্বত্যদুর্গগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া, তাহাতে রীতিমত সৈন্যসন্নিবেশ ও খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানাদি করিয়া রাখিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—জয়লক্ষ্মী সকল সময়ে যাঁহাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন—স্বাধীনতাপ্রণোদিত সেই সৈন্যদল তাঁহার বিশেষ সহায় ছিল। কিন্তু হায়! তাঁহার অকালমৃত্যু এই বিপুল আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপন, অথবা পরবর্ত্তী রাজার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বাধাবিমুক্ত প্রবল জলস্রোতের ন্যায় মোগল আক্রমণে তাঁহার আজীবন চেষ্টায় সংস্থাপিত মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী (শম্ভুজী) তাঁহার প্রত্যেক আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করেন। পরে মোগল-সৈন্যদল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শিবাজী তাঁহাকে পহ্লালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর, রায়গড়-স্থিত মন্ত্রিসভা সাম্ভাজীকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্ত্রণা করেন। কিন্তু তাঁহারা কোনও কোনও সেনানায়ককে এই ষড়যন্ত্রভুক্ত করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি হাম্বিররাও মোহিতে ইহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং ইহা বিফল হইয়াছিল। তাঁহার সহায়তায় সাম্ভাজী পহ্লালা হইতে পলায়ন করেন, এবং মন্ত্রিদলকে পরাভূত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি যে রাজ্যশাসনের বিশেষ অনুপযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তরকালীন কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বিমাতাকে অনশনে হত্যা করেন। তাঁহার হস্তে অনেক পুরাতন মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

তিনি যত দিন রাজা ছিলেন, তত দিন এইরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

সাম্ভাজী স্বভাবতঃ বীরপুরুষ ছিলেন, এবং এক সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, তিনি এই সকল নিষ্ঠুরতাসত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাক্রমের শৌর্য্যখ্যাতি অটুট রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। অতিরিক্ত মদ্যপানে ও নীচ আমোদ প্রমোদে দিন দিন তাঁহার মানসিক বল ও সাহসের ক্ষয় হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি প্রিয় পরিচর কলুশার পরামর্শে দেবতাপূজা ও যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যের অষ্টপ্রধানেরা (সচিবেরা) স্বীয় পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজ্যপালনের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সাম্ভাজী, শিবাজীর রাজকীয় অথবা সামরিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেন না। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। সৈন্য সকল নিয়মিতরূপে বেতন পাইত না। পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অযত্নে জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। রাজকর আদায়ের ভার প্রকাশ্য নিলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। ঠিক এই সময়ে সম্রাট অওরঙ্গজেব কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ হইতে সংগৃহীত অগণ্য সৈন্যদল লইয়া "পার্ব্বত্যমূষিকের" অত্যাচারদমনে আগমন করিলেন।

এই সময়ে অওরঙ্গজেবের এক পুত্র পিতার সহিত বিরোধ করিয়া সাম্ভাজীর নিকট আশ্রয়লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাম্ভাজী তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। ইহাতে সম্রাটের সহিত সন্ধি করিবার একটি সুন্দর সুযোগ নষ্ট হইয়াছিল। পুরাতন মন্ত্রীরা তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শত্রুদলের অনায়াসগতি রুদ্ধ করিবার কোনও আয়োজনই করা হইল না।

অওরঙ্গজেবের সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের তিন বৎসরের মধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিল। পরে অসহায় অবস্থায় সাম্ভাজীকে অনায়াসে ধৃত করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইহার পর মহারাষ্ট্র রাজ্যের সমস্তাংশ মোগলসৈন্যে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। গিরি-দুর্গগুলিতে রীতিমত সৈন্যনিবেশ অথবা আত্মরক্ষার কোনও আয়োজন না থাকাতে, সেগুলি শীঘ্রই শত্রুগণের অধিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে রায়গড়ও অধিকৃত হইল। সাম্ভাজীর স্ত্রী পুত্র ধৃত হইয়া মোগল শিবিরে নীত হইলেন।

এইরূপে দাক্ষিণাত্যে আগমনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে অওরঙ্গজেবের চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল। তিনি নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। বোধ হইল, শিবাজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ষাট বৎসর ধরিয়া শিবাজী ও সাম্ভাজী যে প্লাবন প্রতিহত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিল ও ভবিষ্যতে বাধা দিবার কোন চিহ্ন রহিল না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ তখন সুদূর শত্রুনগরে বন্দীকৃত। সাম্ভাজীর শিশু পুত্র শাহুও তদ্রূপ অবস্থায় মোগল-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

তখন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভাগ্যনেমির নিম্নস্থানে অবস্থান করিতেছিল। তাহার পুনরুত্থানের কোনও আশা ছিল না। কিন্তু এই বিষম ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতেই মহারাষ্ট্র ভাগ্যরবি দীপ্তকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শিবাজীর অধীনে শিক্ষিত এক দল স্বদেশপ্রেমিক সর্ব্বতোভাবে সাহায্যহীন ও অর্থশূন্য হইয়াও, স্বদেশকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া অওরঙ্গজেবের বিজয়িনী চমূকে হিন্দুস্থানে পুনঃপ্রেরণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম বন্দিভাবে রায়গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তিনি

তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইঁহাদের দলপতি হন। তখন [illegible] বিংশতিবৎসরমাত্র। কিন্তু তিনি শিবাজীর শৌর্য্য ও সামরিক বুদ্ধি, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বভাবের মাধুর্য্য ও স্বাতন্ত্র্যানুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বকার্য্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

সাম্ভাজীর শিশু পুত্র শাহু তখন প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রের রাজা। কিন্তু তিনি তখন মোগলদিগের নিকট বন্দী। সুতরাং রাজারাম রাজপ্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা এইখানে রাজারামের বিশিষ্ট অনুচর ও সহকারিগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব :—

(১) প্রধান মন্ত্রী প্রহ্লাদ নীরাজী—ইনি শিবাজীর মন্ত্রী ন্যায়াধীশ (Chief Justice) নীরাজী রাওজীর পুত্র। সাম্ভাজীর রাজত্বকালে প্রহ্লাদ নীরাজী পদচ্যুত হইয়া সামরিক ঘটনার একজন নিঃস্বার্থ দর্শকমাত্র ছিলেন। তখন সমস্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক ছিল না। মহারাষ্ট্র ইতিহাসলেখক মিঃ গ্রাণ্ট ডফ্ সহজে ব্রাহ্মণ রাজপুরুষদিগের প্রশংসা করিতে চাহেন না, কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত ইঁহাকে নিঃস্বার্থপর ও অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রহ্লাদ নীরাজী স্বীয় আরব্ধ কার্য্যের শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই দেশের অনেকাংশ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সমূলে বিতাড়িত করা তখন কেবল সময়-সাপেক্ষ ছিল।

(২) হনুমন্ত রাও—ইঁহার পিতা সাহাজীর অধীনে একজন "কারকুন" ছিলেন। ইনি স্বাধীনচেতা ও নিঃস্বার্থপর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। ইতিপূর্ব্বে রায়গড়ে অবস্থানকালে সাম্ভাজীকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বিফল হইয়াছিল। দেশের এই বিপদের সময় তিনি রাজারামের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রহ্লাদ নীরাজীর সহিত একমত হইয়া তাঞ্জোর "জিঞ্জি" নামক দুর্গ স্বীয় দলস্থ লোকদিগের আশ্রয়স্থানরূপে নিরূপিত করিলেন।

(৩) প্রথম পেশোয়া মোরোপন্ত পিঙ্গলের পুত্র নীলো মোরেশ্বর "জিঞ্জি" দুর্গের রক্ষক ও সামরিক আয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে দুর্গসংস্কার ও দুর্গ-প্রাকারের আবশ্যকমত নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার আরম্ভ করিলেন।

(৪) সেনাপতি রামচন্দ্রপন্ত অমাত্য—ইনি কোল্হাপুরে বাবদস্থিত বর্ত্তমান পন্ত অমাত্য-পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। রামচন্দ্রের পিতা আবাজী সোনদেব শিবাজীর প্রধান অমাত্য ও সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে এত দূর বিশ্বাস করিতেন যে, স্বীয় অনুপস্থিতিকালে তাঁহাকে যথেষ্ট কার্য্যনির্ব্বাহের ক্ষমতা দিতেন। এই যুদ্ধের সময় ইনি রাজারাম ও অন্যান্য দলপতিগণের স্ত্রীপুত্রের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। ইনি লোকতঃ "বিদ্রোহি"-দলের অধিনেতা হইয়াছিলেন।

(৫) শঙ্করজী মল্হার—ইনি সাম্ভাজীর একজন সচিব ছিলেন। ইনি প্রথমে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বারাণসীধামে প্রস্থান করেন। শাহু রাজা হইবার পর দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(৬) পরশুরাম ত্র্যম্বক—ইনি কিল্লির "কুলকরণী" ছিলেন ও সেতারাবিভাগস্থিত উন্ধের পন্ত প্রতিনিধিপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ।

(৭) শঙ্করজী নারায়ণ—ইনি ভোর প্রদেশের পন্ত সচিবপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। উপরি-

লিখিত দুই জন সেনাপ[illegible] পদের প্রধান সহকারী ছিলেন। ইঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনাদের কার্য্য[illegible]দন করিতেন।

(৮ও৯) ধনাজী যাদব ও সান্তাজী ঘোরপাড়—দায়িত্বজনক কার্য্য সকল ইঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। প্রথমে ইঁহারা সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ১৬৭০ অব্দে পদ্-হপের নিকটে যে যুদ্ধ, প্রথমে সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শেষে জয়লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাত হইয়া উঠেন। ত্রয়োদশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিয়া পরাক্রান্ত মোগলদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা রাজারাম প্রভৃতির সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহাদের ভাণ্ডার অর্থশূন্য। কিন্তু তাহাতে ভগ্নমনোরথ না হইয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠন দ্বারা সৈনাদিগের বেতন, আরোহণের অশ্ব, অস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে দেশময় বড় অত্যাচার হইতে লাগিল। ইঁহাদের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মোগলসেনা ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। এইরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই মোগলসৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রসেনা ক্রমে সাহস পাইয়া গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও বেরার আক্রমণ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময়ে সান্তাজী গুপ্তশত্রুর চক্রান্তে নিহত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার তিন ভ্রাতা অতি দক্ষতার সহিত সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা গুটি ও সন্দু নামক স্থানে ক্ষুদ্ররাজত্বস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাহুর রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত ধনাজী জীবিত ছিলেন।

অন্যান্য মহারাষ্ট্র দলপতিদিগের মধ্যে খান্দারাও দাবাদের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা শিবাজীর সময়ে "তেলিগাঁওয়া"র "পাটিল" ছিলেন। তিনিও প্রথমে জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে, বিশেষতঃ গুজরাট ও খান্দেশ-প্রদেশে, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। "ধার" ও [illegible] আদি-পুরুষ তাঁহার একজন সহযোগী ছিলেন। ইনি বহু দিন জীবিত ছিলেন। সাহুর রাজা হইবার পর পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ চৌথের সনন্দগ্রহণের জন্য যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, তিনি তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা স্ব স্ব অনুচরবর্গকে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে চৌথ ও শ্রীদশমুখী আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করেন। এইরূপে পরশোজী ভোঁসলে গণ্ডবন ও বেরারপ্রদেশে, নিম্বলকার "গঙ্গাথাদি" (?) দাবাদে গুজরাট ও খান্দেশ প্রদেশের চৌথ আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। অন্যান্য সেনানায়কেরা কর্ণাট অথবা মোগলাধিকারচ্যুত দেশে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"প্রভু" দলপতিদিগের মধ্যে খাণ্ডেরাও বল্লাল চীৎনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতা শিবাজীর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে সাম্ভাজী কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন। বল্লাল প্রথমে রাজারামের সহিত জিঞ্জীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে বেলারীর [illegible] পলায়নকারীদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, ইনি সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং একাকী অবস্থান করেন। পরে মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হন। শত্রুপক্ষ অত্যন্ত নির্য্যাতন করিলেও, অশেষ যন্ত্রণা সত্ত্বেও স্বীয় প্রভুর আশ্রয়স্থান প্রকাশ করেন নাই। পরে তাঁহারই সাহায্যবলে রাজারাম জিঞ্জি দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পর (কায়স্থ) দলপতিদিগের অপর এক জন, প্রয়াগজী, অওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে [illegible] নগরী রক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

সহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সকল দলপতিগণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্র তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তখন রাজারাম জিঞ্জি দুর্গে আপন

দরবার স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজকার্য্য নি[illegible]ছিলেন। সেনানায়কেরা বিভিন্ন প্রদেশের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা পাইতেছিল[illegible]র লুণ্ঠনে ও উৎপীড়নে দেশবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। আওরঙ্গজেব দেখিলেন, বিদ্রোহীদিগের এই নূতন আশ্রয়স্থান বিনষ্ট করিতে না পারিলে, তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি অচিরে জিঞ্জিদুর্গধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেনাপতি জুলফিকির খাঁ এই কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। ১৬৯১ অব্দে জিঞ্জির অবরোধ আরব্ধ হইল। কিন্তু ১৬৯৮ অব্দের পূর্ব্বে তিনি তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি দেখিলেন, রাজারাম প্রভৃতি পলায়ন করিয়াছেন।

জিঞ্জি দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য সমস্ত মোগলসেনা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং দেশের অন্যান্য অংশে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণ নির্ব্বিঘ্নে রণসজ্জায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা মোগলসেনাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন। জিঞ্জি দুর্গ শত্রুপক্ষের হস্তগত হওয়ায় যে দেশব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সূর্য্যোদয়ে কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় তাহা সত্বর অপসৃত হইল। ধনাজী যাদব ও সন্তাজী ঘোরপড়ে দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন পূর্ব্বক জিঞ্জি পুনরধিকার করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজীর শিক্ষিত কতকগুলি সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। আর মোগলশিবির লুণ্ঠন করিয়াও যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রসেনা বিভিন্ন নায়কের অধীনে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছিল। ১৬৯২ অব্দে রামচন্দ্র পন্থ বিশালগড় হইতে সেতারায় উপস্থিত হইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপ্রেরিত সেনাদল রায়গড়, পাহ্লা ও মিরাজ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্র অধিকারের "সীমান্ত শিবিরে" পরিণত করিল। এই [illegible] বিভিন্ন দলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ১৬৯৩ অব্দে আওরঙ্গজেব ভীমা নদীর তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে আসাদ খান ও আপনার এক পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৬৯৪ অব্দে সন্তাজী ঘোরপড়ে মোগল সম্রাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দেশসমূহে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চিমে রামচন্দ্র পন্থ সসৈন্যে সোলাপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬৯৫ অব্দে সন্তাজী, পরসোজী ভোঁশলে ও নিম্বলকারকে বেরার দেশ লুণ্ঠন করিবার ভার দিয়া স্বয়ং কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া জিঞ্জি দুর্গের অবরোধকারী মোগলসেনা আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ধনাজী পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিয়া মোগলসেনাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। অবশেষে পরাজিত মোগলেরা সন্ধিপ্রার্থনা করাতে, একটি "সাময়িক সন্ধি" সংস্থাপিত হয়। ইহার সর্ত্তানুসারে মোগল সেনাপতি অবরোধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। আওরঙ্গজেব এই সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আসাদ খান ও স্বীয় পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া জুলফিকির খাঁর অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু জুলফিকির শীঘ্র দুর্গাবরোধ আরব্ধ করিতে পারিলেন না।

সন্তাজী উপস্থিতবিপন্মুক্ত হইয়া বিজাপুরস্থ সম্রাট-শিবিরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে "দোদারি"র যুদ্ধে বিজাপুরের মোগল শাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁকে পরাভূত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। হিম্মত খাঁ নামক অপর এক জন সেনাপতিও পরাভূত হইয়া বন্দী হয়েন।

১৬৯৭ অব্দে পুনরায় জিঞ্জি দুর্গের অবরোধ আরব্ধ হইল। কিন্তু রাজারাম ইতঃপূর্ব্বেই

তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৬৯৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে জিঞ্জিদুর্গ মোগল সেনার হস্তগত হয়।

জিঞ্জি হইতে পলায়নের পর রাজারাম সেতারায় রামচন্দ্র পন্তের সহিত মিলিত হন। অন্যান্য সেনাপতিরা ক্রমে তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সময়ে কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশে অবিরত যুদ্ধ চলিতেছিল। ধনাজী যাদব তথায় বিশেষ দক্ষতা সহকারে মহারাষ্ট্র অধিকারগুলি রক্ষা করিতেছিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দুর্গগুলি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিত। এ দিকে খানোজী আঙ্গে বোম্বাই হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭০০ অব্দে অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্ব্বত্য দুর্গমালার অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজে সৈনাপত্য গ্রহণ করেন ও জুলফিকির খাঁকে রাজারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল সম্রাট ক্রমে ক্রমে সমস্ত পার্ব্বত্যদুর্গগুলির অধিকার করিয়া অবশেষে সেতারা অবরোধ করিলেন। বহুদিন ধরিয়া আত্মরক্ষার পর সেতারা শত্রুকরতলগত হইল।

ঠিক এই সময়ে রাজারামের মৃত্যু হয়। শাহু তখনও মোগল শিবিরে বন্দী, সুতরাং রাজারামের দশমবর্ষীয় পুত্র রাজা হইলেন। রামচন্দ্র পন্ত পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেনাপতিগণ আহূত হইয়া ধনাজীর অধীনে মোগলসেনার সহিত অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র চৌথ ও সরদেশমুখী সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিন্তু গিরিদুর্গই মহারাষ্ট্র সেনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সেগুলি শত্রুকরতলগত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সমতল রাজ্যাংশে ছড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদিগকে নূতন যুদ্ধপ্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যুগপৎ খান্দেশ, বেরার ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন। এক দল নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মালবপ্রদেশে শিবিরস্থাপন করিল।

অবশেষে ১৭০৩ অব্দে, সেনাপতিগণের পরামর্শানুসারে, অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি এই,—

১। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রদেশ আক্রমণ করিবেন না।

২। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ছয়টি সুবায় চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতে পারিবেন।

ইহা ব্যতীত সম্রাটের মতানুসারে শাহুর সহিত সিন্ধিয়া ও যাদব নামক দুই সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলসেনাপতির দুই কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অকলকোট, ইন্দাপুর, নেবাস ও বারামতী নামক চারিখানি জায়গীর প্রদত্ত হইবে, ইহাও স্থির হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। সুতরাং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পিমালা অধিকার করিয়া তথায় শিবাজী (রাজারামের পুত্র) ও তাঁহার মাতা তারাবাঈএর বাসস্থান স্থির করিল। পবনগড়, সিংহগড় ও রায়গড় শীঘ্রই পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ১৭০৭ অব্দে ধনাজী পুণা চাকন অধিকার করেন। ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করা দুঃসাধ্য দেখিয়া অওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিবার উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সাম্ভাজীর পুত্র শাহু মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতিদিগকে একখানি পত্র লেখেন। কি[illegible] ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব ও শাহুর [illegible] পত্র হইতে প[illegible] প্রতীয়মান হয় যে, শেষ দশায় অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র যুদ্ধের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলে[illegible]

তখন তাঁহার বিপুল সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজকোষ অর্থশূন্য। বিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে মোগল সম্রাটের অজেয় শৌর্য্যখ্যাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিজে অত্যল্পমাত্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পটমণ্ডপে কালক্ষেপ করিতেছেন। তখন তাঁহার মনে ভীষণ অনুতাপ ও হতাশার উদয় হইল। অবশেষে তিনি আমেদনগরে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জুলফিকির খাঁর পরামর্শানুসারে আজিম শা শাহুকে মুক্ত করেন। শাহু মহারাষ্ট্রগণের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে, আজিম শাহ তাঁহাকে স্বরাজ্য—যাহা তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক বিজাপুর রাজ্য হইতে অধিকৃত হইয়াছিল—ভীমা ও নর্ম্মদা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জায়গীরগুলি প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শাহু মুক্ত হইবার পর সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশে রাজরূপে স্বীকৃত হইয়া ১৭০৮ অব্দে সেতারা নগরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছয়টি সুবায় শাহুর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ক্ষমতা স্বীকার করেন, এবং পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বা[illegible] বিশ্বনাথ পেশোয়া দিল্লী হইতে স্বরাজ্যপ্রদেশ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের রীতিমত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে কুড়ি বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে, বোধ হয়, এই কয় বৎসরের ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষাবিধ্যাত। শিবাজীকে কখনও সমগ্র মোগলসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। অবশ্য তিনি যখন মহারাজ জয়সিংহের নিকট সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন, তখন তাঁহাকে কতকটা আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র দলপতিগণের এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধে অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে প্রথমে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহাদের অর্থবল ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রথমে এক এক জন ক্ষুদ্র সর্দ্দারমাত্র ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত ও একমত হইয়া পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিয়াছিলেন। শিবাজী স্বীয় বীর্য্য ও প্রতিভার দ্বারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের উপর এক মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছিল; কিন্তু এই সকল সেনানায়কদিগের সে সমস্ত কিছুই ছিল না। তাঁহারা একমাত্র অধ্যবসায়বলে মোগল-বিক্রমে পরাজিত ও ভীত দেশবাসিগণকে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সাম্ভাজীর নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খল রাজপ্রণালী দ্বারা দক্ষ পুরাতন কর্ম্মচারিগণ নিহত অথবা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান বল পার্ব্বত্যদুর্গাশ্রয়। সেগুলিও তখন অব্যবস্থায় জীর্ণ হইতেছিল; ক্রমে তাঁহাদের রাজা নিহত হইলে, এক জন অপরিণতবয়স্ক যুবা তাঁহাদের দলপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি দক্ষ, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রভুভক্ত ব্যক্তি এই দলভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রমেই মহারাষ্ট্র দেশে পুনরায় স্বাধীনতা-স্পৃহা সমুদিত হইয়াছিল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। "রাজটীকা" গল্পটি সুন্দর। ইহার আদ্যোপান্ত উজ্জ্বল বিদ্রূপবাণে রঞ্জিত। "মদনভস্মের পূর্ব্বে" ও "মদনভস্মের পর" দুইটি খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পর যোগসূত্রে সম্বদ্ধ। এই কবিতাযুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরমরমণীয়। বিশেষতঃ "মদনভস্মের পর" ইতিশীর্ষক কবিতাটির রচনাকৌশল ও শব্দচয়নচাতুরী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পী কবি ভাষা-দেবীর মন্দিরগঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কিছু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধ করি অনতিক্রমণীয়। কেন না, শব্দসঙ্গীত-শক্তির মোহে একান্ত মুগ্ধ হইলে অন্ত দিকে কবির দৃষ্টি থাকে না। "প্রবাসপ্রসঙ্গ" একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" একটি সুচিন্তিত ও সুরচিত প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের এই চরিত্র-চিত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৌলিক চিন্তাপ্রবণতা ও বিশ্লেষণশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রণীত "হীরার মূল্য" একটি সুন্দর ক্ষুদ্র গল্প। সুনিপুণ লেখক অতিসাবধানে অথচ অবলীলাক্রমে রহস্যরক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগরিত রাখিয়াছেন। তাঁহার জামেলা পাঠককে অনবরত বিস্ময়-চমকে চমকিত করিয়া উপসংহারে যখন পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় গল্প-রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন ময়নার মিলনানন্দে পাঠকের চিত্ত আনন্দ-বেদনাবিধুর ও চঞ্চল হইয়া উঠে। অল্প পরিসরের মধ্যে এই গল্পে দক্ষিণ হায়দরাবাদের বিলাস-লীলাচঞ্চল ওমরাহ-সমাজের ছবিখানির যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন মনোরম, তেমনই অভিনব।

মুকুল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। মুকুলের পূজার পরিচ্ছদ যেমন উজ্জ্বল, তেমনই সুন্দর। "রামতনু লাহিড়ী" প্রবন্ধটি যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই। "মুকুল" সকল সম্প্রদায়ের বালকবালিকার চিরসহচর হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। নীতিধর্ম্মের সাধারণ মূলসূত্র সার্ব্ব-জনীন, তাহাতে সম্প্রদায়ভেদে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। "মুকুল" সেই বিস্তৃত উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই ভাল হয়। সকল বালক থিয়োডোর পার্কার নহে ; তাই মনে হয়, তাহাদের বিবেকবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক মতগঠনের ভার গুরুজনের হস্তে ন্যস্ত রাখিলে মন্দ হয় না। "করুণার জয়" গল্পটি সুন্দর। "গাছের আহার" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর। লেখকের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তাঁহার বলিবার প্রণালী তেমনই সরল। "গোপাল ভাঁড়" যে কয়টি গল্প বলিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে। "বাহবা!" পূজার মুকুলের প্রধান অলঙ্কার। শিশুপাঠ্য সাহিত্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সকলের অগ্রণী। এই কবিতাটি তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে ; আমরা অনেক শিশুর মুখে "বাহবা"র আধ-আধ আবৃত্তি শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা রচনার আর কি সাফল্য বা পুরস্কার হইতে পারে ? "মজার মুলুক" একটি রহস্যপূর্ণ সচিত্র কবিতা। কবিতাটি বালকবালিকাদের উপযোগী ও সুন্দর হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

১

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করা যে যারপরনাই কষ্টকর, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যাহাকে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করি, সেরূপ কালের কোনও প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতের তাৎকালিক কোনও তত্ত্বের নির্ণয় করিতে হইলে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। রাশি রাশি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার করা বড়ই দুষ্কর। তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আবার ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পরের মত এত বিভিন্ন যে, তাহাদের সাহায্য লইলেও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অদম্য অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমাদের পক্ষে অপরিসীম আনন্দের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের মুদ্রা-আবিষ্কার ও তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার দ্বারা এ দেশে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিয়া, মুদ্রা, তাম্রফলক প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বারা যে সকল নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকেও বহুলপরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তগুলিই যে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত, তাহা বলা যাইতে পারে না। এই সকল আনুমানিক প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি লইয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। যত দিন হইতে ইতিহাস-রচনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত; ইতিহাসেতর গ্রন্থের ত কথাই নাই। এমন কি, দুই শত বা এক শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতি-

হাসিক তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেও অনেক স্থানে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয় করা যে অতীব দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের মত যদি কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণে যে বিশেষ দোষগ্রহণ করিবেন না, অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস আমরা করিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেইরূপ দুই একটি মতপার্থক্যের উল্লেখ করিব।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে, অব্দ বা সময়-নির্দ্ধারণ একটি প্রধান বিষয়। একটি কথা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও সকলে একমত নহেন। এই অব্দনির্দ্ধারণেও তাঁহাদের যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। তবে এই অব্দ-নির্ণয়ে তাঁহারা সকলেই একটিমাত্র মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন। মূলসূত্র এক হইলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে। উক্ত মূলসূত্রটি আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়। গ্রীক্ ঐতিহাসের নির্দ্দেশানুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করেন। এই বৈদেশিক সাক্ষ্য যে একটি প্রধান প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উক্ত বৈদেশিক সাক্ষ্য হইতে ইহা বুঝায় না যে, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীকবিজয় সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুমানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডারের সময় যে চন্দ্র-গুপ্তের উল্লেখ আছে, তিনি মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। এ বিষয়ে আমাদের মত [illegible] যাহা হউক, এই একমাত্র নির্ণীত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা গ্রীক-[illegible] পূর্ব্ব পশ্চাৎ সমস্ত বিষয়ের সময় স্থির করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অনেক [illegible] যে সিদ্ধান্তবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। [illegible] বলিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করি-[illegible] —"ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিবৃত্তিক কালনির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় [illegible] গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মূল একটিমাত্র কথা; [illegible] চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে [illegible]। সেই রাজদূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে, এবং উহা কোন্ সময়ে [illegible] হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা [illegible]। এই একমাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমু-দায় [illegible] ঐতিহাসিক বিবরণের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ অসম্-যোগময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১১২-১১৩ পৃঃ) কেবল এক গ্রীকবিজয়ের উপর নির্ভর করিলে যে সকল ঘটনার সময়নির্দ্ধা-রণ করা যায় না, ইহা প্রকৃত কথা। গ্রীকবিজয় কেহই অস্বীকার করেন না, আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকি। তবে তাহা যে চন্দ্রগুপ্তের সময় ঘটিয়াছিল, ইহার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং কাহার সময়ে প্রকৃত গ্রীকবিজয় ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণিত করিতে না পারিলে, কেবল গ্রীক বিজয়ের দ্বারা অন্যান্য সময়ের নিরূপণ কিরূপে হইতে পারে? এ সকল বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্দ্ধারণ আমাদিগের একটী প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মত উদ্ধৃত না করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ,রমেশ বাবু তাঁহাদের সকলের প্রতিধ্বনি: তাঁহার মত জানিতে পারিলে অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদেরই মত জানা হইবে। এই জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থলে রমেশ বাবুর মতেরই উল্লেখ করি-তেছি। তিনি বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়া-ছিল। মগধের প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল হইতে বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত ৩৫ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্যে-কের ২০ বৎসর রাজত্ব ধরিলে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উক্ত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পুনশ্চ, মুদ্রাপরিদর্শনে স্থির হইয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজা কনিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অভিমন্যু উক্ত শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক, অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণীকার বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত ৫২ জন রাজা ১২৬৬ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী স্থির হইতেছে। কিন্তু তিনি ইহার পর বলিতেছেন যে, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর প্রকৃত

সময় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের যে সময়, তাহাও ঐ এক গ্রীকবিজয় অবলম্বন করিয়া স্থির করা হইয়াছে। কনিষ্কের সময় মুদ্রাপরিদর্শনে আবিষ্কৃত, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ আনুমানিক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যুর সময় ১২৬৬ বৎসর হইলে, কনিষ্ক বা তৎপুত্র অভিমন্যু' সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হয় না। রাজতরঙ্গিণীকার সুস্পষ্টরূপে কুরুক্ষেত্রের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার একাংশের প্রমাণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে অপরাংশের প্রমাণই বা অকারণে পরিত্যাগ করিব কেন? আমরা স্বমতস্থাপনের সময় রাজতরঙ্গিণীর মত স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিব। রমেশ বাবুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, সময়নির্দ্ধারণের মূল সূত্র—Keynote সেই গ্রীকবিজয়; এক্ষণে সেই গ্রীকবিজয়ের রহস্যোদ্ভেদ হইলে, বোধ হয়, আর কোনও গোল থাকে না। আমরা পরে সে বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব। রমেশ বাবুর মতের সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের মতস্থাপনের সময়ে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইবে।

এক্ষণে আমরা আর একজন মহারথীর নিকট অগ্রসর হইতেছি। তিনি কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিধ্বনি নহেন, তাঁহার নিজের মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। এই কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ন্যায় গ্রীকবিজয় প্রভৃতি ব্যতীত নিজেরও কয়েকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যদিও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতের প্রচার আমাদের পক্ষে অতিসাহসের কর্ম্ম, তথাপি আমাদের চিত্তে যেরূপ ধারণা হয়, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। তিনি আমাদের বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত, এবং দেশীয়গণ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কলির প্রথমে হইয়াছিল বলেন, এবং সেই সময়ে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই দুই মতের খণ্ডনের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে, কলির প্রথমে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ঠিক নহে। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে গোনর্দ্দ কাশ্মীরের রাজা হন। গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তাহা হইলে ২৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ

পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এক্ষণে কল্যব্দ ৫০৯৯। বঙ্কিম বাবু রাজতরঙ্গিণীর এই খৃঃপূঃ ২৪০০ বৎসরের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মতপার্থক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কলির প্রথমেই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা যদিও এ কথা স্বীকার করি না বটে, তথাপি রাজতরঙ্গিণীকারের মতই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি, এবং ইহার সহিত বিষ্ণুপুরাণের যে বিশেষ পার্থক্য নাই, ইহাও আমাদের ধারণা। যাহা হউক, আপাততঃ বঙ্কিম বাবু কি বলিতেছেন, দেখা যাউক। তিনি প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন,—

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥ ৩৩॥
> তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ৩৪॥
>
> ৪র্থ অংশ, ২৪ অ।

পরে ইহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন,—"সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্ব দিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" সুতরাং পরিক্ষিতের সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর হইলে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। 'তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ-শতাত্মকঃ' এই শ্লোকার্দ্ধের বঙ্কিম বাবুর কৃত 'তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল' এই অর্থ সমীচীন নহে। আমরা তাহা পরে দেখাইব। সুতরাং উক্তশ্লোকানুসারে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় স্থির হয় না। এ সমস্ত বিষয় পরে আলোচিত হইতেছে। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ৩৪ শ্লোক অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে হয়, এই গণনা ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিলে না। ৩৩ শ্লোক সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল বা Great Bear অথবা Ursa Major কতকগুলি স্থির তারা; মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা; স্থির তারার গতি নাই, তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে, ইংরাজীতে তাহাকে Precession of the Equinoxes বলে। হিন্দুমতে এই গতি ৫৪ বিকলা।

এক এক নক্ষত্রে ১৩৬ অংশ। এ হিসাবে কোনও স্থির তারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে, শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া সপ্তর্ষি রাশিচক্রের বাহিরে,মঘা রাশিচক্রে ; ইংলণ্ড যেমন ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। বঙ্কিম বাবুর এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

(১) সপ্তর্ষিমণ্ডল যে Great Bear বা Ursa Major, তাহার সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন; তাঁহারা Pliades বা কৃত্তিকা-নক্ষত্রকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিতে চাহেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রীরও এই মত। কৃত্তিকাকে সাধারণতঃ 'সাতভেয়ে' তারা বলে; সম্ভবতঃ সেই কারণে সপ্তর্ষির সহিত ইহার একতাস্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু কৃত্তিকায় সাধারণতঃ ছয়টি নক্ষত্রের অধিক দেখা যায় না। আমরা কিন্তু Great Bear-কেই সপ্তর্ষি বিবেচনা করি। তবে Great Bearএর বিরুদ্ধে কেহ কেহ কৃত্তিকা খাড়া করেন বলিয়া আমরা তাহারও উল্লেখ করিলাম। অবশ্য, সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, সে সম্বন্ধে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আমরা আপাততঃ দিতে সক্ষম নহি বটে, কিন্তু একেবারে বিষয়টি কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না। কারণ, কোনও নিরপেক্ষ গণিত-বিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিচার করেন নাই। একমাত্র বেণ্টলী সাহেব এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আলোচনা পূর্ব্বাপর এত এক-দেশদর্শী যে,সে বিচারে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি মত দিতে পারেন না। একমাত্র বেণ্টলী সাহেবের মত লইয়া সপ্তর্ষির গতি কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক নহে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, গর্গ, পরাশর, আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ এই সপ্তর্ষির গতির বিষয় নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই একটা যে কিছু ইহার মধ্যে আছে, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। উক্ত গতি সম্বন্ধে গণনার বিষয় এক্ষণে আমাদের নিকট অজ্ঞাত, এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হয়। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থির তারা, মঘা নক্ষত্রও কতক-গুলি স্থির তারা; সুতরাং যখন স্থির তারার গতি নাই, তখন সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্র কেমন করিয়া পরিভ্রমণ করিবে? অতএব যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি যে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। বঙ্কিম বাবু এতগুলি কথা স্পষ্ট করিয়া

না বলিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবুর ঐরূপ আপত্তি যথার্থ হইলে তাঁহার আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, সপ্তর্ষির অবস্থানই বা কোথায়, এবং মঘায়ই বা অবস্থান কোথায়, এবং সেই দুই অবস্থান চিরকাল একই থাকিবে, কখনও তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। বঙ্কিম বাবু না বলিলেও আমরা বলিয়া দিতেছি যে, যে হিসাবে দেশীয় গ্রন্থকারগণ সপ্তর্ষির মঘা নক্ষত্রে অবস্থানের কথা বলেন, উভয়ে স্থির তারা হইলে সে হিসাবে সপ্তর্ষির অবস্থান আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঘা বা সিংহ রাশির সমসূত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিতি করিতেছে। যখন সিংহ রাশির প্রকাশ, তখনই সপ্তর্ষির প্রকাশ, তাহার অস্তে সপ্তর্ষিরও অস্ত। অতএব যখন উভয়ে স্থির তারা হইলে চিরকাল সপ্তর্ষি মঘায় আছে, এরূপ বুঝা যাইতেছে। যে সকল হিন্দু জ্যোতিষী দৃগ্‌গণিতের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা কি এই সামান্য বিষয়টি লক্ষ্য করেন নাই যে, মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি চিরকালই আছেন? তবে বুঝিতে হইবে যে, সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্য কোনওরূপ গণনা ছিল, যাহা এক্ষণে আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। রাশিচক্রের নক্ষত্র বলিয়া হিন্দুজ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারেই স্থির তারা বলিয়া বুঝেন, এমন নহে। সচল রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগকে তাঁহারা এক একটি নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যায়, তাহারাও সেই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে স্থির তারা বলিয়া যে তাঁহারা স্বীকার করেন, এরূপ বলা যায় না। তবে সে হিসাবে গণনা করিতে হইলে বিষুবের গতির সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু তদ্দারা ১০০ বৎসর সপ্তর্ষির গতি নির্ণয় করা যে কঠিন হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর অভিমত আমরা অস্বীকার করি না। তবে রাশিচক্রের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কিরূপভাবে সপ্তর্ষির সহিত রাশিচক্রস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের সম্বন্ধ হয়, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। ফলতঃ, সপ্তর্ষির গতির সম্বন্ধে আমরাও স্পষ্ট করিয়া যখন কিছুই বলিতে পারি না, তখন সে বিষয় লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির গতি লইয়া যেরূপ ভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের গ্রন্থকারগণ

কেবল সপ্তর্ষির দ্বারাই বর্ষ গণনা করিতেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা অন্যান্য অনেক উপায়ে বর্ষাদির গণনা করিতেন, সূক্ষ্মভাবে গণনা করিবার তাঁহাদের অন্যান্য অনেক উপায় ছিল। সপ্তর্ষির গণনা মোটামুটি গণনামাত্র। সুতরাং তাঁহারা যে কেবল সপ্তর্ষির গণনা দ্বারা শত বৎসর স্থির করিতেন, এরূপ নহে। বরঞ্চ অন্যান্য উপায়ে শত বৎসর স্থির করিয়া, তদ্দ্বারা সপ্তর্ষির এক নক্ষত্র হইতে অন্য এক নক্ষত্রে গমন, এই একটি নাম প্রদান করিতেন, এরূপও বলা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে,—

> যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
> এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৩২॥

অর্থাৎ, পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর।

তাহার পর লিখিতেছেন,—

> তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম। ৩৪।

অর্থাৎ পরিক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

ইহার পর লিখিতেছেন,—

> প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
> তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ৩৯॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। এই কয়টি শ্লোকের দ্বারা কি বুঝায়? প্রথমতঃ, পুরাণকার যে পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর বলিলেন, ইহা কি সপ্তর্ষির গতি অনুসারে গণনা করিয়া, না অন্য কোনও উপায়ে তাহা স্থির করিয়াছেন? অবশ্য ইহা অন্য কোনও উপায়েই স্থির করিয়াছেন। কারণ, সপ্তর্ষির গতির দ্বারা ১০১৫ এরূপ সূক্ষ্ম গণনা এখানে হইতে পারে না। কারণ, পরিক্ষিতের সময় মঘার কত অংশে সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং নন্দের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ার কত অংশে তাঁহাদের অবস্থান ছিল, ইহা না জানিলে, ১০১৫ পর্য্যন্ত গণনা করা যায় না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। আর যে সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রমাত্র, তাহারা কোন নক্ষত্রের কত অংশে আছে, দৃক্‌গণিতের দ্বারা তাহা স্থির করিয়া পরে বর্ষগণনা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ, বিষ্ণুপুরাণের বচন দ্বারা সপ্তর্ষির গতিগণনায় ১০১৫ বৎসর স্থির হয় না। ১০০০, ১১০০ ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু ১০১৫, ১০২০, এরূপ সূক্ষ্ম গণনা হয় না; কাজেই

সপ্তর্ষির গতি একটি মোটামুটি গণনা, এবং কেবল উহা দ্বারাই শত বৎসর নির্ণীত হইত না। সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরের একটি নামান্তরমাত্র। যদি শত বৎসরের ঐরূপ একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা কাল্পনিক হউক, বা প্রকৃত হউক, তাহাতে প্রকৃত সময়গণনার যে বিশেষ গোলযোগ হয়, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ ঐ সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত করিতেন না, ইহা ঠিক। অতএব বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির উপর আক্রমণ করিলেও প্রকৃত গণনার কিছুই ক্ষতি হয় না।

(২) তৎপরে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে হওয়ায় মঘানক্ষত্রে থাকা অসম্ভব; যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কিরূপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল এক এক নক্ষত্রে থাকে, পুরাণকার নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলে বঙ্কিম বাবুর কথার উত্তর হইবে। পুরাণকার লিখিতেছেন,—

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥

স্বামী ইহার এইরূপ টীকা লিখিতেছেন,—"তত্র যৌ পূর্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ পুলহক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে তয়োস্তৎপূর্ব্বযোশ্চ মধ্যে সমং দক্ষিণোত্তর-রেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বন্যতমনক্ষত্রং দৃশ্যতে, তে তত্রৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ, পুলহ ও ক্রতুর মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখায় সমদেশস্থিত যে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র থাকে, তাহা দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডল যুক্ত হয় বুঝায়। পুলহ ও ক্রতু সপ্তর্ষির সর্ব্ব পশ্চিমে। পুলহ ও ক্রতুর মধ্য হইতে দক্ষিণোত্তরে রেখা টানিয়া তাহাতে অবস্থিত করা বুঝাইলে, রাশিচক্রের ভিতর বাহির লইয়া যে বড় একটা আসিয়া যায়, এমন বোধ হয় না। এই 'সমসূত্র' কথাটি বঙ্কিম বাবু নিজের অনুবাদেও দিয়াছেন, অথচ, 'ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের অবস্থানের ন্যায় সপ্তর্ষির মঘাতে অবস্থান কথাটি' কেন লিখিলেন, বলিতে পারি না!

(৩) বিষ্ণুপুরাণের ৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে,—

> তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

বঙ্কিম বাবু ইহার অর্থ করিতেছেন, "সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময়ে মঘা

নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" এই অর্থ যে সমীচীন নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' পদটি কলির বিশেষণ; ইহার অর্থ এইরূপ যে, যে কলির পরিমাণ দ্বাদশশত বৎসর, সেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কলির দ্বাদশ শত বৎসর নহে। কলির মোট পরিমাণ যত, সেইটিই এইখানে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলির পরিমাণ দ্বাদশ শত দিব্য বৎসর, এখানে সেই পরিমাণেরই কথা বলা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিতেছেন,—"তদা সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ......সন্ধ্যারূপমতিক্রমৎ স্বেন রূপেণ প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ।" ঐ শ্লোকের ভাগবতের টীকায় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিঃ তদা সন্ধ্যামতিক্রম্য প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।" সুতরাং বঙ্কিম বাবুর কৃত অর্থ সমীচীন নহে। বঙ্কিম বাবু যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইলে, "কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" এইরূপ পাঠ না হইয়া "কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ" এইরূপ পাঠ হইত। এখানে 'দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' পদটি কলির বিশেষণ হওয়ায়,যে কলির পরিমাণ দ্বাদশ শত দিব্য বৎসর, সেই কলিই প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এরূপ অর্থ নহে। তাহা হইলে,বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে।

ইহার পর বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর, এবং নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। পরিক্ষিতের সময় ইহারা মঘাতে ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর আবার বিষ্ণুপুরাণকে আশ্রয় করিয়া ১০০ বৎসর নন্দবংশের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, ইহার পরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক। বঙ্কিম বাবুর মতে, আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন,এবং খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। ৩১৫ এর সহিত নন্দবংশের ১০০, এবং নন্দ ও পরিক্ষিতের ব্যবধান ১০১৫, এই ১১১৫ যোগ করিলে ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হয়, এবং ইহাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। এখানেও বঙ্কিম বাবুকেও সেই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় যে গ্রীকবিজয় ঘটিয়াছিল, সেই মূলসূত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে। উক্ত মূলসূত্র সম্বন্ধে

আমরা পরে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব বলিয়া একণে উক্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম। যাহা হউক, বঙ্কিম বাবু খৃঃ পূঃ ১৪৩০কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলেন।

উক্ত সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ" বলিয়া জ্যোতিষের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তাহাকে অখণ্ডনীয় প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আমরা তাঁহার উক্ত প্রমাণের মর্ম্ম প্রদান করিয়া আমাদের মন্তব্যপ্রদানেরও চেষ্টা করিতেছি।

বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, বৎসরের যে দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হয়, তাহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার ৯০° অন্তর অয়নপরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর বলিতেছেন যে, মহাভারতে লিখিত আছে যে, ভীষ্ম উত্তরায়ণে মরিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পর মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।

তাহা হইলে, তখন মাঘমাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ ও তৎপূর্ব্ব দিনকে মকর-সংক্রান্তি বলিলেও, এখন ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, যখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত, এবং তখনই ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইত। এখনও ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এক্ষণে আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং ১লা মাঘেও পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরায়ণ হয় না। এক্ষণে ৭ই বা ৮ই পৌষ (২১ এ ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ক্রান্তিপাতবিন্দুর গতির জন্য অয়নপরিবর্ত্তন বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। এই অয়ন-চলনই Precession of the Equinoxes; হিন্দুদিগের মতে তাহা বৎসরে ৫৪ বিকলা; ইউরোপীয়দিগের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। বঙ্কিম বাবু ষ্টকওয়েলের ৫০·২৩৮ বিকলা মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। বঙ্কিম বাবু বলেন, মহাভারতের সময়েও সৌরমাস প্রচলিত ছিল। সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, তাহা লিখিত নাই। মাঘের শেষে

হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি বলা হয় না। ২৮এ মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির মোটামুটি গতি ৪৮ অংশ। কিন্তু রবির শীঘ্র ও মন্দগতি প্রযুক্ত ৭ই পৌষ হইতে ২৯এ মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট ৪৪°.৪ পাওয়া যায়। এই ৪৪°.৪ লইলে খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়; ৪৮° পূরা লইলে ১৫৩০ হয়। ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া যায়, তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। দ্বাপরের শেষে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ হইলে, সৌরচৈত্রে উত্তরায়ণ হইত; চান্দ্রমাঘও কখনও সৌরচৈত্রে হইতে পারে না।

বঙ্কিম বাবুর মতের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(১) বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্লোকার্দ্ধ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধে সমস্ত বুঝা যায় না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিতেছেন,—"মাঘোঽয়মিতি সৌম্যশ্চান্দ্রঃ মাসস্য চতুর্ভাগীকরণে সার্দ্ধসপ্ততিথের্ভাগত্বাৎ অষ্টম্যর্দ্ধস্যানতীতত্বেন প্রথমভাগস্য বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগশেষো ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ তেনাদ্যাষ্টমীত্যর্থঃ॥" এই শুক্লাষ্টমীর কথা নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালেও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং গ্রন্থান্তর হইতেই, "হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী। প্রবৃত্তং ভারতযুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘমাসে সিতাষ্টমী। ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানের বচন-উদ্ধৃত করিয়া এক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা এ স্থলে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা হউক, তিনি 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' ইত্যাদি সম্পূর্ণ শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, চান্দ্র মাঘের শুক্লাষ্টমী অদ্য উপস্থিত। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে লিখিত আছে যে,—"যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।" উক্ত অনুবাদে ত্রিভাগশেষ কথাটি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, এবং চান্দ্রমাসেরও কথা নাই।

'পবিত্র' কথার বোধ হয় যে, 'পবিত্র' সৌম্যেরই অনুবাদ। তাহা হইলে মাঘ চান্দ্র না হইয়া সৌরও হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে ত্রিভাগশেষ যোগ করিলে সৌর মাঘের কোন্ দিন ভীষ্ম বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়। বঙ্কিমবাবু উক্ত শ্লোকের মাঘ মাসকে সৌর কি চান্দ্র বলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। এ কথাটি তাঁহার স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকের 'সৌম্য' ও 'ত্রিভাগশেষ' কথাটি লইয়া নানারূপ অর্থ হইতে পারে। 'সৌম্য' কথাটিতে চান্দ্র ও পবিত্র এই দুই অর্থ হইতে পারে। আর 'ত্রিভাগশেষ' লইয়া শ্লোকটির ৪।৫ প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, 'ত্রিভাগশেষ' কথাটির অর্থ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। ত্রিভাগশেষ, গত অর্থাৎ তিন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক ভাগ মাত্র আছে, এইরূপ এক অর্থ হয়; এবং ত্রিভাগ শেষ, অবশেষ, অর্থাৎ এক ভাগ গিয়াছে, ও তিন ভাগ আছে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাহার পর সৌম্যকে চান্দ্র বলিলে, এবং ত্রিভাগশেষকে মাসের বিশেষণ ধরিলে তদ্দ্বারা দুই প্রকার অর্থ হয়; আবার সৌম্যকে পবিত্র বলিলে, সৌর ও চান্দ্র দুই মাসের ত্রিভাগশেষ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার ত্রিভাগশেষকে পক্ষের বিশেষণ ধরিলে তাহা হইতেও দুই অর্থ হয়। সুতরাং উক্ত শ্লোকটি হইতে যখন এত প্রকার অর্থ হয়, তখন বঙ্কিমবাবু কোন্ প্রকার অর্থের পক্ষপাতী, তাহা প্রকাশ না করিলে, উক্ত শ্লোক লইয়া কোন একটি সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। যদিও বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সাধারণভাবে ধরিয়া লইলে একেবারেই যে অর্থ হয় না, এমন নহে, তথাপি সমস্ত শ্লোকটির অর্থ তিনি কি বুঝেন, এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধান্ত যে স্ফুটতর হয়, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না।

(২) বঙ্কিম বাবু বলেন যে, এখন আর ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না, কিন্তু ৭ই। ৮ই পৌষ হইয়া থাকে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু তিনি পরে বলিতেছেন যে, যে সময়ে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত, সে সময়ে আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। কিন্তু এ আশ্বিন সৌর কি চান্দ্র, তাহা বঙ্কিম বাবু বলেন নাই। কিন্তু আশ্বিন সৌরই হউক কি চান্দ্রই হউক, ১লা আশ্বিন বৎসরারম্ভ হইলে কোনরূপে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইতে পারে না। চান্দ্র আশ্বিন হইলে ১লা পৌষ উত্তরায়ণ হইবে, ১লা মাঘ হইবে না। ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষ, ১লা মাঘ নহে। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, বিষুবের অর্থাৎ বৎসরারম্ভের ৯০° অন্তর অয়ন পরিবর্তন হয়।

তাহা হইলে, ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষই হয়, ১লা মাঘ হয় না। তিনি আবার বলিতেছেন যে, ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরব্ধ হয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক নহে। যেমন সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে সেই সময় হইতে সৌর বৎসরের গণনা হয়, সেইরূপ চান্দ্রবৎসর গণনা করিতে হইলে চন্দ্রকেও অশ্বিনী নক্ষত্রে আসিতে হইবে। ফসলীও চান্দ্র বৎসর। চান্দ্রমাস পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্র যেখানে থাকে, তাহার সমসপ্তমে সূর্য্য না থাকিলে পূর্ণিমা হয় না। সুতরাং যে সময়ে চন্দ্র মেষ রাশির আদিতে অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকিবে, সে সময় সূর্য্যকে তাহার সপ্তমে তুলা রাশির আদিতে থাকিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ১লা কার্ত্তিক হইতেই বৎসর আরম্ভ হওয়া সম্ভব, কদাচ ১লা আশ্বিন নহে। প্রকৃত কথা এই যে, অশ্বিনী পৌর্ণমাসীর পর হইতে চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইবে। তাহা চান্দ্র মাসের ১লা কার্ত্তিক। কিন্তু সৌর মাসের দিনের পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং সৌর ১লা আশ্বিন ঠিক করিয়া বলাই যাইতে পারে না। আর চান্দ্র ১লা কার্ত্তিক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আশ্বিনকে সৌর মাস ধরিলে আরও গোলযোগ হয়। কারণ, সৌর বৎসরারম্ভের ২৭০° পরে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর আশ্বিন যদি সৌর হয়, তাহা হইলে, উত্তরায়ণ ১লা আষাঢ়ে হইবে; কদাচ ১লা মাঘ নহে। সুতরাং ১লা আশ্বিনে বৎসর ধরিলে, তাহা সৌরই হউক বা চান্দ্রই হউক, ঠিক কোনরূপে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না। ১লা আশ্বিনে, যৎকালে সৌরই হউক বা চান্দ্রই হউক বৎসরারম্ভ হইত, (যদি কোন কালে হইয়া থাকে) অয়ন-চলন দ্বারা গণনা করিলে তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, এবং ১লা আশ্বিনে কোন সময়ে বৎসরারম্ভ হইত, বঙ্কিম বাবু তাহা না বলায়, আমরা উক্ত বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না।

(৩) বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই। অবশ্য উক্ত শ্লোকের যেরূপ নানাবিধ অর্থ করা যায়, তাহাতে সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের প্রাণত্যাগ হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, "মাঘোঽয়ং" শ্লোকের সোজা কথাটি সহজ অর্থে ধরিয়া লইলে, তাহা সৌর ও চান্দ্র দুই মাসই হইতে পারে, এবং ত্রিভাগশেষের দুই অর্থের যে কোন অর্থ লইয়া সৌরমাঘের কোন

দিন, তাহাও স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং একেবারে লিখিত নাই, তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, সে সময়ে মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে শেষ দিন নহে; কারণ, তাহা হইলে "মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি মাঘ মাসের ২৮এ উত্তরায়ণ হইয়াছিল ধরিয়া, এখনকার প্রকৃত উত্তরায়ণদিন, অর্থাৎ ৭ই। ৮ই পৌষ হইতে ২৮ মাঘের ব্যবধান ৪৮ দিনে রবিস্ফুট ৪৪ অংশ ৪ কলা ধরিয়া অয়ন-চলন দ্বারা খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর স্থির করিয়াছেন; এবং উক্ত ৪৮ দিনে পূর্ণ ৪৮ অংশ ধরিয়াও ১৫৩০ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্ব্ব কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিতেছেন যে, সে সময়ে সৌরমাঘের কোন দিন উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই, অথচ তিনি ২৮এ মাঘ ধরিতেছেন। তাঁহার কথানুসারে ধরিতে গেলে, ১লা মাঘ হইতে ৩০ এ মাঘ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হওয়া সম্ভব, এরূপ বলাই উচিত; তাহা হইলে অয়ন-চলন দ্বারা ১লা মাঘ হইতে ৩০ মাঘ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টজন্মের ৩য়, ৪র্থ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিতে হয়। তাহাতে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক ব্যবধান হইবার সম্ভব। সেরূপ গণনা নিতান্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমবাবু ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিবার জন্য ২৮এ মাঘ ধরিয়াছেন। কিন্তু নিজেই বলিতেছেন যে, একেবারে শেষ দিন ধরা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে 'মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটা বলা হয় না। ২৯এ বা ৩০এ না ধরিয়া ২৮এ ধরিলে কি 'সমনুপ্রাপ্তঃ' প্রয়োগ রক্ষা হয়? 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, মাঘ মাসের কতক দিন গত হইয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া আসে নাই; বঙ্কিমবাবুও তাহাই বলেন। কিন্তু তাঁহার ২৮এর সহিত ২৯এ, ৩০এর বড় অধিক পার্থক্য নাই। যদিও বঙ্কিমবাবু উক্ত ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ ও ১৫৩ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একরূপ শেষ সময় বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বে আর হইতে পারে না, এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সময় কি, তাহা তাঁহার জ্যোতিষ-প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় নাই। হইতে পারে, তাহা খ্রীঃ ষষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল; তাহা বেণ্টলী স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত জ্যোতিষের প্রমাণ বলবৎ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। মাঘমাসের কতক দিন গত হইলে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, এ কথা ঠিক, এবং 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথায় একেবারে শেষ দিকেও নহে, ইহাও বুঝা যায়। তাহা

হইয়েছিল সময়ে কোন দিনে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে যান। তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিবার পর, সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া, ভীষ্মের সৎকারোপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া, হস্তিনাপুর হইতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাহার পরই ভীষ্ম বলিতেছেন, 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' ইহাতে কি বুঝা যায় না—মকরসংক্রান্তিতেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল? পূর্ব্বকালের লোকেরা দৃগ্‌গণিতের দ্বারা অয়নাদির নির্ণয় করিতেন, এ বিষয়ে মত-দ্বৈধ নাই। এখনকার ন্যায় পঞ্জিকার বাঁধাবাঁধি নিয়মে, অর্থাৎ দৃগ্‌গণিত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বচন দ্বারা সময়াদি নির্ণীত হইত না। সুতরাং সে সময়ে যে দিন সূর্য্যের অয়নপরিবর্ত্তন হইত, সেই দিনকেই তাঁহারা উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি বলিতেন। এই অয়ন হিন্দুগণনানুসারে প্রায় ৬৭ বৎসরে ১ দিন পিছাইয়া থাকিত। যে দিনে পিছাইত, সেই দিনই তাঁহাদের মতে মকর-সংক্রান্তি হইত। ৬৭ বৎসর পরে উক্ত ১ দিন তাঁহারা ক্রমে পিছাইয়া লইয়া গণনা করিয়াছেন। সে হিসাবে বৎসরারম্ভেরও পরিবর্ত্তন হইত। ৬৭ বৎসর পরে একদিনের পিছানতে বিশেষ কোনও গোলযোগ হইত না। এইরূপে ৬৭ বৎসর অন্তর ১ দিন করিয়া পিছাইয়া বৎসর গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সময় হইতে অয়নচলন আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কাজেই এখনকার উত্তরায়ণের সময় ধরিয়া পূর্ব্বকালের সময় নির্ণয় করিতে গেলে কোনও মতেই তাহা স্থির করা যায় না। পূর্ব্বকালে দৃগ্‌গণিত প্রচলিত ছিল, এবং অয়ন-চলনও যে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঠিক। মধ্যে নিরয়ন মতের প্রচলন হওয়ায়, এই সায়ন মত বরাবর চলিয়া আসিতে পারে নাই; তাহার পর আবার যখন ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ [illegible] তখন হইতে আবার সায়ন মতের প্রচলন আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে [illegible] সংক্রান্তিও বর্ত্তমান ৯। ১০ই পৌষ এই উভয়বিধ অয়ন প্রচলিত হইয়া আসি[illegible] নিরয়ন মত প্রচলিত হওয়ায়, মকরসংক্রান্তিই অয়নকাল বলিয়া প্র[illegible] আসিতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বকালে যে সেই মকরসংক্রান্তি ৬৭ বৎসরে ১ দিন করিয়া পিছাইত, নিরয়ন মত তাহা গণনার মধ্যে আনিত না। সায়ন মত পুনর্ব্বার প্রচলিত হওয়ায় পৌষমাসের শেষে মকর-সংক্রান্তি হইতে ক্রমে ৯। ১০ পর্য্যন্ত অয়নপরিবর্ত্তন কত বৎসরে হইয়াছে, এই সময় নির্ণয় করা যায় মাত্র। অর্থাৎ, এখন হইতে কত বৎসর পূর্ব্বে

আবার সায়নমত প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায় মাত্র। তাহার পূর্ব্বকার সময় কিছুতেই নির্দ্ধারিত হয় না। কারণ, মধ্যে নিরয়ণ মত প্রচলিত থাকায়, চিরদিনই মকরসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হইত। এক্ষণে যেমন পঞ্জিকার মকর-সংক্রান্তি বলিলে পৌষের শেষ বুঝিতে হয়, এবং তাহাকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বলে, অথচ প্রকৃত উত্তরায়ণ দেখিতে গেলে ৯। ১০ই পৌষের নিকট আসিতে হয়, তখন উত্তরায়ণ বলিলে পৌষের শেষই বুঝাইত। নিরয়ণের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা উত্তরায়ণকে ৬৭ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপে পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়ন-চলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিলে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। সৌর চৈত্রের উত্তরায়ণ কাল ৫ হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে হয়। উক্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আর নাই। বঙ্কিমবাবু আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁহার যুক্তি-খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে যে কঠিন,-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তিনি জ্যোতিষের যে প্রমাণ দ্বারা কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট তত সঙ্গত মনে না হওয়ায়, আমরা তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথামাত্র বলিলাম। আপাততঃ আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হইলাম। আগামী বারে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

ভানুমতী।

১

অমাবস্যার ঘোরা কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী [illegible] মালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহারকারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। [illegible] পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃত মহাশ্মশান বুঝি আর কখ[illegible]

সমস্ত বঙ্গদেশ ; সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান ! আনন্দ-আলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা ! তুই উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্ ! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না ;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র !

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিনশ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবের মত "বাবা !" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধনে যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা !" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি ! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন ! সেই মুখে, সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ, কি শোক ! অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার আবার মনে হইল;—এ বালিকা কে? এ কি মানবী ? বালিকা আবার "বাবা" বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন—"কি মা !" বালিকা বলিল—"বাবা ! আমি চলিলাম। আমি ২। ১ দিন পরে আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্যে একখানি নৌকা লইয়া আসিব। তুমি চম্বল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

অ। সে কি মা ! তুই কোথায় যাইবি ?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন ?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"হায় ! মা ! অমিয় কি আর বাঁচিবে ?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না [illegible] মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে ?

ভা। উঠে। লক্ষীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা! সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, আমি এ সমুদ্র সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যুৎবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদে রমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া পথ চলে, ভানুমতী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, দু'হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে। এ শক্তি ত মানবীর নহে! এ কি তবে সত্য সত্যই সেই "কমলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই ক্রোশব্যাপী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্নে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশেখরসান্নুস্থিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত ৺শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাবাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। গৌরদাস দেহত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে কথাটাতে কি এক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল। সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সে বেদে বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসিভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও ৺পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে [illegible] বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মতরূপ-গুণ [illegible]

[illegible]ই ঘড়া ঘড়া [illegible] দিবেন। অতএব উত্তরে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজি করিতে করিতে 'সোণাদিয়া' হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু সহ অবলীলা-ক্রমে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটি বিশাল পার্ব্বত্য পাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চ চূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অর্দ্ধ-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা
অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ণ-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বর।

উত্তরে ধবল সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গিত যেন চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি ঘঁয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গিয়া আদিনাথ পবিত্র শেখর।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর, সিন্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ণ-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে! স্থান, কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা—সম্মুখস্থ মহাযোগী—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় পুরী গোস্বামী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল। সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে পৃথিবীতে সে আর আসিবে না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে। তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মেরও বিঘ্ন হইবে।

ভা। আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা বাবা! কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতন ধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই অংশাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি।" এই আদিনাথ, আর ওই সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ, দর্শন কর। এত তীর্থ জগতের কোথায়ও একস্থানে নাই। ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞানহীন মোহন্তদিগের সংস্রবে ভারতের পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে! ইহারা মোহন্ত নহে, মোহান্ধ। পূর্ব্বে মোহন্তগণ তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত করিতেন। এ চন্দ্রনাথের পূজ্যপাদ মোহন্ত গোমতীবন ও রত্নবন স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী আস্তানে কৌপীনমাত্রপরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশ অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথা ইচ্ছা দর্শনী প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে কি শোচনীয় পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে! এখন তীর্থধাম রেলওয়ে পরিণত হইয়াছে। এই মোহান্তেরা এবারে "টিকিট" কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক দর্শনীর স্থানে এত কাল "কর" আদায় করিতেছিলেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় এখন তাহাদের আত্মসেবায় নিঃশেষ হইতেছে। দেবতা, অতিথি ও সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলী পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল, আগান্ধার চট্টগ্রাম এরূপ প্রগাঢ় ভারত যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্মরাজ্যের পর আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয়

দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূল নীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে কে ধর্ম্মরক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন; যতদিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, ততদিনে তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন; হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে। মহাঝড়েও অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন, একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে শস্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার করেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই উষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম, কোনও একজন অবস্থাপন্ন শিষ্য অম্লানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না; কারণ, কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামি! তুমি কি এই ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ তাহাকে সেই কার্য্য

হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে ? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বুঝি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এই অধোগতি দেখিয়া বুঝি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বুঝি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল।

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গলদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা ! ইংরাজ রাজা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। চোর তস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা দেববিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে ? তাহাদেরও অন্য চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে ?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে,—"রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্লাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে ? এ দরিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি ! অন্য দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থ-বল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্ব্বস্বান্ত হইবে ? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না করিয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোনও উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর তাঁহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের আবির্ভাব হইয়াছে; এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্যে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই; না করিতে পারে এমন পাপ নাই; না জানে, এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচাশয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। পুণ্যবতী......সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে।

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা। তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,— "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

১০

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে রাজকর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্স্‌বাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান ১০ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া

প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রু সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর প্রভাতে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পর্ণগৃহমাত্র নাই; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহা মহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলীস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্য-দ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্র-সর্ব্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তির ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্মেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সৎকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি-শবে দ্বীপাবলি ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে, এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চিরস্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বশ্রান্ত দুর্ব্বল

প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপখনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্‌সন সাহেব পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ণ। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে কুসুমকফুলরাশি। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ণ-রবি-করে তরঙ্গিত তরল স্বর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এত দিনে আমি বৃটিশ রাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গমগ্ন হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কলিয়ার সাহেব একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি, এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেব-প্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ম্মাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কতবার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চিরপ্রসন্নতা। ঐ দেখ পাদুকাশূন্যপদে কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা

গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমান কাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া ১০ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত; তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও তাঁহার মুখে রুক্ষভাব শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের কাছে প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষের দানভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইঁহার পর আমাদের প্রিয়ভাষা কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথনাথের সঙ্গে অভিবাদনবিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

...ব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺রাম-... অভ্যুত্থান না হইলে এতদিন অর্দ্ধেক ...ান কি মুসলমান ... এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন। (ক্রমশঃ।)

জাপানের পত্র।

অন্তর্যামীর ইচ্ছারূপ পবনে অনন্তের স্রোতে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি। কোথায় যাইব, তাহার স্থির নাই—স্থির করিবার শক্তিও নাই। বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—নিয়তির স্রোতের প্রতিকূলে যাইব, আমি দীনবুদ্ধি, হীনশক্তি মানব, আমার এমন সাধ্য কি? সে স্রোত আমাকে যেখানে লইবে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আমাকে সেইখানে যাইতেই হইবে। আজ এখানে আছি; কাল কোথায় যাইব, কে জানে? আজ আপনাকে ইয়োকোহামার কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ইয়োকোহামা কানাগোয়া বিভাগের অন্তর্গত; দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি মাইল, প্রস্থে প্রায় তিন মাইল। ইয়োকোহামা কতকটা উপদ্বীপের মত; তিন দিকেই বিস্তৃত সমুদ্র। সহরের মধ্যেও পাঁচ ছয়টি খাল আছে। বাণিজ্যের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত; মালপত্রের গতায়াত প্রায় সমস্তই নৌকাতে হয়। সহরের মধ্যে বসতির অংশের নিকটে একটা বাজার আছে। বাজারটি ক্ষুদ্র; এবং বিশেষ পরিষ্কারও নহে। শাকসবজী, ফল মূল, মৎস্য মাংস প্রভৃতি দ্রব্য দোকানে বিক্রীত হয়। বিদেশীয়দিগের থাকিবার জন্য সমুদ্রের নিকটেই উপনিবেশ আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটি উচ্চ সমুদ্রপ্রাচীর। পূর্ব্বাংশে প্রায় বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণ এবং পশ্চিমাংশে জাপানীরা বাস করিয়া থাকে। পশ্চিমাংশকে Japanese Bluff বা নন্‌গিয়ামা (Nungiama) বলে। সমুদ্রতীরে একটি বিস্তৃত রাস্তা আছে। "জেটির" নিকট হইতে "গ্র্যাণ্ড হোটেল" পর্য্যন্ত রাস্তাটি কতকটা কলিকাতার "রেড-রোডের" মত—তবে ইহা প্রস্তরমণ্ডিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যাসমাগমে বিদেশীয়গণ সমীরসেবনার্থ এ পথে আসিয়া থাকেন। এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রতীরে দুইটি হোটেল অবস্থিত—"গ্র্যাণ্ড হোটেল" ও "ক্লাব হোটেল"। ইয়োকোহামায় এই দুইটি হোটেলই বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রথমোক্তটি—দ্বিতীয়টির অপে-

কাও উত্তম। [illegible]বর্ত্তী এই রাস্তার পরই সহরের [illegible]
বিদেশীয়দিগের প্রায় সমস্ত আফিস, ডাকঘর, প্রভৃতি এই রাস্তায় অবস্থিত।

বসতির অংশের নিকটেই একটি উদ্যান আছে। উদ্যানটির চতুর্দ্দিক কেবল চেরীবৃক্ষে পূর্ণ; মধ্যস্থলে একটু ঘেরা জায়গা ও পার্শ্বে একটি কাঠের ঘর। বিদেশীয়গণ এইখানে "টেনিস" "ক্রিকেট" "ফুটবল," প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকেন। ইহার চারি দিক বেড়া দিয়া ঘেরা। যখন চেরীফুল ফুটে, তখন ইয়োকোহামার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই প্রভাত হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানীরা বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয়। অতি দরিদ্রের গৃহেও টবে দুই চারিটি ফুলের গাছ, কিম্বা লতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে কোনও পুষ্পেরই সৌরভ নাই।

কলিকাতায় কেল্লার নিকটে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মত, এখানেও একটি ঘোড়-দৌড়ের ময়দান আছে। ইহার মধ্যস্থল আবাদী জমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সেখানে নানাপ্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানেও ঘোড়দৌড়ের সময় বাজী রাখা হইয়া থাকে। ইহা সভ্য পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত জুয়াখেলা মাত্র। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল য়ুরোপীয় নীতিবাগীশ জুয়াখেলার বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার নিঃসঙ্কোচে এই জুয়াখেলায় যোগদান করেন। ঘোড়দৌড়ের এই জুয়াখেলা সভ্যজগতের ব্যাধিবিশেষ হইয়া পড়িতেছে।

জাপানে জাপানী হাঁসপাতাল, জর্ম্মণ হাঁসপাতাল, ইংলিশ হাঁসপাতাল প্রভৃতি আছে। সহরের যে অংশ জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত, সে অংশে অনেকগুলি রঙ্গালয় আছে।

জাপানে আর একটি নূতন প্রথার কথা বলি। এখানে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা কি দুইটা পর্য্যন্ত পায়খানা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। সংগৃহীত পুরীষরাশি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া সারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সহরের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকবেষ্টিত একটি স্থান আছে; ইহার নাম "য়াগানী চোক্"। পূর্ব্বপত্রে যে সকল অভাগিনীদিগের কথা বলিয়াছি, তাহারা এইখানে বাস করিয়া থাকে।* সহরের পশ্চিমে রেলওয়ে ষ্টেশন।

ইয়োকোহামার প্রায় প্রত্যেক পথেই চারি পাঁচটি করিয়া সাধারণ স্না[নাগার] অবস্থিত। বোধ করি জগতে আর কুত্রাপি স্নানাগারের এরূপ বাহুল্য না[ই]।

* "সাহিত্য"—১৩০৪, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

হইয়া। প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল স্নানাগার উন্মুক্ত থাকে। অধিকাংশ জাপানী রাত্রি আটটার পর হইতে বারটার মধ্যে স্নান সম্পন্ন করে। প্রত্যেক স্নানাগারে পাশাপাশি দুইটি কাগজের প্রবেশদ্বার। অধিকাংশ গৃহে বামদ্বারে স্ত্রীলোক এবং দক্ষিণ দ্বারে পুরুষগণ গতায়াত করিয়া থাকে। প্রবেশ-পথে সম্মুখেই একটি উচ্চ বেদীর উপর স্নানাগারের কর্ত্তা অথবা কর্ত্রী বসিয়া থাকেন। স্নানের জন্য দুই সেণ্ট (প্রায় পাঁচ পয়সা) ও সাবানের জন্য এক-সেণ্ট এবং যদি কেহ গাত্রমর্দ্দনকারী অথবা গাত্রমর্দ্দনকারিণী চাহে, তজ্জন্য আর এক সেণ্ট দিতে হয়। সাধারণতঃ বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে কিছু অধিক আদায় করা হইয়া থাকে;—তবে দশ সেণ্টের অধিক আদায় হয় না। যাহাতে গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক প্রবেশ করিতে পায়, তজ্জন্য, কক্ষটির পশ্চাদ্ভাগ ব্যতীত, অপর তিন দিকের প্রাচীর, কাচের বা কাগজের। একটু চেষ্টা করিলেই রাস্তা হইতে স্নানার্থী বা স্নানার্থিনীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানাগারের হর্ম্ম্যতল কাষ্ঠবিনির্ম্মিত;—জাহাজের পাটাতনের মত মসৃণ ও রঞ্জিত। কক্ষমধ্যে সম্মুখেই দেরাজের মত একটা বস্ত্রাদি রাখিবার স্থান আছে। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিবস্ত্র হইয়া দেরাজের মধ্যে বসনাদি রক্ষা করে। হর্ম্ম্যতল দুই ভাগে বিভক্ত—সম্মুখের অংশে স্নানের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ত্যাগ ও স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিধান করা হয়। এই অংশ প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমাণ উচ্চ; প্রস্থে প্রায় পাঁচ হাত হইবে। এই উচ্চ স্থানের নিম্নেই স্নান হইয়া থাকে। আজকাল সহরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের স্নানের স্থানে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য হর্ম্ম্যতলের নিম্নাংশে একটি দুই তিন হাত উচ্চ কাগজের ব্যবধান প্রদান করা হইয়া থাকে। এই কাগজের দেওয়ালের মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য দুই তিনটি দ্বার থাকে। দ্বারগুলি উন্মুক্ত থাকে; ব্যবধান নামমাত্র। সকলেই ছোট ছোট টবে গরম জল লইয়া গাত্রমার্জ্জনে রত থাকে; সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদের সমালোচনাও চলিতে থাকে। পুরুষেরা ইচ্ছামত যে কোনও প্রকারে, এবং স্ত্রীলোকেরা একটি জানু নত ও অপরটি উত্থিত করিয়া বীরাসনে উপবেশন করে। সম্মুখে কাষ্ঠদণ্ডের উপর এক একখানি [illegible] রক্ষিত হয়। কেহ স্বহস্তে বুরুশ ও বালুই পাথীর বাসার মত [illegible] প্রকার পদার্থ লইয়া গাত্রমার্জ্জন করে; কেহ বা কৌপীনমাত্রধারী বলিষ্ঠ যুবকদিগের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন [illegible] মধ্যস্থিত দেওয়ালের

নিকট একখানি জলের কটাহ থাকে; ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য্য। এই সকল স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র গরম জলের বৃহৎ টব থাকে। গাত্রমার্জ্জনাদির পর সকলে উর্দ্ধগ্রীব হইয়া অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় প্রায় দশ মিনিট কাল এই গরম জলের টবে উপবেশন করিয়া থাকে; পরে গায়ের জল মুছিয়া উলঙ্গাবস্থায় কেশবিন্যাস সমাপ্ত করিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া যায়। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামের স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের স্নানের স্থানের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই, সকলেই একত্র এক টবে স্নান করে। মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। সহরে পরিশুদ্ধিতেও এই ব্যবস্থা। আমি পূর্ব্বে এই কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি নাই। একদিন এক সম্ভ্রান্ত জাপানী বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাই। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বলিলেন, "আজ জাপানের একটি রহস্য দেখাইব।" আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখাইবেন?" তিনি আমাকে লইয়া একটি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র স্নান করিতেছে। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই নানাকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "ইন্দনো কোলম্বো!" জাপানে ভারতবাসী বা সিংহলবাসীর কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলে রাজপথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও খেলা ভুলিয়া "ইন্দনো কোলম্বো, ইন্দনো কোলম্বো" বলিতে বলিতে পথিকের অনুগমন করে। আমার জাপানী বন্ধুটি আমাকে স্নানাগারের সমস্ত ব্যাপার দেখাইলেন। বিস্মিত হইয়া আমি রাত্রি ... টার সময় বাসায় ফিরিলাম।

আমি বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, আমার শয়নকক্ষে টেবিলের উপর একখানা পত্র রহিয়াছে। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আমাকে টোকিওতে লইয়া ...র জন্য ইহা ইনাওয়ের * নিমন্ত্রণপত্র। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ... ভাবিতে ছিলাম যে, এ দেশের ধর্ম্মের অবস্থা ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোনও ধর্ম্মসভায় যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তদবধি এখানকার ... তথ্য জানিবার জন্য আমি মন্দিরে মন্দিরে এবং সাধু ও সাধ্বী ধর্ম্মপ্র...দিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ... ধর্ম্ম ও যে জ্ঞান এককালে ঋষি, মুনি, সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকদিগের জীব-

* ইনাওয়ে সমস্ত জাপানের ... একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

[illegible] আলোচনার বিষয় ছিল, একণে তাহা স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থদিগের আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকগণ একণে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতার বৃথা অভিমানে ও জ্ঞানের অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান নাই, গর্ব্ব আছে। বিদ্যা নাই, বৃহৎ চক্র আছে। [illegible] আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ এবং জগতের আর সকলকে হেয় বলিয়া [illegible] করেন। একণে বরং গৃহস্থদিগকে ধর্ম্মালোচনা হেতু অনেকাংশে [illegible] ও সত্যপ্রিয় দেখা যায়। সাধুদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে গিয়া আমি হতাশ হইয়াছিলাম। ভগ্নমনোরথ হইয়া আমি যখন এ দেশে ধর্ম্মের বিষয় অবগত হওয়া একান্তই সুদূরপরাহত বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলাম, সেই সময়ে এই পত্র আমার মৃতপ্রায় আশা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। সত্যসন্ধানে প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে ভগবান স্বয়ং সত্যানুসন্ধিৎসুর পথ সুগম করিয়া দেন। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চা পান পূর্ব্বক আমি টোকিও যাত্রা করিলাম।

ডাক্তার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালগুলা আমার দুই চক্ষের বিষ, কিন্তু খোঁড়ার পা কি খালেই পড়িবে? যতই তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, ততই তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বাল্যকালে এই বাঙ্গালের অত্যাচারে লেখাপড়া ছাড়িতে হইয়াছে; যৌবনে সংসারপথে পদার্পণ পূর্ব্বক একটু মান সম্ভ্রমের যোগাড় করিয়া লইয়াছি, দেখি, সম্মুখেই আমার পথরোধ করিয়া একটা বাঙ্গাল দণ্ডায়মান! ক্রোধে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল, কিন্তু নিরুপায়; [illegible] তেজোবর্জ্জিত কলিকালে ব্রাহ্মণের মুখের অগ্নি নিষ্কল আস্ফালনে পরিণত হইয়াছে, নতুবা এক এক সময়ে আমার যে পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহাতে সত্যযুগের মত কথায় কথায় মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিবার ক্ষমতা থাকিলে, প্রতিমাসেই দুই চারিটা খাণ্ডবদাহন করিতে পারিতাম; যাহা হউক, আক্ষেপ ছাড়িয়া এখন প্রকৃত কথা বলি।

বাবার কিছু জমীদারী ছিল; লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিলাম; মনে করিলাম, বি. এ., এম. এ., পাশ না করি, লেখাপড়া ত শিখিয়াছি, কাহারও গোলামী করিবারও আবশ্যক নাই।' আমাদের কথা পাগলা বলিত, "কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং।" তাহাও হইয়া গিয়াছে, বাবা থাকিতেই সৌদামিনী-রূপ মাধবীলতায় এই নবীন সহকার পরিবেষ্টিত করিয়া গিয়াছেন! আমি এখন সংসারের কর্তা। স্থির করিলাম, সংসারে একটা কীর্ত্তি স্থাপন করিব।

গ্রামে একটা মাইনর ইস্কুল ছিল। অনেক কাল আগে বাবা তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। আমি দেখিলাম, অগ্রে সেই পৈতৃক গৌরবটি হস্তগত করা আবশ্যক; ইস্কুলফণ্ডে কিছু টাকা সাহায্য করা গেল। টাকাটা আমার নিজের পকেট হইতে ব্যয় করিতে হয় নাই, আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রজারা কিছু কিছু মাথট দিয়াছিল, তাহারই কতক টাকা বাঁচিয়া ছিল, সেই টাকা ব্যয় করিয়া সুলভে 'দেশহিতৈষী' নাম ক্রয় করিলাম।

শিক্ষাবিস্তারে আমার উৎসাহ দেখিয়া ইস্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী বাবু বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি আমাদের মহকুমার একজন খ্যাতনামা সেকেলে উকীল; আদালতে তাঁহার অখণ্ড পসার; একদিন অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া তিনি বলিলেন, "ভায়াহে! তোমরা ইয়ং জমিদার, তাতে এডুকেটেড; দেশের উন্নতি করা তোমাদেরই কাজ, ইস্কুলের ভারটা তুমিই লও, এ বৃদ্ধবয়সে পাঁচ কাজে আমি ব্যতিব্যস্ত থাকি, সময়ও নাই, উৎসাহও নাই, তুমি হইলে কাজ চলিবে ভাল।" আমি প্রথমে একটু আধটু আপত্তি করিয়া সেক্রেটারী হইতে স্বীকার করিলাম।

আমি সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইলে, ষ্টেটস্‌ম্যানে কে একটা করসপনডেন্স বাহির করিল যে, আমিই এখন আমাদের গোপীনাথপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট, নিঃস্বার্থপরতার অক্টরলোনী মনুমেণ্ট, এবং দয়ার আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র; এ অঞ্চলের মধ্যে আমিই একমাত্র শিক্ষিত জমীদার!—আমি তখন নূতন ষ্টেটস্‌ম্যানের গ্রাহক হইয়াছি, বড় লোকের দুই একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত জিনিস রাখা দরকার—তন্মধ্যে খবরের কাগজ একটা। আমি নিজে কখনও কাগজ খুলিতামও না, পাড়ার ছেলেরা খুলিয়া এক আধবার দেখিত, তাহার পর পরাণে বেনে মশলা বাঁধিবার জন্য দোকানে লইয়া যাইত।

ষ্টেটস্‌ম্যানে এই করেসপণ্ডেন্স বাহির হইলে, আমার ইস্কুলের সেক্রে

বাক্যের মুহাতে একটা নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার কাছে পাঠাইয়াছিল। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে ছাপার অক্ষরের নামের একটা মোহ আছে। আমি পেট্রিয়ট, ছাপার হরফে এ কথা মুদ্রিত দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল, মনে হইল, পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ সিংহ, ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী, পার্কার ও ওয়াশিংটন, ইহারা যে দলের, আমিও সেই দলের, কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করা গিয়াছে,এইমাত্র প্রভেদ; স্বদেশহিতৈষী হওয়া এতই সহজ! বুঝিলাম,আমাদের সেই সেকেণ্ড মাষ্টারই আমার এই জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়াছে। আমি অকৃতজ্ঞ নহি, আমার সেই জয়ঢাকটাকে আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিলাম।

কিন্তু স্বদেশহিতৈষীর অম্লান যশঃশশধরও অনেক সময় দুর্বৃত্তের নিন্দা-রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকে; ষ্টেটস্‌ম্যানের করসপন্‌ডেন্স্ বাহির হইবার অল্প দিন পরে "আর্য্যপ্রদীপ" নামক সাপ্তাহিক কাগজে আমার স্বদেশহিতৈষিতার, সমালোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হইল; তাহাতে লেখক লিখিয়াছে যে, প্রজার নিকট হইতে আমি যে 'মাথট' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা জোর করিয়া ভিক্ষা আদায়ের নামান্তরমাত্র, এবং এই অর্থের সদ্ব্যবহার গোবধ করিয়া তাহার চর্ম্মে ব্রাহ্মণকে জুতাদানের ব্যবস্থার সহিত তুলনীয়। আমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলাম। একবার মনে হইল, সম্পাদক-কুল-কলঙ্ক—যে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা ছাপাইতে পারে, তাহাকে ধরিয়া চাবকাইয়া আসি। ক্রোধের প্রথম উচ্ছ্বাস কিছু প্রশমিত হইলে আমার প্রিয়বন্ধু নব্য উকীল মহেশ বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তখন ওকালতির চার ফেলিয়া মক্কেল-মৎস্য ধরিবার জন্য নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আইন-পুস্তকরূপ 'হুইল' লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "এডিটারের কাছে উকীলের চিঠি দিয়া আগে লেখকের নাম চাহিয়া পাঠাও, তাহার পর ডিফামেসন স্যুট, এ ত জলের মত সোজা মকদ্দমা!"—কথাটা সঙ্গত বোধ করিলাম, তখনই উকীলের চিঠি লইয়া ডাকে রওনা করিলাম, কিন্তু সম্পাদক লেখকের নাম প্রকাশ করিল না, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না, অধিক 'পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি'—নামক কলমে শ্লেষের সহিত লিখিল, "গরু মারিয়া জুতাদানের রীতি, সভ্য এবং অসভ্য সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে, বাবুজী অনর্থক মনঃক্ষুণ্ণ পাইয়াছেন; যদি মন্তব্য উক্ত বোধ

হয়, কিঞ্চিৎ মধ্যমনারায়ণ ব্যবহার করিলে সুফল লাভ হইতে পারে।”—পাঠাইলাম উকীলের চিঠি, উত্তরে কবিরাজের ব্যবস্থা আসিল। আমি ক্রুদ্ধচিত্তে মহকুমার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী উকীল নীলাম্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, “ডিফামেশন সুট করা সহজ বটে, কিন্তু ফলাফলের কথা কিছুই বলা যায় না; তোমারও কিছু কিছু গলদ বাহির হইতে পারে; অতএব চাপিয়া যাওয়াই ভাল, জানই ত. ‘নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।’ সাধারণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেকেরই গালাগালি সহ্য করিতে হয়, বিলাতের গ্ল্যাডষ্টোন হইতে ভারতের সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি নাই।”—“নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!” ঠিক কথা,—আমি আর উচ্চবাচ্য করিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনঃস্থির করিলাম বটে, কিন্তু এই পত্রপ্রেরক লোকটা কে, গোপনে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অবশেষে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম,কাজটা আর কাহারও নয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেদের আশ্রিত, আমার চিরশত্রু, সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবুরই এই কীর্ত্তি।

বাঙ্গালের উপর হাড়ে চটিয়া গেলাম। গগন বাবুর বাড়ী কোথায় খবর রাখি না; চট্টগ্রাম কি শ্রীহট্ট, বরিশাল কি বাখরগঞ্জ, এই রকম কোন একটা জেলায় হইবে। লোকটা কিছু ব্রাহ্মতন্ত্রের; বাছবিচার কিছু করে না, যে গোঁ ধরে,তাহা কিছুতে ছাড়ে না; পরশ্রীকাতরের অগ্রগণ্য। এমন লোককেও মানুষে কাজের ভার দেয়? কিন্তু সে ঘোষেদের বড়বাবু প্রাণকৃষ্ণের বন্ধু, বন্ধুকে সম্মানিত করিবার জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবু তাহাকে তাঁহার সংস্থাপিত মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী করিয়া দিয়াছেন। আমিও স্কুলের সেক্রেটারী, আর এই নামহীন, অর্থহীন, পরান্নভোজী, সামান্য ডাক্তারও স্কুলের সেক্রেটারী! আমার বন্ধু জয়লাল বলিত,হস্তীও চতুষ্পদ, ভেকও চতুষ্পদ; স্থির করিলাম, একবার তাহাকে আমার ক্ষমতাটা দেখাইব, হাতে না পারি, ভাতে মারিব।

আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার সেই সেকেণ্ড মাষ্টারকে দিয়া “ব্যবহার-দর্পণ” নামক মাসিকপত্রিকায় গোটাকত প্রবন্ধ লিখাইলাম। সম্পাদক প্রথমে সে প্রবন্ধ ছাপিতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমি দশ কাপী

কাগজের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইতেই সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল; সেই সকল প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীশিক্ষাটা আমাদের দেশের উপযোগী নয়, ইহাতে রমণীর সতীধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এই শোচনীয় শিক্ষায় রমণীর সুকোমল বৃত্তি বিনষ্ট হইতে পারে, ইহাতে বিধবাবিবাহের সংখ্যা বাড়িবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের আস্থা থাকিবে না, এবং জীবনসংগ্রামে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যে ফল হইবে, তাহাতে পুরুষেরই বিপদ অধিক, নলিননয়না ললনাকুলকে অবহেলা করিয়া পুরুষকে কেহই চাকরীতে নিযুক্ত করিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্ত্রীকর্ম্মচারিগণের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমার যে বিশেষ বিরাগ ছিল, তা নয়; তবে ব্রাহ্ম ডাক্তারটাকে জব্দ করিবার জন্য আমাকে এই প্রকার কূট নীতির পক্ষ সমর্থন করিতে হইল, এবং এই কারণেই, উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে আমি যে মাসিক চাঁদা দিতাম, তাহা রহিত করিলাম। আমার দলস্থ যে সকল লোক গার্লস্ স্কুল কমিটীর মেম্বর ছিলেন, তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণী হইতে উঠাইয়া আনিলাম। কিন্তু হায়! এত চেষ্টাতেও স্কুল উঠিল না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেরা ডাক্তারের পরম সহায়, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুল চালাইতে লাগিল। ডাক্তার অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং কাহারও কোনও ক্ষতি হইল না; কেবল আমার স্বদেশহিতৈষী অন্তরাত্মা নিষ্ফল আক্রোশে অধিক করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

শেষে আমি অধিক পরিমাণে রাজক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হইলাম। বুঝিলাম, ইহাতেই শুধু প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ করা যাইতে পারে। গগন ডাক্তার তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। আমাদের মহকুমার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রসুল উদ্দীনকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে এই প্রকার সখের চাকরী লাভ হইতে পারে শুনিয়া, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আরম্ভ করিলাম, এবং তাঁহাকে মাছ, মুরগী, খাসি, ঘৃত ও বালাম চাউল প্রভৃতি আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্যদ্রব্য উপহার পাঠাইতে লাগিলাম। মুসলমান শাস্ত্রে আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং পীর ও পয়গম্বরদিগের লোভ-নামক রিপুটার প্রাবল্য সম্বন্ধে কোনও পরিচয় পাই নাই; কিন্তু মানবচরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, অতএব উপহারপ্রভাবে ডেপুটী রসুল উদ্দীন সাহেবকে হস্তগত করা আমার পক্ষে কঠিন হইল না।

দুই মাস পরে কলিকাতা গেজেটে সংবাদ বাহির হইল, ছোটলাট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর অনাহারী হাকিম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জমীদারের ছেলে হাকিম হইলাম; আমার পার্শ্বচর প্রাইভেট টিউটার হাসিয়া বলিল, "ইহারই নাম সোনার উপর মিনের কাজ"—যাহারা পূর্ব্বে এক হাত তুলিয়া সেলাম করিত, তাহারা এখন দুই হাতে সেলামের বৃষ্টি করিতে লাগিল।

নির্ব্বিঘ্নে সরকারী কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই যে একটা বাঙ্গাল পথভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অন্নবস্ত্রের চেষ্টায় কোথা হইতে আমাদের গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ডেপুটি সাহেব তাহাকে ও আমাকে এক বেঞ্চে কাজ করিতে দিলেন। আমরা দু'জনেই তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম, কিন্তু ডাক্তার সিনিয়ার, কাজেই রায়-প্রকাশের ভার তাহার হাতে! আমার বড় রাগ হইত, কিন্তু যুক্তিতে তাহাকে হারাইতে পারিতাম না; হারিয়া জেদ বাড়িয়া গেল, স্থির করিলাম, শীঘ্রই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

পর বৎসর শীতকালে কালেক্টর সাহেব সফরে বাহির হইলেন, এবং আমাদের মহকুমা-পরিদর্শনে আসিলেন; আমি এই সুযোগে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা দেখিলাম। ডেপুটী সাহেবের অনুগ্রহে কাজটা কঠিন হইল না। দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে খানা আনাইলাম, কেলনারের গ্রীনসিল হুইস্কি ও শ্যাম্পেন, ম্যানিলার সুগন্ধি চুরোট, সিজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানভবনে কালেক্টর সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডেপুটী সাহেব এবং একদল কুঠিয়াল সাহেবকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলাম। আমাদের ডেপুটী সাহেব কালেক্টরের কাছে আমাকে introduce করিয়া দিলে সাহেব আমার অমায়িক ব্যবহারে ও রাজভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সে বৎসর বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। বঙ্গে সর্ব্বত্র অজন্মা, গৃহে গৃহে লোক উপবাসী; কালেক্টরের অনুরোধে Central Famine Fundএর খাতায় আমি এক শত টাকা দান স্বাক্ষর করিলাম। আহারান্তে পরিপূর্ণ-উদর, লব্ধতৃপ্তি, সুধাপানপ্রফুল্লচিত্ত, অরুণাভনেত্র সাহেব সুগন্ধি চুরোটে ধুম উদ্গীরণ করিতে করিতে আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "বাবু! তোমাদের মত লয়াল এন্‌লাইটেণ্ড ইয়ং জমীন্দারস্ বাঙ্গালা দেশের অর্ণামেণ্ট, Now good bye, your public spirit should be rewarded."

মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, আমার সেকালের পিতা ও পিতামহগণ বৃথা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, অন্নসত্র খুলিয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের উদর পূর্ণ করিয়া রাশি রাশি টাকার অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সেকেলে লোকের মূর্খতার সীমা ছিল না।

আমি প্রফুল্ল অন্তরে গৃহে ফিরিলাম। রাত্রে নায়েব আসিয়া সংবাদ দিল, বাজারের মুদী তেল লবণের উঠনার দেনা বাবদ আমার নামে ছোট আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছে। আমি তখন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় বিমুগ্ধ হইয়া 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভের সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিলাম; তুচ্ছ চাল ডাল এবং মুন্সেফী আদালতের ক্ষুদ্র ডিক্রীর কথা গ্রাহ্যও করিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরবৎসর এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্রকাশিত হইল, সমস্ত জেলার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে কেবল আমিই সুন্দররূপে অতি দক্ষতার সহিত বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। প্রকাশ্য গেজেটে এ জন্য আমি সরকারের ধন্যবাদভাজন হইলাম। আনন্দে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একদিন সান্ধ্যভোজনে আমার দলস্থ বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, গেজেটের রিমার্ক পড়িয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলাম। শুনিয়া সকলে একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘোষেদের মূর্খতা লইয়া অনেক উপহাস চলিল।

কিন্তু নিন্দুকেরা আমার নিন্দাঘোষণা করিতে ত্রুটি করিত না। আমার সুনাম এবং রাজদ্বারে প্রতিপত্তি ঘোষেদের কিছুতে সহ্য হইত না; তাই আমাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহারাই চাউল ডাইলের উঠনাদারকে দিয়া আমার নামে মকদ্দমা করাইয়াছিল, এবং গোপনে তাহারা বলাবলি করিত, আমি পাওনাদারদিগের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করি না, আমার কথার কোন ঠিক নাই, আমি দেনা করিয়া সাহেবদের ভোজ দিই, অথচ আমার আত্মীয়েরা অনাহারে থাকে, দেশের সাহেব-মহলে আমার যতই সুনাম বিস্তৃত হউক, আমার স্বদেশিগণ আমাকে প্রতারক ভিন্ন আর কিছু মনে করে না, ইত্যাদি।

কথাগুলা আমার কানে না পঁহুছিত, এমন নয়; কিন্তু সে সকল হিংসুকের গ্লানি আমি গ্রাহ্যও করিতাম না। দেশের লোকের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন

হইবার আবশ্যক ?, ক্ষুদ্র মুদী অথবা, কাপড়ওয়ালার সামান্য দেনা পরিশোধ না করিলে কি এমন অন্যায় হয় ? "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"এ ত শাস্ত্রের কথা, বিশেষতঃ যাহারা প্রেষ্টিজের মর্ম্ম অবগত আছে, যাহাদের কাছে 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করিয়া না চলিলে প্রতিপত্তিহানির সম্ভাবনা, তাহাদের কাছেই সাবধান হইয়া চলিব ; নিজের মা ঘরের কোন্ কোণে অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে শীর্ণদেহে হাহাকার করিতেছে, তাহার সংবাদ না লইলে কি ক্ষতি !—ভারতমাতার জন্ম আমি কতখানি বাক্য এবং অর্থ ব্যয় করিতেছি, ছুটাছুটি ও কসরত করিয়া দেশের কানে তালা লাগাইতেছি, সংবাদপত্রে কি পরিমাণে জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতেছে, তাহাই আলোচনার বিষয় ; private character এর দিকে কটাক্ষ করিয়া দোষগুণের বিচার করা সভ্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। public career দেখিয়া যাহারা মানুষের গুণগ্রামের আলোচনা করিতে শেখে নাই, তাহারা সভ্যসমাজের নিম্নতম সোপানে অবস্থিত, ঘোষেদের সভ্য হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তাহাদের নিন্দায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না।

দুই এক মাসের মধ্যেই আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করিলাম। আমার, প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ বলিয়া অভিমান করিত। আমার এই পদবৃদ্ধিতে সে বিষম ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। "তাই মানসিক সন্তোষলাভের অভিলাষে বন্ধুমহলে প্রকাশ করিতে লাগিল,"তোষামোদ করিয়া সকলেই এমন পদ পসার করিতে পারে।"—এ কথার একটা জবাব দেওয়া আবশ্যক। প্রাণকৃষ্ণের মোসাহেব জহরলালকে একদিন পথে দেখিতে পাইয়া কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিলাম, "তোষামোদ করাও একটা ক্ষমতা, সকলে কি সকলের কাছে কল্কে পায় ? তোমার বাবু তোমাকে যেমন ভাল বাসেন, আর কাহাকেও তেমন ভাল বাসেন কি ?"—ভাবিয়াছিলাম,—সে তাহার প্রভুর কথার মত আমার কথারও প্রতিধ্বনি করিবে ; কিন্তু আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, জহরলাল বলিল, "সকল লোকেরই খানিক করিয়া দুর্ব্বলতা আছে, সেই রন্ধ্রপথে শয়তান তাহাদের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষমতাশালী লোককেও কিয়ৎপরিমাণে নিজের অধীন করিয়া লয়, ইহাতে শয়তানের কোন গৌরব নাই। তৈলমর্দ্দনের অনুরোধে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা ভাল রকম চলিলে অধিক লোকে আমাদের হিংসা করে না, বরং কৃপাপাত্র বলিয়াই মনে করে ; কিন্তু সে জন্ত যদি প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তৈলদাতাকে উচ্চাসন

দেওয়া হয়, তাহা সেই লোকে নিন্দা করে ; এ নিন্দা কতক পরিমাণে সঙ্গত। তোষামোদ করিয়া বড় হওয়া সহজ হইলে লোকে প্রকৃত গুণবান ও বিদ্বান হইবার চেষ্টা করিবে কেন ? আবার যে নির্ব্বোধ রাজা বিদূষকের প্রশংসাবাদে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মন্ত্রিত্ব বা বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে রাজার কখন মঙ্গল হয় না।"—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের এই বিদূষকটাকে চাণক্য পণ্ডিতের মত বক্তৃতা করিতে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কিন্তু এখনও বিপদ হইতে উদ্ধার নাই, গগন ডাক্তারকে যেমন দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না, তেমনি সে প্রত্যেক কাজে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। আমি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। একদিন দেখি, ডেপুটি সাহেব একটা গরুচুরীর মকদ্দমা বেঞ্চে ট্রান্সফার করিয়াছেন, এবং আমাকে ও গগন ডাক্তারকে একত্র সেই মামলার বিচার করিতে দিয়াছেন।

আমি এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিম, অনেক নূতন ডেপুটি ও এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা আমার ক্ষমতা অধিক ; নিয়ম অনুসারে এই মকদ্দমায় আমিই রায় লিখিব ; কারণ, ডাক্তার এখনও সেই 'থার্ডক্লাস পাওয়ারে'ই পড়িয়া আছে। কিন্তু এই গরুচুরীর মকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে ভয়ানক মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল ; অভিযুক্ত মুচি বেটা নিশ্চয়ই গরুচুরী করিয়াছিল, নতুবা ফরিয়াদী কেন অনর্থক এ প্রকার মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিবে ?—বিশেষতঃ, 'No conviction no promotion' কথাটা অনেকদিন হইতে আমার জানা ছিল। আমাদের অনরারী হাকিমদের বেতন নাই বটে, কিন্তু পদবৃদ্ধি, সম্মান, এ সকলের অভাব কি ? কয় জন প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গের স্বাধীন বিচারাসন (Independent Bench) শোভিত করিয়াছে ?—আমারও সেই অত্যুচ্চ লক্ষ্য ছিল। আর বেতন না থাকিলেই বা কি ? অনাহারী গোক্ষুরের বিষের কি তীব্রতা নাই ? আহার যে একবারেই নাই, এ কথাও আমি জোর করিয়া বলিব না। ইংরাজী প্রবচনে লিখিত আছে, "ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বত্রই পথ করিয়া লওয়া যায়", আমাদের ন্যায় "ইনটেলিজেণ্ট" লোকের ইহা অজ্ঞাত নহে, যে অনরারী হাকিমী করিয়া মোক্তার দলের ও আসামী ফরিয়াদী উভয় পক্ষের সেলামবৃষ্টি, সস্তা দরে গোপপল্লীর দধিদুগ্ধ, বিনা পয়সায় সাধারণ লোকের পুষ্করিণীর মাছ, ক্ষেতের তরি তরকারী, বাগানের মর্ত্তমান রম্ভা, গ্রাম্য চৌকী-

...র স্কন্ধে ভর করিয়া ইঙ্গিতমাত্রে যে গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত হয়, ইহার কোন মূল্য নাই ? তথাপি মূর্খেরা বলে, এ চাকরী "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান মাত্র।" ঢোঁড়া সাপের যে কিছুমাত্র বিষ নাই এ কথা গগন ডাক্তারের জ্ঞান ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞানীদের দোষই ঐ। সে গরুচুরীর মকদ্দমায় আমার সঙ্গে কিছুতে একমত হইল না,চোরের পরমাত্মীয় হইয়া বসিল, বলিল, "অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ নাই, এরূপ অবস্থায় ইহার দণ্ডবিধান করিলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অবমাননা করা হইবে।" অগত্যা মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে 'রেফার' হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন লোক, আমার সঙ্গে তখনও পড়তা জমে নাই, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে পুনর্ব্বিচারের ভার দিলেন, গরুচোর বেটা বেকসুর খালাস পাইল।

আমি একটু ব্যথিত হইলাম। আর কখন এমন অপ্রস্তুত হই নাই। কিন্তু এখানেই অব্যাহতি নাই। আসামী পক্ষের অসভ্য মোক্তারটা একদিন এক নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইয়া দশনপংক্তি বিকশিত করিয়া সহাস্যে এবং স...কারে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের কাছে যখন আমার সেই বিচারকাহিনীর বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, "হে মা বসুমতি, যদি তুমি দ্বিধা—" কিন্তু সে কথা যাক্। গগন ডাক্তারের স্পর্দ্ধায় আমি আরও বিচলিত হইয়া উঠিলাম ; ডাক্তার সেই মোক্তারকে আহ্বান করিয়া বলিল,"ছিঃ নন্দলাল বাবু, এ সমস্ত তুচ্ছ কথা লইয়া নিমন্ত্রণসভায় এক জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে বিদ্রূপ করা উচিত কি ? ভ্রম ত সকলেরই হয়। রমাকান্ত বাবু বালকমাত্র, তিনি যদি একটা ভুল করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ না করাই ভদ্রতা, বিচারকার্য্যে বড় বড় বিচারকগণেরও ভ্রম ঘটিয়া থাকে।" ব্রাহ্মের উদারতা দেখিয়া রাগে ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপমানিত হইয়া ক্রোধে, ক্ষোভে ও মনস্তাপে আমি নিমন্ত্রণসভা ত্যাগ করিলাম। সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, বিচারকদের সাধারণ লোকের সহিত মেশামিশি না করার প্রথা অতি প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে এক এক দিনের এক একটা ঘটনায় ডাক্তারের উপর আমার ক্রোধ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার চাকরীর উপর যমদণ্ডক্ষেপের ন্যায়

একটা [illegible]র এবং অব্যর্থ আঘাত করিবার জন্ত আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি পরিচালনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঙ্গালকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি যতবার তাহাকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ততবারই সে ধৈর্য্যের সহিত উদার সকরুণ ব্যবহারে, কখনও অটল নির্ভীকতায়, কখনও নিরুত্তর অবজ্ঞাভরে, আমার আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকবার সে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, আমি তাহার নিকট বুদ্ধিহীন বালক ভিন্ন আর কিছুই নহি! আমি আপনার ক্রোধে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

গগন ডাক্তার মিউনিসিপালিটীর ডাক্তার। অবশেষে যেবার আমি আমাদের গোপীনাথপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলাম, সেই বার তাহাকে হাতে পাইলাম; প্রত্যেক বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে আমার খুঁটিনাটি চলিতে লাগিল। আমি ভাবিতাম, সে চেয়ারম্যানের ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমার সমস্ত আদেশ বিনা প্রতিবাদে এবং নতশিরে সে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু গগন ডাক্তারের বিশ্বাস ছিল, তাহার কর্ত্তব্যে আমার হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই।

যাহা হউক, কিছু দিন পরে একটা সুযোগ ঘটিল। প্রমাণ পাইলাম, গগন ডাক্তার কোনও রোগীর নিকট মিউনিসিপালিটীর ঔষধালয় হইতে একটা ঔষধ বিক্রয় করিয়াছে। আমার সুযোগ্য বন্ধু হরিচরণ ডাক্তার এ বিষয়ের একজন প্রধান সাক্ষী; অন্যান্য সাক্ষীরও অভাব হইল না। গ্রামের ভদ্রলোকেরা মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার জন্ত আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি তখন মিউনিসিপালিটীর সভাপতির কঠিন কর্ত্তব্যসম্পাদনে কৃতসংকল্প, কাহারও সুপারিসে কর্ণপাত করিলাম না।

কিন্তু বাঙ্গালদের কি অপূর্ব্ব একতা! সবডিবিজনাল কোর্টে মকদ্দমা, আদালত লোকে লোকারণ্য। কোর্টের প্রধান উকীলগণ কেহ কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে এজলাসের সম্মুখে উপবিষ্ট। গগন ডাক্তার, নির্ভীকভাবে ডকে দণ্ডায়মান; কেন জানি না, তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার একটু লজ্জা বোধ হইতেছিল, তাই একটু তফাতে বসিয়া মকদ্দমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। মকদ্দমা আরম্ভ হইবে, এমন সময় হ্যাটকোটধারী এক বাঙ্গালী সাহেব প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী তকমা-শোভিত চাপরাশীর ঘাড়ে আইন-পুস্তকের গন্ধমাদন চাপাইয়া ধীরমন্থরগমনে এজলাসে প্রবেশ করিলেন; দর্শকগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমিও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি-

নাম, বাঙ্গাল ব্যারিষ্টার মিঃ বোস সাহেব। তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম্মবিন্দুর অপসারণপূর্ব্বক ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন, তাহার পর টেবিলের উপর হ্যাট রাখিয়া মৃদুহাস্যে হাকিমকে বলিলেন, "এই মকদ্দমায় আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্ত আমি কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করি।"

শুনিলাম, বোস সাহেব স্বদেশী ডাক্তারকে রক্ষা করিবার জন্ত 'বিনা ফিসে' কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক মফঃস্বল কোর্টে আসিয়াছেন। আসামী পক্ষ মকদ্দমা চালাইবার জন্ত এতখানি আয়োজন করিয়াছে, তাহা স্বপ্নাক্ষরেও অগ্রে জানিতে পারি নাই। আমাদের ডেপুটি হাকিম মৌলবি সাহেব বোধ করি আর কখনও ব্যারিষ্টারের হাতে পড়েন নাই, মিঃ বোসের প্রভাবে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রস্‌-একজামিনেশনে আমার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; দেখি, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া চাষাগুলা পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্ত হইতে হাসিতেছে। আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলাম। চারি ঘণ্টার পর আসামী বেকসুর খালাস পাইল। আমার প্রদত্ত মাছ ও মুরগী, ঘৃত ও খাসীতে উদর পূর্ণ করিয়া ডেপুটী সাহেব রায়ের ভিতর আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহাতে আসামীর পক্ষে আমার নামে 'ড্যামেজ সুট' আনিবার বিশেষ সুবিধাই হইল; আমার একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "Oh Treachery ! thy name is Musulman.

যাহা হউক, কেন বলিতে পারি না, গগন ডাক্তার আমার নামে মকদ্দমা আনিতে সাহস করিল না। কেহ কেহ তাহাকে মকদ্দমা করিতে পরামর্শও দিল, এবং আমাকে বিপন্ন করিবার জন্ত আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ তাহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিল; কিন্তু আমি মনিব, চাকরীর ভয়েই বুঝি বাঙ্গাল আমার নামে নালিশ করিল না। আমার স্বহৃৎপ্রিয় এয়ার গণেশ বাবু সকালে বিকালে সুর করিয়া গাহিতে লাগিল, "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়"—ইত্যাদি। বড় আমোদে দিন কাটিতে লাগিল; এই মকদ্দমা লইয়া গ্রামে দলাদলীর ধুম পড়িয়া গেল। গোপীনাথপুরের ঘাটে পথে হাটে বাজারে আমাদের দুই দল জমীদারের পৃষ্ঠপোষকগণ কুরুপাণ্ডবের মত দল বাঁধিয়া বাক্‌যুদ্ধে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে যে পরিমাণ বাক্যব্যয় হইল, তাহা লৌহশর হইলে তদ্দ্বারা পাঁচটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে পারিত।

দিকে মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিয়া মিউনিসিপালিটীর অনেক টাকা

অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজে আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত উড়োসংবাদ বাহির হইতে লাগিল। আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মাসেক খানেক ধরিয়া কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, আলোচনার অন্য বিষয় নাই, দলাদলির প্রবল বাত্যায় গ্রাম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, শেষে গোলমাল দেখিয়া আমি চেয়ারম্যানের পদে 'রিজা-ইন' দিলাম।

কিন্তু এ জন্য আমার কোন আক্ষেপ নাই। কারণ এই, ঘটনার অনতি-বিলম্বেই আমি জেলাবোর্ডের সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। এই নব-পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যে ট্রাভলিংটা যথারীতি ঘরে আসিবার কথা, তাহার তুলনায় এ ব্যয় খুব অতি-রিক্ত নয়; বিশেষতঃ, যে সকল ক্ষমতাপন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিয়া আমার এই পদলাভ, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক হইয়াছিল। আমার গ্রামসম্পর্কের বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বলিলেন, "ভায়া, এই কচি বয়সে খুব বাহাদুরী করে নিলে যা হোক।"—আমি হর্ষভরে বলিলাম, "তবু ত ঠাকুরদা, লোকে নিন্দে কত্তে ছাড়ে না, বলে লেখা পড়া জানে না।" দাদা এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই, ইঁদুর ধরতে পাল্লেই হোল, হোক না কেন কাঠের বিড়াল! এখন হাকিমীর সনদখানা একটু ঝাঁকালো, আর একটা রায়-বাহাদুর খেতাব পেলেই এবারকার খেলায় তোমার জিৎ। তোমার মাতা রত্নগর্ভা ছিলেন—সন্দেহ কি?"

হায় রে পৈতৃক বিষয়! বড় দুঃখ যে সাহেব মহলে পঁচিশ হাজার বলিয়া প্রচার থাকিলেও পাঁচ হাজার টাকার বেশী বার্ষিক আয় নয়, নতুবা দেখি-তাম, রায় বাহাদুর হওয়া কত কঠিন! আর ফাষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটি 'পাওয়ার', সে ত দুই মাসের যোগাড়েই লাভ করা যায়, কমিশনর সাহেবের সঙ্গে দেখা হইতে যা কিছু বাকি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্ষার অবসানে, ভাদ্রমাসের প্রথমে, আমাদের পুরাতন কালেক্টরের বদলী উপলক্ষে তাঁহাকে একটা ইভনিং পার্টিতে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বিদায়

দিবার জন্য আমি সদরে নিমন্ত্রিত হইলাম। এবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, আমার পুত্র কয়েক দিনের জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে; অবস্থার লক্ষণ কিছু খারাপ। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইলেও আজ আমাকে সদরে যাইতে হইবে। আমার হিতৈষী বন্ধুকে, আমার সংসারসুখের বিধাতাকে, তাঁহার বিদায় উপলক্ষে আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রদর্শনের সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

তিন দিন পরে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বাড়ী ফিরিলাম। যখন বাড়ীর কাছে আসিলাম, তখন রাত্রি তিনটা। সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, রাত্রিশেষে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়ের শব্দে, অরণ্যের সুবিশাল বৃক্ষপত্রের আকুল শন্‌শনে, এবং মেঘমণ্ডিতা সেই বর্ষানিশীথিনীর দিগন্তব্যাপী সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘনবিজলীচ্ছটায় ও মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে একটা খণ্ডপ্রলয়ের আশঙ্কা মনে পড়িতে লাগিল। পথে কেহ কোথাও নাই, শুধু একখানি রুদ্ধদ্বার শকটে আমি একাকী। বৃষ্টির শব্দের সহিত সম্মিলিত প্রভঞ্জনধ্বনি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিরাশ্রয় দৈত্যশিশুর আর্ত্তনাদের ন্যায় তীব্র, সকরুণ এবং দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মনে পড়িল, আমার গৃহে আমার স্ত্রী একাকিনী রহিয়াছে, এবং তাহার শয্যাপ্রান্তে আমার শিশু পুত্র রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে; কে জানে, শিশুর দেহে এখনও প্রাণ আছে কি না?—আর আমি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতালাভের আশায়, রায় বাহাদুর খেতাবলাভের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, শুধু পরের পদে অর্থ ও তোষামোদ-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। সংসারে আমার কিসের অভাব? আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার প্রজাপুঞ্জ, আমার আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী এবং গ্রামবাসী, সকলের হৃদয়ের উপরে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মহিমাজ্যোতিঃসমলঙ্কৃত সম্মানাসন সংস্থাপন করিবার জন্য আজীবন শুধু আত্মসম্মান বলিদান করিয়াছি, মনুষ্যত্বলাভের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আসিতেছি; সাধারণের নিন্দা ও অখ্যাতিকে গণ্য করি নাই। আজ এই তৃতীয় প্রহর রাত্রে, এই বৃষ্টিপ্লাবিতা ঝঞ্ঝালুণ্ঠিতা ধরণীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে আমার সুপ্ত হৃদয় এতকাল পরে লুপ্তপ্রায় কঠোর মনুষ্যত্বের তীব্র কশাঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। আমি বৃথা পদগৌরবের নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল আলোকবেষ্টনের মধ্যে

সুমিষ্ট রমণীপ্রেম, পুত্রস্নেহ এবং গৃহস্থের অনতিক্রমনীয় মধুর কর্তব্য স্ফুট-কুসুমের গন্ধময় সুকোমল দলের ন্যায় বিকশিত দেখিলাম।

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার পুত্রের অবস্থা শোচনীয়। জীবনের আশা অতি অল্প। গৃহকোণে একটি মৃদু বাতি জ্বলিতেছে, যার প্রান্তে আমাদের বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য বলরাম বসিয়া একটা ষ্টোভে জল গরম করিতেছে, এবং আমার প্রিয়তমার সুখদুঃখভাগিনী দাসী পদ্ম তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া ঢুলিতেছে; আমার স্ত্রী রোগক্লিষ্ট শিশুর মুখের দিকে পলকহীন নতনেত্রে চাহিয়া নিশ্চল ছবির ন্যায় বসিয়া ছিল। তাহার ম্লান মুখ ও নিত্যজাগরণপাণ্ডুর নিরাশা-কাতর চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় দুঃখে, অনুতাপে এবং বেদনায় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।—কিন্তু অদূরে টেবিলের ধারে বসিয়া বাতির আলোকে কে ঐ ভদ্রলোক এই গভীর রাত্রে একখানি বৃহৎ পুস্তকে সমাহিত-চিত্ত? আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্তের জন্য সংযত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, এ ভদ্রলোক আর কেহ নহে, আমাদের সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবু!

ডাক্তার আমার পদশব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় আপনার পুত্রের অবস্থা বড় মন্দ সংবাদ পাইয়া আমি চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি; সমস্ত রাত্রি সাবধানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, এখন অবস্থা অনেক ভাল। আপনার গৃহ-চিকিৎসক হরিচরণ বাবু আজ দুই দিন হইতে মফঃস্বলে আছেন। আপনার আগমনপ্রতীক্ষায় আর আমি বিলম্ব করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

আমি ডাক্তারের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ন[illegible]কে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; লজ্জায় আমার মস্তক মাটির [illegible] গেল। অবশেষে অতিসঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, [illegible] এতদিন আপনাকে চিনিতে পারি নাই, শতবার আপনাকে অপ্রতিভ করিবার [illegible] করিয়াছি, রাজদ্বারে আপনাকে বিড়ম্বিত করিবারও ত্রুটি [illegible] নাই, [illegible] এই মহৎ ব্যবহারে আপনি আমাকে সমুচিত দণ্ড দিয়াছেন; যে চিরদিন আপনার অশুভ কামনা করিয়াছে, তাহার পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপনি নিজের সুখ ও সুবিধার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি করেন নাই।" আমি এ[illegible] ডাক্তারের নিকটে আসিয়া উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুখানি [illegible]

কম্পমান হস্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম, আমার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় আমার পুত্র 'বাবা' 'বাবা'বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইলাম, আমার পুত্রের শুষ্ক বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; আমার অভিমানিনী সাধ্বী পত্নী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অঞ্চলে তাহার অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, এবং বাহিরে দুর্য্যোগ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

তাহার পর আমি, আমার স্ত্রী এবং ডাক্তার, তিন জনে আমাদের ক্ষীণ কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় দ্বারসমাগত যমদূতগুলার সহিত প্রবল যুদ্ধ করিলাম; প্রত্যূষে জ্বরত্যাগে শ্রান্তরোগী শান্ত ভাবে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

প্রভাতে ডাক্তারের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, আকাশের কোথাও আর মেঘ নাই, প্রকৃতি স্থির, প্রভাতবায়ু সিক্ত ধরণীর শ্যামাঙ্গে আপনার অদৃশ্য কোমল অঙ্গুল বুলাইয়া, বর্ষার ধারাপাতপরিতুষ্ট ললিত কিশলয় দুলাইয়া, বৃক্ষশাখা কম্পিত করিয়া, নদীতরঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া, চপলা বালিকার ন্যায় লঘুপদক্ষেপে দিক্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; এবং তরুণ অরুণ শারদলক্ষ্মীর সীমন্তমূলে সমুজ্জল সিন্দুরবিন্দুর ন্যায় পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত করিয়া আলোকতরঙ্গের সহিত ধরাতলে কুসুমকাননে, বিহঙ্গমকণ্ঠে, সুপ্তোত্থিত নরনারী প্রাণে নবরাগ, প্রমোদগীত, নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত করিতেছে। এই উষালোকপ্রদীপ্ত, শোভন সুন্দর সুরঞ্জিত শারদপ্রভাতে হৃদয়ের কৃত্রিমতা এবং অহঙ্কারের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া আমি নূতন [illegible] আমার উপেক্ষিত পারিবারিক কর্ত্তব্যের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইলাম; এতদিন যাহাদের শত্রুতা সাধন করিয়াছি, তাহাদিগকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলাম। গ্রামের বৃহৎ দলাদলি মিটিয়া গেল, এবং তাহার [illegible] যদিও আমি প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করিতে পারি নাই, তথাপি আমার শত্রুদলের সহিত নিবিড় আত্মীয়তাস্থাপনের পুণ্যালোকে আমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত উচ্চা- [illegible] কর্মতাপ্রিয়তা নিতান্ত অসার এবং তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে [illegible]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অম্বা।

ধীরে ধীরে বনভূমে বহিছে যমুনা।
অতি ধীরে সায়াহ্নের কিশোর সমীর
কিশোরী কুমারী যত তরঙ্গিণী সাথে
একান্তে খেলিছে নব প্রণয়ের খেলা।
সুধীরে পশ্চিমনভে তমালের শিরে
সন্ধ্যার সুবর্ণ আভা যেতেছে মিশায়ে,—
পূরবেতে ঘনাইছে আঁধার গোধূলি।
বিদায়ের গান গেয়ে বনের বিহগ
নীড়ে ফিরিতেছে সবে মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বিজন অরণ্য-ছায়ে নিশাচর পশু
গুপ্ত গুহা তেয়াগিয়া হ'তেছে বাহির;
উঠিছে কানন-প্রান্তে ফেরু-কোলাহল।
জোনাকী আলোক-পাখা মেলিয়া আলসে
আঁধার-বধূর কেশে বসিছে উড়িয়া।
আকাশে জ্বালিছে দীপ দেবের বালিকা।

হেন কালে একদিন যমুনা-পুলিনে
অভাগিনী অম্বা আসি বসিলা নীরবে।
আলুলিত কেশরাশি মেঘরাশি প্রায়
ক্ষীণ কটিতটে তার পড়েছে ঝুলিয়া।
বন্ধুর বুকের পরে দুকূলের সাথে
দুরন্ত আরণ্য-বায়ু করে ছেলেখেলা,—
অর্ধ আবরণ তাহে পড়িছে খসিয়া।
অম্বার নয়ন কিন্তু নাহি তার পানে।
কি গভীর শোকে তার কাঁপিছে হৃদয়,
থেকে থেকে উথলিছে গভীর নিশ্বাস,
আঁখি দুটি অশ্রুজলে আসিছে পুরিয়া।
নীরবে আলেখ্য-লেখা ছবির মতন
কতক্ষণ অম্বা হেন রহিল বসিয়া,
কতক্ষণ পরে পুন অঞ্চল গুটায়ে
ধীরে ধীরে একবার মুছিলা নয়ন;
দুঃখের কাহিনী তার আরম্ভিলা শেষে।

"লো যমুনে! বন্দে পদে অম্বা বিষাদিনী।
কাশীরাজ-সুতা আমি, ত্যজি' লোকালয়
আসিয়াছি তোর পাশে সান্ত্বনার আশে।
শুনেছি যমুনে! তুই বড় স্নেহময়ী।
বিরহ বিধুরা বালা রাধা বিনোদিনী
হেথা আসি অশ্রু-আঁখি বসিত বিজনে,
তোরে শুনাইত যত প্রাণের বিলাপ।
তুই তার আঁখিজল দিতিস্ মুছায়ে,
শুনাতিস্ কানে কানে আশ্বাসের বাণী।
তাই সে আশার ভরে এসেছি হেথায়,
জীবন-কাহিনী মাগো শুনাইব তোরে।
প্রাণের পাষাণ-রুদ্ধ বিষাদের ভার
বিন্দু বিন্দু করি তোর ফেলিব সলিলে।
গাদসমাপনে যবে লইবি ডাকিয়া
তরল স্নেহের কোলে ঘুমাইব সুখে।

"লো যমুনে! দেখ্ ভাবি, পড়ে যদি মনে
সুদূর সে অতীতের স্বপন-কাহিনী।
সেই সে তোমারি তীরে মধুর [illegible]
তিনটি ভগিনী মোরা কত [illegible] বার
আসিতাম করিবারে [illegible] খেলা।
তিনটি তটিনী সম তিন[illegible] ভগিনী
বন হ'তে বনান্তরে [illegible]
নাচিয়া তরল-রঙ্গে বেড়াতেম অমি!
স্মৃতির উজ্জ্বল পটে স্বর্ণরেখা সম
আজিও মা সেই কথা রয়েছে জাগি[illegible]
আজিও জাগিছে মনে, অমি' বনে [illegible]
রাশি রাশি তুলি ফুল বসিতাম তী[illegible]

ফেলিতাম একে একে সুনীল সলিলে।
তরঙ্গের সঙ্গে তারা যাইত ভাসিয়া,
গাইতাম গান মোরা দিয়া করতালি!
কভু বা নগন-তনু নামিয়া সলিলে
ধাইতাম পিছে পিছে ধরিবার আশে!

"এইরূপে গেল কাল, কাটিল বরষ,
কৈশোরের লীলা ক্রমে এল ফুরাইয়া।
যমুনে! সে সব খেলা, সে সব কাহিনী,
আজি এ দুর্দ্দিনে অন্ধা পারে কি ভুলিতে?
আজি হেন মনে হয় মুহূর্ত্তের খেলা
মুহূর্ত্তেই যদি, হায়, না যেত ফুরায়ে,—
এ যৌবন তেয়াগিয়া পুন এ অভাগী
যদ্যপি ফিরিত সেই শৈশবের দেশে।

"কৈশোর তেয়াগি যবে প্রথম যৌবনে
ধীরে ধীরে অভাগিনী করিল প্রবেশ,
কত যে অজ্ঞাত সুর, অজ্ঞাত সঙ্গীত
একেবারে এ পরাণে উঠিল বাজিয়া,
কাজ নাই সে সকলে করিয়া স্মরণ।
বাল্যের সারল্যময় তরুণ স্বপন
কি কুহক-আবরণে হ'ল আবরিত;
কি এক উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন আশা
ছায়ার মতন প্রাণে উঠিল ভাসিয়া।
কে যেন বসিয়া দূরে বিজন পুলিনে
মধুর বচনে মোরে ডাকিত সতত,—
কানেতে বাজিত তারি বাঁশরীর ধ্বনি।
মন যেন তারি তরে বেদনা-ব্যাকুল
অন্বেষিতে দিশি দিশি হ'ত ধাবমান;
তারি পদতলে গিয়ে চাহিত লুটাতে।
যমুনে! কেন রে সদা অন্ধা উদাসিনী
একাকিনী আসি তোর বসিত পুলিনে,
কভু বা চঞ্চল-আঁখি চপলা হরিণী
নিবিড় নিকুঞ্জ ছায়ে করিত ভ্রমণ,
তুই কি কখনও তাহা ভাবিতিস্ মনে?

"এইরূপে শূন্য প্রাণে পূরিয়া স্বপন
কেটে গেল [illegible]নের কতক দিবস।
গোপন না রহে আর প্রাণের উদাস,
সখীরা বুঝিল মোর হৃদয়ের দশা।
দুখে দুখী অশ্রুমুখী ভগিনী দু'জন
জানিতে চাহিত সদা প্রাণের বাসনা;—
কি বলিবে কালামুখী, বুঝিত না কিছু,
আপনারে হ'ত লাজ আপনার লাগি!
উদাস হৃদয়ে মোর ভুলাইতে ছলে
দিবানিশি কত তারা করিত প্রয়াস,
প্রত্যহ নূতন গান করিয়া রচনা
কলকণ্ঠে অভাগীর ঢালিত শ্রবণে,
প্রত্যহ খেলিত নব প্রমোদের খেলা।
যমুনে! সকলি হ'ত শুধু ছেলেখেলা,
বাহিরে থাকিত পড়ি বাহিরের গান,
হৃদয়ে জ্বলিত সেই ছায়ার জ্বলন।

"একদিন অবশেষে সন্ধ্যা সমাগমে
বসন্ত-বধূর দেহ পরশি সুধীরে
কাননে বহিছে যবে নব সমীরণ,
উদিছে পূর্ণিমা-শশী দূর তরুশিরে,
বন-বিহারেতে মোরা হইনু বাহির।
যমুনে লো! সে দিনের অপূর্ব্ব কাহিনী
মুহূর্ত্তেরও তরে অন্ধা পারেনি ভুলিতে,—
জন্মজন্মান্তরে বুঝি ভুলিবে না কভু।
একাকী দাঁড়ায়ে তোর তীরতরুতলে
কে জানে ভাবিতেছিনু কোথাকার কথা!
সহসা পশ্চাতে মোর বন-অন্তরালে
কার মৃদু পদধ্বনি করিনু শ্রবণ।
চকিতে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে চাহিয়া
একেবারে হ'য়ে গেল নয়নে নয়ন!
দেখিনু পুরুষবর,—হিমশৈল-শিরে
প্রভাতের দীপ্তকান্তি প্রভাকর সম!
কে জানে মা পোড়া লাজ গিয়েছিল কোথা;
কালামুখী আঁখি মোর ফিরিল না আর,
বিবশ বিহ্বল হেন রহিল চাহিয়া।

মনে নাই কত ক্ষণ ছিনু ওই ভাবে,
কতক্ষণ পরে পুন সম্বরি' আপনা
সমুখে সে ভাবে আর নারিনু থাকিতে ;
ধীরে ধীরে নত চক্ষে বনপথ দিয়া
ফিরিনু হৃদয় মন বিকায়ে চরণে।

"অরণ্য ত্যেয়াগি যবে প্রবেশিনু গৃহে
লজ্জা আসি কণ্ঠে মোর রুধিল দুয়ার।
তবু অতি সঙ্গোপনে করিয়া সন্ধান
হৃদয়-চোরের মোর পেনু পরিচয়।
পাঠাইনু প্রেম দূতী, লিখিনু লিখন,—
'এস তুমি মন্ত্ররাজ। আপনি বরিয়া
তোমারে করিনু আজি যৌবনের রাজা।'
এইরূপে অকস্মাৎ জীবন আকাশে
প্রেমের প্রভাত রবি পাইল প্রকাশ
উজলি' যৌবন-বন সোনার কিরণে।
এইরূপে সেই দিন মানস-সরসে
প্রথম প্রেমের পদ্ম উঠিল ফুটিয়া,—
স্বপ্ন মোর সত্যরূপে দেখা দিল আসি।
শুভ কি অশুভ সেই প্রথম চাহনি
এইরূপে বক্ষে মোর করিল আঘাত
হৃদয়ের দিশি দিশি উঘাটিল তাহে।

"সমুদ্রে। বুঝিতে তুই পারিবি সহজে
পরদিন সন্ধ্যাগমে পুন সে কাননে
কি আশা হৃদয়ে ল'য়ে ছুটিল অভাগী।
ভেবে দেখ কি আগ্রহে কিসের লালসে
প্রাণ তোর ধায় সদা দূর সিন্ধু পানে।

"মাথার উপরে মোর দু' চারিটি তারা
নিবিড় পল্লবরন্ধ্রে দেখেছিল দেখা।
সোহাগের অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের কিরণ
সবল সোহাগভরে ভূতলে আসিয়া
পড়েছিল পথপ্রান্তে অন্ধকার কোলে।
নীরব সে বনপথ, নীরব গোধূলি,
শুধু মোর হৃদয়জ স্পন্দনের ধ্বনি
কানেতে বাজিতেছিল গানের মতন ;
হেনকালে অকস্মাৎ কা'র বাহুপাশে
ধরা দিল তনু মোর ? নিশীথ-শয়নে
স্বপন-সাথীর মৃদু পরশ সমান
অধরে সে কা'র স্পর্শ হ'ল অনুভব ?
কে জানে সমুদ্রে। এই পোড়া আঁখি মোর
বিন্দু দুই অশ্রু কেন বরিল বারিতে ;—
কপোল-গোলাপে তা'রা আসিতে অমনি
চুম্বন অনলে কার গেল শুকাইয়া।

"তা'র পরে কত সন্ধ্যা মিলিনু দু'জন।
কভু ধীরে আধ কথা ফুটিত অধরে
কভু বা মিশিয়া যেত চুম্বনের মাঝে
অবশেষে অভাগীর অদৃষ্ট আকাশে
বিষাদের ঘন মেঘ উদিল আসিয়া,—
কাল বিদায়ের কাল হ'ল উপনীত।
সেই সে বিদায়-ক্ষণে, অধরে অধর,
চিরপ্রেম ডোরে মোরে করিয়া বন্ধন,
নিশান্তের স্বপ্নসম চলি গেলা বীর।
কে জানিত সেই হবে অন্তিম বিদায় ?
কে জানিত সে দিনের সেই শশী সনে
আমার সুখের শশী হ'ল অস্তমিত ?
প্রথম মিলনমোহে, প্রথম উল্লাসে,
ভেবেছিনু এইরূপে যাবে চিরদিন ;
ভেবেছিনু যে সুখের সমুদ্র মাঝার
সমস্ত জীবন যদি বাহিলে তরণী
তবু তার সীমা বুঝি পাব না খুঁজিয়া।
কে জানিত সবি, হায়, ছবে মরীচিকা ?
কে জানিত, দু'দিনের হাসির মাঝার
সারা জীবনের অশ্রু ছিল লুকাইয়া ?

"বিরহীর মরুময় মরমের মাঝে
দুরাশা বসিয়া নিজ অচল-আসনে,
কতকাল বরষিল বিষের নিশাস।
অবশেষে উপজিল দারুণ সংশয়,—
ভাবিলাম, বসন্তের বিলাসী মধুপ,
ক্ষণিকে মিটায়ে বুঝি ক্ষণিকের আশ

নবমুকুলিকা আশে গিয়েছে উড়িয়া।
হৃদয় হইল কালো অভিমান বিষে।
"ক্ষুদ্র এক আশা পরে উঠিল জাগিয়া।
মহাসমারোহে পিতা তিন কন্যা লাগি
সার্ব্বভৌম স্বয়ম্বর করিলা ঘোষণা।
আশার ছলনে ভুলি' ভাবিনু অভাগী
বিরহ-হিমানী-অন্তে বসন্ত আবার,
প্রেমের বকুল ফুল ফুটাইল বুঝি!
যমুনে লো! শুনিবি কি কেমনে সে আশা
দারুণ হতাশরূপে দহিল আমায়?
হায় মা! জানিনে হেথা কেন আসি মোরা,
জানিনে জীবন ল'য়ে কা'র হেন খেলা
জানিনে মৃত্যুর পরে কি হ'বে কোথায়,—
জানি শুধু, ভবিষ্যের অন্ধকার গৃহে
মানুষের আঁখি কভু পশিত যদ্যপি
নিমেষে জনম লভি' নিমেষের জীব
নিমেষে ভবের খেলা ফেলিত ঘুচায়ে।
"কি বর্ণিব স্বয়ম্বর? শিহরে হৃদয়
এখনও স্মরিলে সেই স্বয়ম্বর-কথা!
ইন্দ্রপুরী সম সভা, হায় মা! সহসা
ভীষণ প্রলয় দৃশ্যে হ'ল পরিণত!—
চমকি' আতঙ্কে আমি হারানু চেতনা।
যখন ভাঙিল মোহ, মেলিয়া নয়ন
দেখিনু রয়েছি এক রথের উপরে,
দুই পাশে বসি মোর ভগিনী দু জন;
সম্মুখে হিমাদ্রিসম ধনুর্ব্বাণ হাতে
বীর সাজে যোদ্ধা এক আছে দাঁড়াইয়া!
অগণ্য রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রথে
পিপীলিকাশ্রেণীসম ঘেরিয়াছে তারে।
"জলদগম্ভীর বাণী শুনিনু শ্রবণে,—
'শুন কাশীরাজ, শুন নৃপতি-সমাজ!
ভাবিও না ভীষ্মদেব এতদিন পরে
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তা'র গিয়েছে ভুলিয়া।
বিচিত্র বিচিত্রবীর্য্য, প্রিয় ভ্রাতা মোর,
তা'রই লাগি ক্ষত্রধর্ম্ম রীতি অনুসরি
এ তিন রমণী আমি করিনু গ্রহণ।
লহ শাস্তি, লহ রণ, যথা অভিলাষ;—
একা ভীষ্ম সবে আজি জিনিবে সমরে।'
"ইঙ্গিতে তুমুল রণ উঠিল বাজিয়া।
দেখিলাম মদ্ররাজে সম্মুখে সবার;
অগণ্য নৃপতিবৃন্দ ধাইছে পশ্চাতে।
কে আঁটে ভীষ্মেরে রণে? ক্ষণেক যুঝিয়া
ভঙ্গ দিলা বীর সব, অম্বার হৃদয়ে
অন্তহীন অশ্রু-উৎস হ'ল উৎসারিত।
"তখন সম্বরি' লাজ শান্তনু-তনয়ে
জানানু বেদন, অনুপূর্ব্বা হেরি মোরে
বর্জন করিলা বীর। নব আশাভরে
ছুটিলাম হৃদয়ের নাথে। কিন্তু, হায়,
যে অশনি সম বাণী শুনিনু সে মুখে
যমুনে মা! কেমনে তা' শুনাইব তোরে?—
অসতী,—অসতী অম্বা,—অন্যের গৃহীতা,
শল্যের হৃদয়ে আর নাহি তার ঠাঁই।'
ধরিলাম পদযুগ, কহিনু কাঁদিয়া—
'হা নিষ্ঠুর! পুরুষের এই কি গো রীতি
মনে কি পড়ে না, সখা! সেই সন্ধ্যালোকে
মধুর বেদনা-ভরা বিদায়ের ক্ষণে
চুম্বনে চুম্বিয়া কি যে কহেছিলে কথা!
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন চাতুরী?
পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম-আচ্ছাদন?
অসতী, অসতী আমি! এ বক্ষ বিদারি'
মরমের মাঝে যদি পারিতে পশিতে,
গৃহদেবতার মত দেখিতে সেথায়
কার প্রেমমূর্ত্তিখানি রয়েছে জাগিয়া,—
দেখিতে কে মোরে, হায়, করেছে অসতী!
ভালবাসা কি গো সখা, শুধু ছেলেখেলা?
ক্ষণস্থায়ী পিপাসার ক্ষণিক তর্পণ?
দাবানল জ্বলে নাকি মর্ম্ম মাঝে তা'র?
বুক তা'র ফাটে নাকি চিরতৃষ্ণা-ভরে

নাহি ত্রাণ, ক্ষতি নাই ; শুধু বলে দাও,
সিন্ধু আশে যে তটিনী এসেছে ছুটিয়া,
কি হ'বে নির্দ্দয় যদি নাহি চায় তারে ?
বল, সখা, উজানে সে বহিবে কোথায় ?"—
যমুনে ! কিছুতে মন গলিল না তাঁর,
ডুবিয়া অতল জলে মরিল অভাগী।
"যমুনে মা ! মরি নাই ; মরিব না একা !
যতখানি ভালবাসা ছিল এ পরাণে
ততখানি হিংসানল উঠিল জ্বলিয়া।
যে জ্বালিল সে অনল চিতানল সম,
স্বহস্তে সাধিব আমি নিধন তাহার,—
ভীষ্ম-বধ, ভীষ্ম-বধ প্রতিশোধ মোর।
"প্রচণ্ড পরশুরাম, পরশুর ধার,—
তাঁরই পদতলে গিয়া পড়িল বাঘিনী ;
জানাইয়া মর্ম্মব্যথা, করি আরাধনা
গলাইল পরশুর পরশু-হৃদয়।
মরণ-সংগ্রামে ভীষ্মে করি আবাহন
দাঁড়া'ল পরশুরাম, দাঁড়া'ল বাঘিনী
স্বচক্ষে দেখিতে ভীম ভীষ্মের নিধন।
কিন্তু, হায়, চিরদুষ্ট অদৃষ্ট আমার !
কোথা হ'তে কা'রা আসি দাঁড়াইল মাঝে,
সান্ত্বনা করিল রামে, ভীষ্মে বুঝাইল ;
প্রণয়-মিলনে দোঁহে ভঙ্গ দিলা রণে।
হাহা বিধি ! সেই সব শির লক্ষ্য করি'
কেন না হানিলে তব দীপ্ত বজ্রানল ?
কেন না হানিলে বজ্র অভাগার এ শিরে ?
"যমুনে মা ! মরি নাই, মরি নাই তবু !
যমুনে মা ! মরিব না, মরিব না একা !
শোন্ তবে এ বাঘিনী কি করিল শেষে।
সুদূর উত্তরে আছে ভীষণ গহন,—
আলোক পশিতে যথা কম্পমান ত্রাসে,
হিংস্রক প্রাণী যথা করে শুধু রব,
মরণের রাজধানী বিরাজে যথায়।
সেইখানে আসি শেষে পশিল রাক্ষসী।
সেইখানে বসিয়া সে অন্ধকার মাঝে
কঠোরে সেধেছে অতি নিঠুর সাধনা,—
ভীষ্মের নিধন-বর ফলেছে তাহার।
তাই আজি অন্ধকার গুহা তেয়াগিয়া
আলোকের কূলে তোর হ'য়েছি বাহির,
অন্তিম আঁধারে পুন পশিতে হেথায়।
জানিনে কেমনে ভীষ্ম হইবে নিধন।
শুধু মাগো ভবিষ্যের অতি দূরদেশে
যেন ক্ষীণ দেখা যায় রণক্ষেত্র-রেখা ;—
পরিশ্রান্ত আঁখি সেথা পারে না পশিতে।
সেইখানে ধনুর্ব্বাণ ধরি দুই করে
কে যেন দাঁড়ায়ে ওই ছায়ার মতন ;—
ওকি ছায়া ? কিম্বা অম্বা নব কায়া ধরি ?
নীলকান্তসমুজ্জ্বল আরও একজন
যেন লজ্জানতশিরে দাঁড়াইয়া পিছে ;
তাহারি সম্মুখে ওই শরশয্যা'পরি
হেরি কেবা বীরবর নীরবে শয়ান,—
অসংখ্য সায়ক—বিদ্ধ সর্ব্ব অবয়বে !
"গো যমুনে ! সাঙ্গ হ'ল রোদনের গান।
এ জন্মের অনুরাগ, বিফল বাসনা,
জনমেরি সাথে আজি করিনু নির্ব্বাণ !
অন্তিম মিনতি তুমি রেখো মা আমার,—
চাহিয়া তোমার পানে দাঁড়ায়ে পুলিনে
জিজ্ঞাসিবে যবে কেহ অম্বা কোথা বলি,
অম্বার সংবাদ তুমি দিও না মা তারে।
শুধু ও প্রশান্ত বক্ষ মৃদু আন্দোলিয়া
মৃদুহাস্যে যেও চলি সাগর-সঙ্গমে !"

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কার্লাইল।

ভিন্ন ভিন্ন রুচির সমালোচকগণ কার্লাইলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কেহ কার্লাইলের দোষবিশেষের অতিরঞ্জনে ব্যস্ত; কেহ বা কার্লাইলকে সেক্‌স্‌পীয়র ও হোমরের সহিত তুলনা করিয়া প্রশংসাবাদের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে স্থাপন করিয়াছেন, আবার গুণবিশেষের অভাব-নিবন্ধন তাঁহাকে নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের মতে কেবল দোষানুসন্ধিৎসা ও শেষোক্ত প্রকারের স্তুতিবাদ, উভয়ই অসহ্য। কার্লাইলের ওজস্বিনী ভাষা, আদর্শোপলব্ধি, গভীর চিন্তাশীলতা, ও হাস্যোদ্দীপক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। কার্লাইলের আদর্শ (Ideal) অতি উচ্চশ্রেণীর। কেবল চিন্তোপলভ্য, অবাস্তব আদর্শ লইয়া থাকিলে, সেই আদর্শের তুলনায়, যাহা কিছু বাস্তব, তৎ সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কার্লাইলের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার মনে আদর্শের যত বিকাশ হইতে লাগিল, ততই পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয় সম্বন্ধেও, বর্ত্তমান প্রত্যেক পদার্থের উপরই তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কখন ঘৃণা, কখনও বা উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহা হইলেও, তাঁহার আদর্শের বিষয় মনে রাখিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ ও আন্তরিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা নিম্নে কোন সহযোগীর কার্লাইল সম্বন্ধীয় একটি সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন যে, সপ্তদশবর্ষ মাত্র কার্লাইলের মৃত্যু হইলেও এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই শুনা যায় না। সাহিত্যে কার্লাইলের স্থান, মানবজাতির শিক্ষয়িতৃগণের মধ্যে তাঁহার আসন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল তর্কবিতর্ক তাঁহার জীবদ্দশাতেই একরূপ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল। এক দিকে অতিরিক্ত নিন্দা, অপর দিকে অযথা স্তুতিবাদ উভয়ই কার্লাইলের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ফ্রুডের Reminiscences প্রকাশিত হইবার পর হইতেই কার্লাইলের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া আসিয়াছে। কার্লাইলের পরিণত বয়সের রচনা যে তাঁহার যৌবনের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, Reminiscences তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কার্লাইলের অবনতির হয় ত অবধি থাকিত না কারণ একবার ভাঁটার টান পড়িলে তাহা ফিরান সহজ নহে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে কার্লাইলের পত্নী ও জীবনবন্ধু জেন ওয়েলশের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অসাধারণ মহত্ত্বের কথা শুনিয়া জনসাধারণ কার্লাইলের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ফ্রুডের আলেখ্যে কার্লাইল যেরূপ অর্দ্ধ আলো

কার্লাইল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

অর্দ্ধ অহঙ্কারের মলিনতায় চিত্রিত হইয়াছেন, হয় ত বা তাহারই জন্য কার্লাইলের যোবনপুষ্পসম্পৃহা আজকাল এত ফলবতী। কিন্তু কার্লাইলের মৃত্যুর ১৫। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে ধর্ম্মবিদ্বেষী, বাকসর্ব্বস্ব, ইংলণ্ডের নীতির ভয়ানক শত্রু প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার প্রতি যে সকল তীব্র দোষারোপ করা হইত, তাহা নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও অনেকে ঘৃণামিশ্রিত সহানুভূতির সহিত, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কার্লাইলের ত্রুটীগুলি দেখাইতে ভুলেন না। এই সমস্ত অপবাদ যে কার্লাইল নিজেই আপন মস্তকে আনিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কল্পনার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি কিরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রৌঢ়দিগের অবশ্য মনে থাকিতে পারে। মৃত্যুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যদি কার্লাইল লেখনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রতিভাপ্রসূত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার যশোরাশি তাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিত। তাঁহার যৌবন-বসন্তের সদ্যোনিচিত সুষমাসম্পন্ন পুষ্পরাজি সাহিত্যোদ্যানে চিরপ্রফুল্লতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কার্লাইলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাও শ্লাঘ্য মনে করিতেন; জনসাধারণও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জন্য ঋণী ছিল। এই সময়ে যদি তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইতেন, তাহা হইলে এই সকল প্রশংসাবাদের বিরুদ্ধে, কুত্রশকরীবৎ সমালোচকগণ কার্লাইলকে তীব্র ঘৃণাত্মক ভাষায় তিরস্কার করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কার্লাইলের কোন সমালোচনা, এমন কি, তাঁহার রাজনৈতিক মতের সম্পূর্ণ সমালোচনাও ১০। ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে বিশদরূপে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। নগণ্য সমালোচকগণ যেরূপ ভাবে কার্লাইলের সমালোচনা করেন, তাহাতে বোধ হয়, যেন কার্লাইলের রচনা নিতান্তই ক্ষণস্থায়িনী, কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের অত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন ছিল কি? যাহা জন সাধারণের মনে স্থান পায় নাই, এবং যাহা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর মনে স্থান পাইবে এরূপ আশঙ্কাও নাই, তাহা লইয়া তাঁহারা আর বৃথা বকিয়া মরিয়াছেন কেন? বাস্তবিক কথা এই যে, ঐ সকল সমালোচকগণ কার্লাইলের রচনার যে ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেই বিশ্বাস করেন না।

লেখক কার্লাইলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মতের সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহার Gospel of labour কার্লাইলের হিসাবে, যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকশিক্ষামূলক নূতন কিছু সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তেমন কোন রচনাই রচনা-নামের যোগ্য নহে। কার্লাইলের Gospel of labour ইহার পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত।

কর্ম্মবাদ।

"ইহজগতে কর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কর্ম্ম করিবার জন্যই আমাদের জন্ম। প্রত্যেক দিন নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে" ইত্যাদি। কার্লাইল এত পুনঃ পুনঃ এই উপদেশের উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা অত্যন্ত শ্রান্তিজনক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কার্লাইল জানিতেন যে, কতকগুলি ধ্রুবসত্য এমন সাধারণ ভাবে বলা হইয়া থাকে যে, লোকে তাহার উপকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য লোকের মনে বিশেষভাবে এইগুলির সঞ্চার করিতে হইলে খুব জলন্ত ভাষায় পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়। কার্লাইল

যে উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক স্বীকার করিবেন যে, তাহা অতীব মহৎ। সমগ্র কর্ম্মক্ষম জনসমাজকে এক কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য কার্লাইলের যে ব্যগ্রতা ছিল, তাহা আন্তরিকতাপরিপূর্ণ। Latter day Pamphlet-এর অনিয়ন্ত্রিত ভাষা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ সত্যগুলির মূল্য কিছুতেই হ্রাস করিতে পারিবে না।

রাজনীতি সম্বন্ধে কার্লাইলের মত এক কথায় এই,—"প্রকৃত শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে সাধারণের শাসনভার ন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক।" কার্লাইল বলেন যে, "আমাদের ইচ্ছা যে শাসনকর্ত্তার ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী করিতে হইবে, এবং যাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিলে

শাসনকর্ত্তা।

আমাদের কল্যাণ সংসাধিত হইবে, পৃথিবীতে তিনি মহৎদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক। যিনি আমাদের নিয়ামক, যিনি নানাপ্রকার শিক্ষা-বিস্তার করিয়া আমাদিগের কল্যাণসাধন করেন, তিনি সমস্ত আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবের মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত; তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় 'রাজা,' 'নিয়ামক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী ভাষার নামটি অধিকতর অর্থদ্যোতক; King অর্থাৎ 'দক্ষলোক।'" কার্লাইলের Hero Worship বা "মহদর্চ্চনা" উল্লিখিত যুক্তি বা উপদেশের ভিত্তির উপর গঠিত। এ মতের পোষকতায় কার্লাইলের শিষ্যগণ অধিক দূর গুরুর অনুসরণ করিতে পারেন না, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি সমাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত কোন শক্তি ক্রিয়া না করিত, তবে সমাজ বন্ধনশূন্য নিয়মবিহীন জনসমষ্টিমাত্রে পরিণত হইত। এই শক্তিই এক বা তদধিক ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্লাইলের মতে, এই শক্তির নিয়ন্তৃদিগের প্রতি, ভক্তি না হউক, সম্মানপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

যে সময় Hero and Hero Worship প্রকাশিত হয়, তখন কার্লাইলের মনে তদীয় রাজনৈতিক মত পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং ইহাতে তখন অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল।

রাজনৈতিক মত।

কিন্তু Latter Day Pamphlets ও Frederick the Great প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই ভ্রম আরও বাড়িতে লাগিল, এবং তাঁহার মতও যেন নানা প্রকারে বিকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কার্লাইলের সমস্তই যে দোষাবহ ও পরিবর্জ্জনীয়, এমন হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন না। তাঁহার প্রচারিত মতে অনেক ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন দেশকালাবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মতের বৈষম্য ও ত্রুটী সকল স্পষ্টই বুঝা যায়, কেবল দোষানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যের এবং সেই সত্যের প্রকাশক কার্লাইলের, সম্মান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

কার্লাইল সাধারণতন্ত্র রাজ্যের নিতান্তই দোষ গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রকৃত মত এবং আজকালকার উদারনৈতিকদিগের উদ্দেশ্য একই প্রকার। তবে যদি

অভিজাততন্ত্র।

শেষোক্ত সম্প্রদায় বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের মতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, তাহা হইলেও কার্লাইলের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তাঁহারাও উপকার পাইতে পারেন। কার্লাইল বলেন যে "প্রকৃত বীরত্বই ইংলণ্ডের লর্ডশ্রেণীর সৃষ্টির

উপাদান। দ্বিতীয় প্রথম জেম্‌সের সময় হইতে এই গুণকীর্ত্তি-তিরোধান হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উক্ত রাজার শেষভাগ হইতেই, কোনও গুণ না থাকিলেও, অর্থভাগ্য ও কুটুম্বভাগ্য দেখিয়াই, 'লর্ড' উপাধি বিক্রীত হইত। তাহার ফলে, আমাদের "লর্ড" মহাশয়গণ বাজারের পিত্তলমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাহিরে যথেষ্ট চাকচিক্যশালী, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। অবশ্য, কার্লাইল বহুপূর্ব্বতন লর্ডদিগের গুণগরিমা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়াছেন, এবং আধুনিক সকল জিনিসের উপর বিরক্তি-বশতঃ বর্ত্তমান লর্ডদিগের কিছু অধিক নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কার্লাইলের উদ্দেশ্য দেখিতে গেলে, ইহাতে কেবল দোষ দেখিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কার্লাইল অভিজাততন্ত্র শাসন (Aristocracy) বলিতে সর্ব্বোৎকৃষ্টদিগের কর্ত্তৃক শাসন বুঝিতেন; যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান এবং পারদর্শী, তাঁহাদিগকে উন্নীত করিয়া দাও,—তাঁহারা আমাদিগকে শাসন করুন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমরা নিকৃষ্ট ও অনুপযুক্তদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছ। অনেকে বলেন, লর্ড বিকন্‌স্‌ফিল্‌ড্ কার্লাইলের মতানুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক ইহাঁদের মধ্যে অতি সামান্য সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয় না। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই লর্ড বিকন্‌স্‌ফিল্‌ড্‌কেই কার্লাইল তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছিলেন।

কার্লাইল যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, 'প্রকৃতিরঞ্জনাৎ রাজা'র আদর্শ দিয়াছেন, বাস্তবিক তেমন আদর্শ মিলিয়া উঠা দুর্ঘট। পরন্তু তাঁহার প্রকৃত আদর্শ রাজার পরিবর্ত্তে তদ্রূপ কোন কৃত্রিম আদর্শ সংস্থাপন করাও বিপজ্জনক। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ আদর্শ রক্ষা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

রাজার আদর্শ।

তাঁহার অভীষ্ট আদর্শ শাসনকর্ত্তা না পাওয়া গেলেও ঐরূপ আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে আমরা অনায়াসে 'প্রকৃত' হইতে 'কৃত্রিম' পৃথক করিতে পারি। অবশ্য, আদর্শ শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধে, কার্লাইল যেমন নিরাশ হইয়া গিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যও সেইরূপ; কিন্তু তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিলে, আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে। "Latter Day Pamphlets"এর এক স্থলে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কথা বলিতে বলিতে কার্লাইল বলিয়াছেন যে, "পার্লেমেণ্ট যতদিন কেবল বাক্যযন্ত্রমাত্র থাকিবে, ততদিন ইহার সহস্র উৎকর্ষ হইলেও, তাহাতে কোন জাতীয় উপকার সাধিত হইবে না। ইংলণ্ডের সমস্ত পরিশ্রম, শক্তি, মান, গৌরব, কার্য্যকুশলতা ব্যয় করিয়া ও কায়মনে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আরাধনা করিয়া বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে ১২ জন, ১০ জন, অভাবপক্ষে ৬ জন প্রকৃত শাসনক্ষম লোক কি দিলে না?" Latter Day Pamphlets কার্লাইলের মতের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করা বোধ করি ঠিক নহে। তিনি যে বাক্যযন্ত্র বলিয়া পার্লেমেণ্টের নিন্দা করিয়াছেন, অনেক সময় প্রকৃত কর্ম্মযন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইলে, তাহার উপায়স্বরূপ বাক্যযন্ত্রের সাহায্য আগে চাই। কিন্তু "আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে সমস্ত দিয়াও অন্ততঃ ৬ জন প্রকৃত শাসনকর্ত্তা আবশ্যক হইয়াছে", এ বিষয়ে কার্লাইলের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কার্লাইলের সমস্ত মতই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং তৎসমুদায়ের সমর্থন আমাদের

অভিপ্রেত নহে। তবে কার্লাইলের প্রতি এক সম্প্রদায়ের অসম্মানসূচক অভক্তি দেখিয়ে আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। কার্লাইলের প্রচারিত কতকগুলি

শেষ-কথা।

সত্য আমরা ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহার অনেক বিষয় চিরকাল নিত্য সত্য ভাবে পৃথিবী মনে রাখিবে। যদি ইংরেজেরা কার্লাইলের পাদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা করিত, এবং কার্লাইলের উপদেশানুমত স্বদেশহিতৈষী হইতে পারিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজ তাহারা আপনাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ও নেতৃগণের অসৎপ্রকৃতিজনিত অনেক অপমান ও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইত। তাঁহার উপদেশগুলি স্বতঃই কেমন সারগর্ভ! বর্ত্তমান সময়ের কেমন উপযোগী! উপসংহারে তাঁহার শেষ-সময়ের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"আমি শুনিয়াছি,ইংলণ্ডের গৌরব (Prestige) নাকি মহাদেশে এখন আর অক্ষুণ্ণ নাই; ইহাতে সম্পাদক মহাশয়েরা আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি ত আক্ষেপের বিষয় কিছুই দেখি না। গৌরব ব্যাপারটি ছায়াবাজির ন্যায়। বরিঞ্চ ইংলণ্ডের খুব ভাল সময়েও যে 'মহাদেশে তাহার এই গৌরব কোন দিন ছিল বা কখনও তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, তাহা ত আমি জানি না।"

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভোটান।

—*—

ভোটান আমাদিগের আবাসস্থান বঙ্গদেশ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই অনধিগম্য দেশাংশ আমাদিগের নিকট "চীন,ব্রহ্মদেশ,অসভ্য জাপান" হইতেও অধিক অপরিচিত। কারণ, সেখানে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে, সেখানে ভ্রমণকারীর জীবন নিরাপদ নহে, সেখানকার অসভ্যতার উৎপীড়ন বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ভোটান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

কলিকাতা হইতে ন্যূনাধিক ৩২০ মাইল ভ্রমণের পর আমরা এক অদ্ভুত রাজ্যে উপনীত হই। তথায় সুশৃঙ্খলে রাজ্যপালন ঘৃণিত, নরহত্যা, উৎপীড়ন ও রাজদ্রোহ নিত্য ঘটনা; দাসত্বপ্রথা অবাধে প্রচলিত। বঙ্গদেশের অতি সন্নিকটেই এই

দেশের নাম কি?

সকল বিদ্যমান। এই অদ্ভুত দেশ ও তত্রাকার উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসিগণের বিবরণ আমরা প্রায় কিছুই অবগত নহি। এমন কি, আমরা ইহার নাম যথাযথরূপে লিখিতে জানি না। লেখক বলেন, স্যর উইলিয়ম হণ্টারের প্রচলিত মতানুসারে ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "ভুটান" নাম ভ্রমাত্মক। বোত্ত শব্দ হইতে উক্ত নামের উৎপত্তি। "বোত্ত" শব্দে তিব্বতীয়েরা স্বদেশকে নির্দ্দেশ করে। ইহা লাডক ব্যতীত সর্ব্বত্র ভোট অথবা ভোও উচ্চারিত হয়। ইহার যথার্থ নাম ভোটান। এই নাম ভোটের অর্থাৎ তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশ বুঝাইবার জন্য প্রথমে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। ভুটিয়ারা স্বদেশকে ব্রুকযুল অথবা বর্ম্মযুল বলে। তিব্বতীয়েরা ইহাকে লোযুল ও সিকিমের লেপচারা প্র বলে। "ভোটান"ই প্রকৃত উচ্চারণ—"ভুটান" নহে।

লেখক যে সকল মূল হইতে স্বীয় প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি ...। বর্তমান শতাব্দীতে ভোটানে রাজকার্য্যে দুইবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহা-দের কার্য্যবিবরণী হইতে তদ্দেশীয় ভৌগোলিক তথ্য অথবা মানবপ্রকৃতির কোনও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু যে সকল কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারী দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক এই দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতীয় জরিপ-বিভাগের যে সকল এদেশী কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রোজনামচা ও পথবিবরণীতেও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিবরণ সাধারণের গোচর হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক এই সকল বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা।

পূর্ব্বপশ্চিমে ভোটানের দৈর্ঘ্য ১৮৫ মাইল ও প্রস্থ ৮৫ মাইল মাত্র। ইহার অধিকাংশ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন। মধ্যে কতকগুলি সুজলা উপত্যকা আছে। সেই সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলস্রোতগুলি ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রধান নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেশের ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু রাজশাসনের বিশৃঙ্খলা ও অধিবাসিগণের অত্যধিক লুণ্ঠনপ্রবণতায় ইহা বৃক্ষগুল্মসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে পরিণত। নিম্নস্থ শৈলের শস্পহীন ভীষণ দৃশ্য হইতে ইহা অনেকাংশে বিভিন্ন। পর্ব্বতগাত্রে বিশাল মহীরুহশ্রেণী উন্নতমস্তকে আকাশের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। কর্ষণহীন সমভূমি অনায়াসজাত তৃণগুল্মে সদা শ্যামলা। প্রাকৃতিক দৃশ্যে হিমালয়ের এই অংশ বড় সুন্দর ও পথিকের নয়নানন্দদায়ক। নিম্নভাগে জলকষ্টের অন্ত নাই, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ গভীর অন্ধকার খদে সূক্ষ্ম জলরেখা কদাচিৎ সূর্য্যালোকে পথিকের নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে পর্ব্বতগাত্র হইতে সর্ব্বত্র অসংখ্য ঝরণা নামিয়াছে। তাহাদের অবিরাম পতনশব্দে সমস্ত দেশ সর্ব্বদা মুখরিত। ঝরঝর শব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেই নয়নসমক্ষে একখানি চারুচিত্র আবির্ভূত হয়,—রবিকরে জলরাশি হীরকের মত দীপ্তি পাইতেছে।

ক্ষেত্রজাত উৎপন্নের মধ্যে চাউল, যব ও বার্লি প্রধান। উন্নতপর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এক প্রকার নিকৃষ্ট বার্লি জন্মে। বপনের দুই মাসের মধ্যেই তাহা সুপক্ক হইয়া উঠে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে বীজবপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে হলকর্ষণাদি আবশ্যক হয় না। কঠিন জমির উপর বীজ ছড়াইয়া একবারমাত্র হলকর্ষণ করিলেই যথেষ্ট। দেশের সর্ব্বত্র নানা জাতীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যত্নসাপেক্ষে বা বিনা যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলুর চাষও অনেক স্থানে আরব্ধ হইয়াছে। কোন কোন প্রশস্ত উপত্যকায় পশুপালন সাধারণের প্রধান জীবিকা। পশ্চিম ভোটানে আমুচু ও ওরংচু নামক স্থানদ্বয়ে ইহা অধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পালিত পশুগণের মধ্যে ভারতীয় গো ও মিশ্রজাতীয় ইয়াক প্রধান। তাহারা আকারে বড় ও যথেষ্ট দুগ্ধ প্রদান করে। দুগ্ধ হইতে প্রচুরপরিমাণে নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যরূপে ও মন্দিরে পূজার্থ ব্যবহৃত হয়। এখানে ... বিস্তর পশু দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয়েরা পশুহননে বিরত, কিন্তু বঙ্গ-

পশুবধে কাতর নহে। সুতরাং গণ্ডার, বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, নানাজাতীয় চিতা, বৃহৎ বন্যছাগ, কস্তুরীমৃগ ও অন্যান্য পশুর শিকারে শিকারী প্রচুর আমোদলাভ করিতে পারেন, তাহা দেশবাসিগণেরও উপকার হয়।

দেশের শাসনপ্রণালী অনেকাংশে তিব্বতের ন্যায়,—ইহাকে আংশিক "দেবতন্ত্রীয়" বলা যাইতে পারে। দেশীয় বিভিন্ন সর্দারেরা একজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের অধীনতা স্বীকার করে।

শাসনপ্রণালী।

এই সকল সর্দারেরা এক প্রকার স্বাধীন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ব্যারণদিগের সহিত ইহাদের শাসনকার্য্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দেশের প্রধান পুরোহিত ধর্ম্মরাজ নামে আখ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি অতি-ঐতিহাসিক যুগে জীবিত ছিলেন ও "সাবদ্রং নগাগওয়াং নামগ্যাম" নামক বীরের অবতার। ইনি চল্লিশ বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর দীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু সহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; তাঁহার বর্ণ গোলাপের ন্যায় লোহিত ও পদ্মগন্ধী। তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ, তদ্রচিত গ্রন্থাবলী ও তন্নির্ম্মিত সেতু প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হয়, তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল সর্দারেরাই দেশের প্রকৃত রাজা। সমস্ত দেশ নয়টি বিভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক বিভাগে একজন সর্দার আছে। তাহারা স্বেচ্ছামত স্বাধিকারের শাসন ও অবসরমত পার্শ্ববর্ত্তী বিভাগের লুণ্ঠনে সময়-ক্ষেপ করে। স্বাধিকারমধ্যাগত পণ্যদ্রব্যে তাহারা অত্যধিক শুল্ক আদায় করে। একে ত প্রতিপদে জীবননাশের সম্ভাবনা, তদুপরি এই অত্যধিক শুল্কে বাণিজ্যব্যবসায় যে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধলেখক ইহাদের দৈহিক বল ও গঠনের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা আকারে দীর্ঘ ও দৃঢ়গঠিত। তিব্বতীয়গণ অপেক্ষা ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। ইহারা বড় কলহপ্রিয় ও কিছুতেই

দেশবাসিগণ।

পরের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। এ জন্য কোন কার্য্যে "নিযুক্ত" হইলেও বড় অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইহাদের অনেকে নানা কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিকিম অথবা ডুয়ারে আসিয়া বাস করিতেছে। অনেকে দার্জ্জি-লিঙ্গের চা-বাগানে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, অবাধ্য ও শীঘ্রই কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অসাধারণ দৈহিক বল সত্ত্বেও তাহারা সহজে ভারবাহ-কের কর্ম্ম করিতে চাহে না। কিন্তু স্বদেশে তাহারা আলস্যে জীবনযাপন করে না।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা বেশ বলিষ্ঠ ও দৈহিক সামর্থ্যে প্রায় পুরুষের সমতুল্য। অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে "বহুপত্যাত্মক বিবাহ" প্রচ-লিত। এক পরিবারের তিন, চারি ভ্রাতায় মিলিয়া এক জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া এক সংসারে বাস করে।

ভারতবর্ষের সকল দেশীয় রাজ্যে এক জন করিয়া ইংরাজ রেসিডেন্ট আছেন, কিন্তু আশ্চ-র্য্যের বিষয়, ভোটানে তাহা নাই। গত ত্রিশ বৎসর ইহাদের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু যত দিন হইতে ইঁহাদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভোটীয়ারা কুচবিহার আক্রমণ করিলে, তদ্দেশীয়েরা বৃটিশ [illegible] সাহায্য

প্রার্থনা করে। তদনুসারে কাপ্তেন জোন দুইটি কামান ও দুই দল সিপাহি সৈন্য সহ ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। ইনি সমভূমিতে পর্ব্বতীয়দিগকে যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্ত করিয়া তাহাদের পার্ব্বত্য আশ্রয়স্থান পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া কুচবিহারের বালক রাজার উদ্ধারসাধন করেন। তিনি ডালিং ও অন্যান্য দুর্গ তোপে উড়াইয়া দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। অবশেষে তিব্বতের প্রধান লামার বিশেষ অনুরোধে ভোটান ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১৭৭৪ অব্দে তিব্বতগমনকালে মিঃ জর্জ বোগ্‌ল ভোটানের মধ্যে দিয়া তিব্বত-গমনে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। তাঁহার আদেশানুসারে তিনি গমনপথের স্থানে স্থানে আলুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আলু ভোটানের সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। উক্ত ঘটনার দশ বৎসর পরে কলিকাতা হইতে তিব্বতযাত্রী একজন রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন।

পরে সাধারণের অজ্ঞাত কোনও কারণে ভোটীয় ও ইংরাজের মধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে বহুদিনব্যাপী "বিচ্ছিন্ন" যুদ্ধের পর পর্ব্বতীয়গণের উপদ্রবশান্তির আশায়, ইংরাজ গবর্মেণ্ট দুয়ার নামক স্থান ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু শীঘ্র তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইংরাজেরা দুর্ব্বলতাবশতঃ ও আত্মরক্ষায় অক্ষমতাপ্রযুক্ত এই প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছে ভাবিয়া তাহারা পুনরায় সমতলভূমিতে লুটপাট আরম্ভ করিল। তখন এদেশে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়চেতা কোনও শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। সুতরাং প্রায় বিংশতি বৎসর তাহারা অবাধে সীমান্তবাসিগণের উপর উপদ্রব করিয়াছিল। অবশেষে ১৮৬৪ অব্দে, শান্তি ও সন্ধির স্থাপনের জন্ত এস্‌লি ইডেন রাজকীয় দূতরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অবমানিত হইয়াছিলেন। দেশমধ্যস্থ পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় সন্ধিসর্ত্তনির্দ্ধারণার্থ সমবেত সর্দ্দারমণ্ডলীর উৎপীড়নে তিনি ইংরাজের হীনতাজ্ঞাপক এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া পর্ব্বতীয়গণের দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। গত শতাব্দীতে মুষ্টিমেয় সৈন্ত ও তৎকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে কাপ্তেন জোন কয়েক মাসে মধ্যেই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার অসংখ্য সৈন্য অজস্র অর্থনাশ করিয়া দুই বৎসরে তাহা সংসাধিত হইল না। যুদ্ধশেষে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, অনেকের মতে তাহা বৃটিশ রাজশক্তির অবমাননাজ্ঞাপক। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই সন্ধির দ্বারা ডালিংকোট ও কালিমপুর নামক সুন্দর ভূমিখণ্ডদ্বয় ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। ভোটানের প্রধান সর্দ্দার এখন ইংরাজের নিকট হইতে বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সীমান্তবাসিগণ লুণ্ঠন ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। "দেবতার গ্রাস" কবিতায় লিখিত একটি সুন্দর গল্প। তাহার উচ্ছ্বসিত প্রবাহে ভাসিতে-ভাসিতে গল্পটি অবলীলাক্রমে উপসংহারের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ছন্দের কঠোর বন্ধনে কোথাও তাহার লীলাময়ী গতির রোধ হয় নাই। স্নেহ প্রেম সৌন্দর্য্যের সুকোমল আলোকে গল্পটির প্রারম্ভভাগ সুরঞ্জিত,—কিন্তু এই স্নিগ্ধ আলোকের পর কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার!—সেখানে অন্ধ কুসংস্কার, তামসী স্বার্থপরতা, ও অকরুণ নিষ্ঠুরতার কি ভয়াবহ প্রতিবিম্বিতা! তাহাতে সঙ্কুচিত শঙ্কিত মথিত হৃদয় শিহরিয়া চমকিয়া মুহ্যমান হইয়া আসে, এবং সর্ব্বশেষে এই বিচিত্র ছায়ালোকসম্পাতরচিত চিত্রখানির মধ্যে সহসা করুণরসোচ্ছ্বসিত ব্রাহ্মণের পরার্থে আত্মদান কি মহনীয় কি বরণীয় কি স্পৃহণীয় বলিয়া মনে হয়। কবির নিষ্ঠুর কল্পনায় হৃদয় পিষ্ট হউক, কিন্তু তাঁহার কাব্য-কৌশল প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "প্রবাসস্মৃতি" পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া একজন দক্ষ লেখক কালী ও কাগজের এত অপব্যয় করিতে পারেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বিলাতে অবস্থানকালে লেখক এক সুন্দরী ব্রিটিশ যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"বাঃ দিব্য দেখিতে!" সুন্দরীর স্বামী 'জন্ পুঙ্গব' লেখকের "সম্মুখে আসিয়া গুরু-গর্জ্জনে বলিলেন, 'কি মহাশয়!' লেখক 'গম্ভীর স্থির স্বরে' কহিলেন, 'কেন মহাশয়!' "ইংরাজ কহিল, 'আপনি যে বলিলেন, 'দিব্য দেখিতে' তাহার মানে কি?" লেখক 'তাহার তপ্ত তাম্রবর্ণ মুখের প্রতি শান্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া' কহিলেন, 'তাহার মানে আপনার কুকুরটি দিব্য দেখিতে!' লেখক 'অদূরে উৎস-উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট একটি হাস্যকাকলি শুনিতে' পাইলেন; "আর সেই অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে একটা বিপুল হাস্যধ্বনি সজল গম্ভীর মেঘস্তনিতের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।" ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী অক্ষরসমষ্টি গলাধঃকৃত করিয়া পরিশেষে এই অপূর্ব্ব ঘটনায় উপনীত হইলে সহজেই মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়; ১ম,—এই সুন্দরীসন্দর্শন নাটকের শেষঅঙ্কে লেখকের ভাগ্যে 'উৎস উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট হাস্যকাকলি' জুটিয়াছিল; কিন্তু এতখানি পণ্ডশ্রম করিয়া পাঠকের কি লাভ? ২য়,—জন-পুঙ্গব প্রত্যুৎপন্নমতি সাহসী লেখকের উত্তর শুনিয়া, নিজের কুকুরকে, না বিদেশী সিপাহীকে,—কাহাকে হাস্যরসের সমধিক উদ্দীপক ও 'পিটি'র পাত্র মনে করিয়াছিল? পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার আর এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।" বঙ্গীয় পাঠকের পরম ভাগ্য। দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা এমন বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তাঁহারাও বিষয়নির্ব্বাচনে এতটা অসাবধান ও বিচারবিমুখ। বন্ধুজন-সমাগমে যাহা অতি সুন্দর 'টেব্ল্-টক্' বলিয়া সাদরে গৃহীত হইত, তাহা যে সাহিত্যের সভায় নিরর্থ ও ব্যর্থ হইতে পারে, আত্মপ্রত্যয়ে অচলা ভক্তি না থাকিলে, লেখক তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। "বানরে বুদ্ধি" প্রবন্ধে লেখক বানরজাতির বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কতিপয় দেশীয় গল্পের সংগ্রহ করিয়াছেন। "সাইবীরিয়া" নামক সুখপাঠ্য প্রবন্ধের লেখক, Meigrian সাহেব প্রণীত From Paris to Pekin over the Siberian

Snows নামক ভ্রমণকাহিনীর পরিচয় দিয়াছেন। "দেশান্তরিত ফরাসী" প্রবন্ধে, লেখক, মিঃ লুই ডি রোজমন্ট নামক 'একটি অসাধারণ' ব্যক্তির পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইয়া, ভূমিকায় 'সাধারণ' বাঙ্গালীর ভ্রমণে অনিচ্ছার জন্ম বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! যে 'অসাধারণ' ভ্রমণকারীর অদ্ভুত অবদানে লেখক এত মুগ্ধ হইয়াছেন, কোনও বিলাতী দৈনিকের কল্যাণে জানা গিয়াছে, সেই রোজমণ্টের কাহিনী আদৌ সত্য নহে, লোকটি জাল, ইত্যাদি। সুতরাং লেখক যে তাসের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

নব্যভারত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষের 'সুন্দরবনে মগ' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কাসাভা বা সিমুল আলুর চাষ" একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "পূজা দেখা" কবিতাটির রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ বাবুর ন্যায় সুকবির হস্তে কবিতার এইরূপ অপব্যবহার ও লাঞ্ছনা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। "কুকির কবিতা" কৌতূহলজনক। লেখক বলেন,—"বর্ব্বর ও নিরক্ষর কুকিদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।" ত্রিপুরাপতির যত্নে কুকি জাতিকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। আশার কথা,—এই যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; "আজ কাল ত্রিপুর রাজ্যের অনেক কুকি প্রজাই বাঙ্গালা লেখাপড়া কথঞ্চিৎরূপে শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কুকি রাজা খান থাম্পুই স্বরচিত 'দুঃখগান' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। * * * ইহার পূর্ব্বে কুকি জাতির মধ্যে কেহ কখনও কবিতা লিখিয়াছে, পুথি, পুস্তক, অথবা লোকমুখে এমন কথা শুনা যায় নাই।"—কালীপ্রসন্ন বাবু কুকিরাজের রচিত সেই বাঙ্গালা কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এবার "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা"য় নব্যভারত-সম্পাদকের দীনতা ও সৌজন্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। "মাসিকপত্রিকাসমূহের সম্পাদকগণের অনেকেই" নব্যভারত-সম্পাদককে মাসিকপত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতের কি দুর্ভাগ্য! নব্যভারতের সম্পাদক বলিয়া দিতেছেন, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, "মাসিকসাহিত্য সমালোচনায় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত কুৎসাই প্রশ্রয় পাইতেছে।" তাঁহার উক্তি প্রতিবাদেরও অযোগ্য। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, যে সমালোচনা করে, সে লেখকের "বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে।" পুনশ্চ, নব্যভারতের এই নব্য সাধু বলিতেছেন,—"আমরা আপন আপন বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিব না।" সাধু সাধু! সেই জন্যই কি ছুরিকাখানি শানাইয়া "সাহিত্য ভারতী পূর্ণিমা প্রভৃতি"র সম্পাদকগণের বক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের কল্যাণে নব্যভারত-সম্পাদকের যে সকল বন্ধুর 'বক্ষ' বাঁচিয়া গিয়াছে, তাঁহারা কি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার অনুরোধেও, তাঁহাদের এই বন্ধু-সম্পাদকের জন্য সম্মাননীয়াগণের ব্যবস্থা করিবেন না?

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদরায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বট-ব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না; কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে বোধ হয় অপরিচিত ছিলেন। "সাহিত্য" পত্রে বৈদিক কালে গোহত্যাবিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধ হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাস-ঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সচরাচর বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কি রকম একটা অনির্ব্বচনীয় ভীতির সঞ্চার করে; বোধ হয় সেই ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই, এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনব মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং যখনই পড়িয়াছি, তখনই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকার করিতে দোষ দেখি না যে, "সাহিত্য" পত্রে [illegible] উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা [illegible] উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার [illegible] দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। কখনই সে আশা হইতে বঞ্চিত [illegible] হই নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত অচিরে এই আনন্দের জনয়িতা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন, এবং যে আগ্রহ, যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম "সাহিত্যের" মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা এত শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখন মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয়ের

সৌভাগ্য ঘটে নাই ; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকারবহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা রচনা সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোন ক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র [illegible] তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকামাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ [illegible] করিয়া তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী থানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্রের জন্মস্থান। ১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। চল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল [illegible] বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

থানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত [illegible] সূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর [illegible] রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহার স্মৃতি সেদিনও বঙ্গীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্র একটি বিতণ্ডার আন্দোলন উৎপন্ন করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই [illegible] উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধ-[illegible]। রামকানাইএর পিতৃপিতামহ [illegible] ছিলেন, রামকানাই আপন পরিবারমধ্যে স্বকীয়উদ্যমসহকারে [illegible] প্রচলন

করিয়া যান; তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং উমেশচন্দ্র সেই শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন।

উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী। উমেশচন্দ্রে বঞ্চিত হইয়া উভয়েই এখনও জীবিত, বা জীবন্মৃত।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরাজী স্কুলে ১৮৬৮ সালে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আইসেন। এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কালেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ৭৪ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম. এ., ৭৫ সালে বি. এল. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মোয়াট পদক পুরস্কার পান। পঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

১৮৭৭ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর, দশ বৎসর পরে ষ্টাচুটা[illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানী লাভ করেন। পরে বিভিন্ন [illegible] সেশনসের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎ[illegible] বগুড়ায় অবস্থানকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা[illegible]সেন। চিকিৎসায় স্থানপরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। "নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব" ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সংসারের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সংসারেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনা বড় অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই দুর্ভাগ্য দেশে [illegible] ক্ষেত্রের প্রায় সমগ্র প্রদেশটা [illegible] বীরপুরুষগণের বেশভূষার পারিপাট্য ও

অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের জড়শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থি-কঙ্কালের অস্তিত্বসম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একবারে অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিতেন না; কিন্তু বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখনও অনুভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখনও কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এদেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক অতিশয় পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণসমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ আকর্ষণের বা অনুরাগপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্যের বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত; বঙ্গের জলাভূমি যে ম্যালেরিয়া উৎপাদন করেন, তাহা বাষ্পীয় পদার্থ; বঙ্গের অন্তঃপুরচারিণীগণ যে সকল বৎসের জন্মদান করেন, তাহারা কঙ্কালবিহীন; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ"; বঙ্গদেশে কাঠিন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ও রশ্মিপ্রতিফলনক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল ও তীক্ষ্ণতা ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত, নূতন নূতন [illegible]ধ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্মুখে আসিত ও তন্দ্রাত্যাগ [illegible] জাগিয়া উঠিত। বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে; এবং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস-উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে, দেশে ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শোনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। পরন্তু নব্যসম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় প্রাচীনকালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের পাশ্চাত্য শিক্ষাও তাহা জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র হয়; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতিস্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চিনে না, সে যেন ভণ্ড ও কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন করিয়া ধিক্কৃত না হয়।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারি জন সহৃদয় পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে ও আপনাকে চিনিতে চেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিতসমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা, উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এক একবার মনে হয়, তিনি যদি রাজকার্য্য জীবিকার উপায়স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অধিক কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই; যাঁহাদের শক্তির বা অর্থসামর্থ্যের বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন উমেশচন্দ্রের মত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইয়াছেন?

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোনও লাভ নাই, তাঁহারা অধম; আর যাঁহারা প্রাচীন কালের জন্য কেবল হা হুতাশ করেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাবই প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায় যিনি অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীতস্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনি ধন্য ও সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। তিনি কালস্রোতে নীয়মান যে দুই একটি চিহ্নমাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ লোকনয়নাতীত বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী জনসমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, এমন কোন কথা নাই। সামান্য প্রমাণ আশ্রয়ে, অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে যে ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দার্শনিকোচিত সংশয়পরতাই কেবল তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমষ্টির প্রতি সাধারণের অনাস্থার কারণ নহে। এই অনাস্থার মূলে আমাদের স্বদেশের ইতিবৃত্তের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়াই সংশয় হয়।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। একটা অনিবার্য্য মোহের আবেগে আমি সেই রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট কাপুরুষের মত কেবল বৈদেশিক পন্থার অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। স্বাধীনভাবে আপনার উদ্ভাবিত নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক একটি প্রবন্ধ বৈদিককালের আর্য্যসমাজের এক একটি পট মানস-চক্ষুর নিকট উজ্জ্বল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্ব্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব, তাহার স্পষ্টতা, তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার পরিস্ফুটতা দেখিয়া, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তুলিকা যে তাহার স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি

প্রদান করিত, তাহা বুঝিতাম। অতিরঞ্জনই হয় ত তেমন ঔজ্জল্যের কারণ ইহাও সম্ভব হইতে পারে। তথাপি সেই পট এক এক খানা যখন দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইত, তখন সুখস্বপ্নদৃষ্ট স্মৃতির মত মনের মধ্যে স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইত। ভারতবর্ষের অতীত সমাজের সেই চিত্র ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র হইতে কত বিভিন্ন! হয় ত তাহা কল্পনাকৃত অতিরঞ্জনে বিকৃত ও অসত্য। হয় ত আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ও আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু তাহার মূল্যনির্দ্ধারণ অন্যরূপে করিতে হইবে। যে অস্পষ্ট স্মৃতি তাহা জাগাইয়া দিত, যে আকাঙ্ক্ষার, যে অতৃপ্তির, যে আশার, উদ্দীপনা করিত, তদ্দারা তাহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এবং এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশার উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস জড় অনাসক্ত সুপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশারই এখন প্রয়োজন। কর্ম্মসম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই, সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্ম্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধতমসে আচ্ছন্ন জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে বাধাবিঘ্ন না মানিয়া ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এই জন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকট এত ভাল লাগিত। বাঙ্গালায় আরও কতিপয় ব্যক্তি ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই কেবল বৈদেশিকের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে ও অনুকারেই নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বৈদেশিক প্রণালীক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্ম্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান্। কিন্তু উমেশচন্দ্রের যে স্বাধীন চিত্তপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, যে

আকাঙ্ক্ষার ও পিপাসার উত্তেজনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি, বোধ হয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয় ত ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রেরও সেই পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিল না। মাতর্বঙ্গভূমি! এই নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ কি তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না?

যে লোকান্তরিত মহাত্মার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ উপাদান তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোন বন্ধুকে তিনি পত্র দ্বারা ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানেরও সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদানসংগ্রহ অনেকেরই সাধ্য; এদেশে সেই সাধ্যসাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত করিয়া তাহার যথাস্থানে বিন্যাস সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্যনির্দ্ধারণ, তাহার অর্থ-আবিষ্কার, পুরাতন জিনিষকে নূতন চোখে দেখা সকলের সাধ্য নহে। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি যথেষ্ট মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্য্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিহর্ত্তা থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্যমতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই বিভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরাজী দর্শনে যাহাকে noumenon বলে, ও যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যমতে সেইরূপ noumenon, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে প্রকৃতি ও

পুরুষের সম্মিলনে বা সম্বন্ধস্থাপনে এই প্রতীয়মান বিশ্বজগতের অর্থাৎ phenomenon সমষ্টির উৎপত্তি। এই সম্বন্ধস্থাপনেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টিব্যাপারকে তিনি "দার্শনিক সৃষ্টি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনকে এবল্যুশননিষ্ঠ বা অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য ঠিক্ বুঝিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইংরাজী দর্শনে যে এবল্যুশন শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে জড়-জগতের অভিব্যক্তি বুঝায়, তাহাতে ব্যাবহারিক প্রতীয়মান জগতের বা ফেনমেনাল জগতের ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি বুঝায়। স্পেন্সারের মত যাঁহারা মানবমনের ও জীবজন্তুর মানসিক বৃত্তির অভিব্যক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও সেই ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-প্রকৃতিক। এই কথাটা বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় যেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না। অন্ততঃ, আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতের দর্শন-ব্যাখ্যাতৃগণ যদি এই পার্থক্যটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে, হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র অনেক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পায়।

উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাপাঠে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পুরুষের বাহিরে বহির্জগতের অন্তস্তলে প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব একটা অনুমান বা হাইপথীসিস্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও জাগতিক রহস্য ও দার্শনিক সৃষ্টি বুঝা যাইতে পারে। সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষ অর্থে স্থূলতঃ যদি মনুষ্যের আত্মা ধরা যায়, তাহা হইলে, আমার ন্যায় অন্যান্য মানবেরও আত্মা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে উমেশচন্দ্র গণ্য করিতেন। এ কথাটাও ঠিক্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার আত্মা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অপরের আত্মা আমার নিকট অনুমানগম্য ও কল্পিত পদার্থ। জড় জগৎ যেরূপ আমার অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ, জড় জগতে বিচরণশীল জড়শরীরধারী জীবগণের অজড় আত্মাও আমার নিকট সেইরূপ অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ, ইহার অধিক

বৈজ্ঞানিক যুক্তির বশে আসে না। বৈদান্তিক সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র 'অহম্' পদার্থে পর্যবসিত করিয়াছিলেন; এবং সেই 'অহম্'কেই 'ব্রহ্ম' উপাধি দিয়া বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে যেমন অনির্দ্দেশ্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের, জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলনে জ্ঞানের উৎপত্তি, অর্থাৎ বিশ্বের দার্শনিক দৃষ্টি; বেদান্ত মতে সেইরূপ 'অহম্' বা 'ব্রহ্ম' নামধেয় পদার্থ হইতে কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে বা 'অবিদ্যা'-যোগে বিশ্বের উৎপত্তি। উভয়ত্রই একটা অনির্দ্দেশ্য কারণ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলন কিরূপে ঘটিল, অথবা 'অহম্'এর কিরূপে বিকার ঘটিয়া বিশ্বজগতে পরিণতি ঘটিল, তাহার প্রণালীনির্দ্দেশ করিতে গেলেই এই অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় হেতুর অবতারণা আসিয়া পড়ে। প্রচলিত ঈশ্বরবাদ সগুণ অথচ বচনাতীত, অনুভবগম্য অথচ অনির্দ্দেশ্য—'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—এইরূপ ঈশ্বরনামক পদার্থের কল্পনা করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় হেতুর স্থান পূরণ করে। উমেশচন্দ্র অন্ততঃ শেষ বয়সে সাংখ্যমত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এই শেষোক্ত ঈশ্বরবাদের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক 'সোঽহম্'-বাদই কিন্তু বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পঠদ্দশায় ইংরাজী শিক্ষার হাওয়ায় উমেশচন্দ্র 'পৌত্তলিকতা'র প্রতি ও হিন্দুর প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাস্থা কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রবিরোধী আচারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, বোধ হয় না। তাঁহার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এককালে তিনি ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনের অনির্দ্দেশ্য কারণের স্থলে তিনি ঈশ্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থে তাঁহার নিজ ভাষায় "An intelligent being to whose intelligent action the present form and arrangement of the world of matter and the connection between human souls and that world, are owing." এই ঈশ্বর কিন্তু অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি অমঙ্গল হইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন। এই অমঙ্গল আবার জগৎপ্রকৃতির অংশমাত্র। তাঁহার স্বভাষায় "Evil is a part of Nature, and the energy of God is directed to the purging of our nature from evil and to the raising of us to a higher state." এই মতের সহিত তাঁহার সাংখ্যমতের সামঞ্জস্য ঠিক্ বোঝা গেল না। অন্যান্য পণ্ডিতের

ন্যায় তিনি বেদের বহুদেববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবতার তত্ত্বনির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন্ মত সমীচীন, তাহা জানি না। অন্ততঃ, জৈমিনি-প্রমুখ যে মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দুজাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের ব্যবস্থাপনে যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমগ্র হিন্দুসমাজ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত আপত্তি চলিতে পারে, বোধ হয় না। প্রথম বয়সে 'পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক, জীবনের শেষভাগে তিনি যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসনা ও প্রতিমাত্র বা ধ্যানমাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম্মপালনে তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ব্রাহ্মণনিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের সহকারে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না, এবং শতবৎসর পূর্ব্বে আচারবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার সকলগুলির উপযোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথই যে হিন্দুর অবলম্বনীয় প্রকৃত পথ, এই স্থূল সিদ্ধান্তের সহিত ঐরূপ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বস্তুতঃ কোন অসামঞ্জস্য নাই। বেদপন্থী হিন্দুসমাজের বিপ্লবের জন্য ভগবান্ শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে, বোধ করি, এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতসমাজে যে নব্যহিন্দু-নামধারী নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বত্র সরল পথে চলিতেছেন কি না, বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূদেব বাবু এক স্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজী

শিক্ষার বিষ সহজে শরীর হইতে নামে না। আমাদের নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচারিত উপদেশ শুনিয়া অনেক সময়ে ভয় হয়, তাঁহারাও এই বিষ সম্পূর্ণ হজম করিতে পারেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের নামে প্রচলিত অনেক মত অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টানি মত বলিয়া সংশয় জন্মে। আজকাল শিক্ষিতসমাজের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত ভাবপ্রবণ কর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মের প্রতি যে আত্যন্তিক অনুরাগটা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে পঠদ্দশায় বিনা বিচারে উপার্জ্জিত খ্রীষ্টানিভাব কতটা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে; এবং এই উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অধঃপতিত পরপীড়িত রাজনৈতিক অবস্থায় আবশ্যক কি না, তাহাও বিচারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত্রসমালোচনকালে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ অস্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণতা গীতোপনিষদুক্ত ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত জ্ঞানমূলক বৈরাগ্য হইতে এবং সেই বৈরাগ্য হইতে অভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবণতা হইতে হিন্দুসমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন। স্বদেশগত-প্রাণ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে স্বাধীন-মত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন কি না, জানি না। সার্ব্বভৌমিক প্রেম শব্দটা বড়ই চিত্তোন্মাদক, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই সার্ব্বভৌমিক প্রীতিবিস্তারের যে ভয়ঙ্কর কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা রোমহর্ষের উৎপাদন করে। অন্ততঃ পরপদানত হিন্দুসমাজের পক্ষে এখন কিছু দিন কূর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মসম্প্রসারণ অপেক্ষা আত্মসঙ্কোচের চেষ্টা করিলেই বোধ করি ভাল হয়। যাঁহারা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় হইতে সামাজিক ব্যক্তিবৃন্দের চিত্তপ্রবৃত্তি অপসারিত করিয়া অভিনব পঞ্চমপুরুষার্থের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন, এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রতি ও কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া হিন্দুসমাজকে ধীরে ধীরে মনুপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণরক্ষিত পরিচিত মার্গ হইতে বিচলিত করিতেছেন, তাঁহাদের দূরদর্শিতা কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা চিন্তার বিষয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভানুমতী।

১১

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর-পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন; এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে স্থানান্তর হইতে এত প্রজা সমাগত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জমি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইয়াছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিয় এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। তিনি আত্মসংযমবলে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে শূন্য

হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।" ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালক বালিকা, তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি 'মা' বা 'দিদি' সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—"তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস!" অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানা রূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত করিয়া তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস; পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল; তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীল গর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকা-খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবান্তরালে অর্দ্ধলুকায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। বিস্তীর্ণা কর্ণফুলীর

—"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাক্ষেত্র। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের মন্দিরের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্রসংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে অবস্থিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত্য ও সমতলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। অনাথনাথ বাটী ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলায় আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি

চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসীর" একজন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব ;—

"মহামুনি চট্টলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল উপত্যকায় নানা স্থানে বৌদ্ধভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতর প্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে! * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান! কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই! এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত। নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন! বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি; এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা ফুরায়, দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল দোকানেই মহা ভিড়; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্ত্তি। ইহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাটরূপে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দেখিলাম, ৭।৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুড়ান—দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।"

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তিনি এই মেলার সাহায্যার্থ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সেবার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্ণে মেলাস্থলে আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত উপবন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। যত দূর দেখা যাইতেছে, নানা পর্ব্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত; তাহাদের গীতে, কণ্ঠে, হাস্যে ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, 'বউ কথা কও' নাগেশ্বরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিনাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। পর্ব্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মস্তকে সম্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘন কৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

"সকলেরই এক বেশ। মগ পুরুষের মাথায় রেশমী রুমাল, গায়ে কুর্ত্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙটি। তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। মগ মহিলাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ফুলের তোড়ায় সুশোভিত; বক্ষঃস্থল একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে রেশমী শাড়ী, গলায় টাকার মালা; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়না। ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুরুল পুরু রৌপ্যখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয়। মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের দেহমন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষেরা সকলেই বলশালী ও কর্ম্মঠ; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাসিকাটি চাপা। মগেরা বড় আমোদপ্রিয়। নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে। অথচ মুখে নির্ম্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বুদ্ধদেবকে পূজিতে যাইতেছে। অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জানু রাখিয়া ললাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাভরণা, স্বর্ণপ্রতিমা-স্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিতনয়নে তাঁহার দিকে

চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ-উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসবক্ষেত্রের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলা কোমল মকমলসন্নিভ শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা! ওই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ, সকলেই আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ-নির্ব্বাণের উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচার, তিরোধান, ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধান কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবা!

আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।"

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়! এখনকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালি-কারাও পড়ে ছাইভস্ম, শিখে,—না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দ-নন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতি-যোগিতা। যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ২॥০ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দুবৈরাগী। তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে, যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে "ক্রুশে" নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইঁহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না। শ্রীভগবান এক,—তাঁহার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য লাভ করিবার সাধনার পথ স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই

পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি মা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে ষড়্‌রসের কথা কি শুনিয়াছ?

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, কান্ত, মধুর।

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসাশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতা-মাতার মত প্রেম করে। হিন্দুর দেব দেবীরা পিতা মাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতা মাতার দাস কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দযশোদা শ্রীরাধাকে যেরূপ প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস। শ্রীদাম সুদাম যেরূপ করিত. সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজগোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎপতিকে সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয় ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়াছিল। এই অবস্থা হিন্দুযোগীর 'সোহহং' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। এইরূপ, যাহার যেরূপ প্রকৃতি. মানুষ তদনুসারে রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম্ম একটি সাধনার পথমাত্র—গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্ম্মপথ, অপর ধর্ম্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন;—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকের শ্যামল গিরিরাজি দূর সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের একবিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং সন্ধ্যা সমাগত

দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও উছলিয়া উঠিল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন ৺শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, হইয়া দলে দলে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেববালা! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশ-ভূষাই বা কোথায়? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষায় বাহার থাকে, তবে এই মগ মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে!"

"যুবতীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালিকাগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর এক-বার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির-প্রাঙ্গন বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে, রাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও, প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলায় এমনই মহান্ ভাব!

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন? হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

তৃতীয় প্রস্তাব।

অশোকরাজত্বের তৃতীয়াংশ তাঁহার অভিষেকের পঞ্চদশ বৎসর হইতে ষড়্‌বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাই বৌদ্ধ ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশে যে বীজ কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এই যুগে তাহা হইতে ঘনচ্ছায় বিশাল বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তাহার ছায়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও প্রান্তরাজ্যসমূহ শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ বড়ই বিরল। কেবল সম্রাট কন্‌ষ্টান্‌টাইন কর্ত্তৃক ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা ব্যাপারই ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু কন্‌ষ্টান্‌টাইনের সময়ে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি এরূপ সমদর্শিতাও ছিল না, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের এরূপ সুব্যবস্থাও ছিল না।

অশোকরাজত্বের এই তৃতীয়াংশের বিবরণ নিম্নলিখিত লিপিমালা হইতে প্রাপ্তব্য।—

(ক) গুহালিপি—

খলতিকস্থ (আধুনিক বারাবরস্থ) সুপিয়া (আধুনিক করণচৌপাড়) গুহা, গয়ার ১৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। (১)

(খ) গিরিলিপি—

(১) সাসেরাম, সাহাবাদ জিলায়;

(২) রূপনাথ, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের ৩৫ মাইল উত্তরে;

(৩) বৈরাট, জয়পুর হইতে ৩১ মাইল উত্তরে;

(৪) ভাব্রা, ঐ;

(৫—৭) সিদ্ধাপুর, মহীশূরস্থ চিতলদুর্গের ইলাকায়।

(গ) স্তম্ভলিপি—

---

(১) বারাবরে অশোকের সময়ের আর দুইখানি গুহালিপি আছে। সে দুইখানি নিগোহ (আধুনিক সুদাম) ও (আধুনিক) বিশ্বঝোপ গুহায় খোদিত। উভয় লিপিই অশোকের অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) উৎকীর্ণ। এই লিপিদ্বয়ে আজীবিক-নামক ভিক্ষুগণকে দানের উল্লেখ আছে।—Indian Antiquary. vol. xx. (1891) pp. 361-5, 36 p—70.

(১) নিগ্নীব, নেপাল তরাই, গোরক্ষপুর জিলার উত্তরে; উক্ত রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(২) পড়েরিয়া, নেপাল তরাই, নিগ্নীব হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(৩) এলাহাবাদস্থ কৌশাম্বী;

(৪) কাকনাভ, (আধুনিক সাঞ্চী), ভূপালরাজ্যে।

উল্লিখিত লিপিমালা আয়তনে ক্ষুদ্র ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত। সিদ্ধাপুরস্থ তিনটি লিপি মহীশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিষ্টার লুইস্ রাইস্ কর্ত্তৃক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত। নিগ্নীবস্থ স্তম্ভলিপি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের কোন রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়; ডাক্তার ফুরার স্থানাদি নির্ণয় করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী পড়েরিয়ার লিপি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কৌশাম্বীলিপির সহিত সাঞ্চীলিপির বহুলপরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই দুই লিপিই অসম্পূর্ণ ও তারিখ-বিরহিত।

বারাবরস্থ সুপিয়া গুহালিপি হইতে প্রকাশ যে, অশোক অভিষেকের একোনবিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ বিংশতিতম বৎসরে) সেই গুহা দান করেন; সে গুহা তিনি কাহাকে দান করেন, তাহা পাঠ করা যায় নাই; তবে তৎপর্ব্বতস্থ তাঁহার দুইটি ও তাঁহার পৌত্র দশরথের দুইটি লিপি হইতে দেখা যায় যে, গুহাগুলি আজীবিক যতিগণের সম্পত্তি। এই আজীবিকগণ কে, তৎসম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। তবে তাঁহারা যে বৌদ্ধ নহে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে, তাহারা এক নগ্ন-সাধুসম্প্রদায়-ভুক্ত; সে সম্প্রদায় শাক্যমুনি ও তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে ইহাদিগের নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তাহার টীকায় উৎপল তাহাদিগকে "নারায়ণাশ্রিতানাম্" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) অতএব গুহালিপি হইতে দেখা যায় যে, রাজত্বের বিংশতিতম বৎসরেও অশোক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বিমুখ ছিলেন না।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে উৎপীড়িত না করিলেও, ক্রমে তাহাদের প্রতি অশোকের সহানুভূতির হ্রাস হয়, এবং ক্রমশঃ তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়েন। সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও সিদ্ধাপুর, এই কয় স্থানের লিপিমালা হইতে

---

(২) Kern, l. c. Prof. Buhler, Ind. Ant. xx, p. 362.

তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সিদ্ধাপুরস্থ প্রথম লিপিতে অশোক লিখাইয়াছেন,—

"দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শিন্) ইহা বলিয়াছেন—সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক কাল আমি উপাসক হইলাম, কিন্তু (তৎকালমধ্যে) কোন চেষ্টা করি নাই। ছয় বৎসর কেন, ততোধিককাল আমি সংঘতে উপগত হইয়াছি; তৎকালমধ্যে (ধর্ম্ম)-বৃদ্ধিসাধনকল্পে চেষ্টা করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে যে সকল মনুষ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে ছিল, তাহাঁরা দেবগণ সহ অসত্য স্বরূপ, প্রকাশ হইল।" (৩)

সাসেরাম প্রভৃতির লিপিমর্ম্মও এইরূপ। (৪) অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে কাজেই আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে এই প্রয়োজনীয় লিপির সময়নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে প্রকাশ যে, অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) অশোক কলিঙ্গ বিজয় করেন। তথায় নানা প্রাণীর বিনাশ ও জীবক্লেশ দেখিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়। সম্ভবতঃ সেই অনুশোচনায় অশোকের মন প্রথম ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দশম বৎসরে তাঁহার "উপাসক" হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ লিপিদ্বয়ে প্রকাশ যে, ধর্ম্মলিপিমালা ও অন্যান্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রধানতঃ তাঁহার অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) আজ্ঞাপিত হয়। এই বিষয় ষষ্ঠ স্তম্ভলিপিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। দশমবর্ষ হইতে "সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক" কাল হিসাব করিলে আমরা ত্রয়োদশ বৎসরে উপনীত হই। সেই সময় হইতে যে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বহুলপ্রচারাদিকল্পে বহুবিধ চেষ্টা করেন, তাহাও দেখা যাইতেছে, এবং পরেও দেখা যাইবে। অতএব অন্যান্য লিপিমালা উপরি-উক্ত সিদ্ধাপুরাদির লিপিগুলির সমর্থন করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অশোকের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি নানা বৌদ্ধ তীর্থে গমন করেন ও সেই সকল তীর্থে নূতন স্তূপাবলীর নির্ম্মাণের ও পুরাতন স্তূপগুলির সংস্কারের

(৩) Epigraphia Indica vol. iii. pp 138—9.

(৪) Ind. Ant. xx. p. 165; xx ii pp. 299 ff.

মনোযোগ করেন। ইহার প্রভাব নিগ্নীব ও পড়েরিআ স্তম্ভলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) নিগ্নীবে লিখিত আছে যে, অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে গত বুদ্ধ কোণাকমনের পূর্ব্বস্থিত স্তূপ তিনি বর্দ্ধিত করেন। পড়েরিআতে উল্লেখ দেখা যায়, অভিষেকের বিংশতি বৎসর পরে বুদ্ধশাক্যমুনির জন্মস্থান লম্বিনিগ্রামে প্রিয়দর্শিন্ আসিয়া পূজা করেন ও সেই গ্রামখানি নিষ্কর করিয়া দেন। প্রবাদ এই যে, তিনি স্বরাজ্যের মধ্যে চতুরশীতি সহস্র স্তূপাবলী স্থাপিত করিয়াছিলেন। (৬)

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বৌদ্ধস্তম্ভ মণ্ডপ ও গৃহের নির্ম্মাণ করেন। পড়েরিআতে শিলাস্তম্ভের কথা লিখাইয়াছেন। অশোক লাট স্তম্ভ এখনও অনেক স্থানে দেখা যায়; যেমন গয়া জিলায়,—নিজ গয়া সহরে ও ইসলামপুর থানার দক্ষিণে, দুইটি এখনও বর্ত্তমান। বৌদ্ধ অবদানের মতে, বোধগয়ায় মহাবোধিদ্রুম ও বজ্রাসনের জন্য রেলিংযুক্ত, থামওয়ালা, খোলা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দেন ও তদ্রক্ষার্থ তাহার চারি পার্শ্বে প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। রেলিং প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। (৭) আচার্য্য ও ভিক্ষুগণের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকক্ষসমন্বিত গৃহসমূহের নির্ম্মাণ করেন। (৮)

দ্বিতীয়তঃ, অশোক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ভাব্রা গিরিলিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং সেই গিরিলিপি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজা প্রিয়দর্শিন্ মাগধসঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া (তাঁহাদের) আয়ু ও সুখের বৃদ্ধি কামনা করেন। পূজনীয়গণ, আপনারা জানেন, আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের কত মান্য ও শুভকামনা করি। পূজনীয়গণ, ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক যাহা ভাষিত, সে সব সুভাষিত; এবং যত দূর আমি আদেশ করিতে পারি, তাহার ঘোষণা করা আমি উত্তম মনে করি, যে তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী

---

(৫) নিগ্নীব—Ep. Ind. v. pp. 5-6.
পড়েরিআ—Ep. Ind. vol. 1. p. 4.

(৬) Beal's Si-Yu-Ki vol. II. pp. 88-90; Fahien Ch. xx-iii and xxvi.

(৭) Dr R. L. Mittra's Bodh-Gaya pp. 71, 72, 146; General Cunningham's Mahabodhi pp. 4-16; Si-Yu-Ki vol. II. 117-8.

(৮) Si-Yu-Ki II. p. 93; cf. Fa-hien ch. xxvii.

হইবে। পূজনীয়গণ, ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি এই ;—বিনয়সমুৎকর্ষ, আর্য্যবাসানি, অনাগতভয়ানি, মুনিগাথা, মোনেয়সূত্র, উপতিষ্যপ্রশ্ন, এবং লাঘুলোবাদ, যাহা মৃষাবাদ হইতে আরব্ধ হইয়া ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ভাষিত। পূজনীয়গণ, আমি ইচ্ছা করি, বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলির শ্রবণ ও উপাধ্যান করেন, উপাসক এবং উপাসিকারাও এইরূপ করে। এতদুদ্দেশে, পূজনীয়গণ, ইহা লিখাইলাম যে, লোকে আমার ইচ্ছা জানুক।" (১)

এই ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি কি, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। বোধ হয়, বিনয়সমুৎকর্ষ,—বিনয়পিটকের সারাংশ "পতিমোকখ"; অনাগত ভয়,—সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায়শাখার "আরণ্যকানাগতভয়" সূত্র; উপতিষ্য-প্রশ্ন,—বিনয়পিটকের মহাবগগস্থ "শারিপুত্র" আখ্যান, মুনিগাথা,—সূত্র-পিটকের সুত্তনিপাতশাখার "মুনিগাথা" নামক দ্বাদশ সূত্র; এবং লাঘুলোবাদ—সূত্রপিটকের মজ্‌ঝিমনিকায়শাখার ৬১ সূত্র, "অম্বলট্টিক-রাহুলোবাদ"। আর্য্যবাস এবং মোনেয়সূত্র এখনও চিহ্নিত হয় নাই।

উল্লিখিত তালিকায় তদনীন্তন সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রেরই উল্লেখ আছে, এমন বোধ হয় না। আমি অনুমান করি, ভগবান বুদ্ধদেবের ভাষিত যে যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শ্রবণ ও অনুচিন্তা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য, অশোক সেই সকল গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহ ব্যতীত ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ভাষিত, বা তাঁহার শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য অনেক সূত্রও তখন বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ, স্বদেশে ও বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক বহুবিধ ব্যবস্থা করেন। ইহার আভাস আমরা গিরিলিপিতে (দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) পাই-য়াছি ও বড় স্তম্ভলিপিমালায় প্রাপ্ত হইব। দ্বিতীয়, সপ্তম ও ত্রয়োদশ গিরি-লিপিতে লিখিত আছে যে, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। স্বরাজ্যেও রাজকর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যের ধর্ম্মশিক্ষার উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য, "প্রতিবেদিক" ও "ধর্ম্মমহামাত্য" নামক কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন। সাসে-রাম প্রভৃতি উল্লিখিত চারিখানি গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"বিবুধ যাহা ইহ

(১) M. Senart, Ind. Ant. xx. pp. 165-8.

(ধর্ম্মপ্রচার) বিবৃত করা হইয়াছে। দুই শত ছাপ্পান্ন ইতি ২৫৬।" (১০) বুলার সাহেব "বিবুথের" বুধ অথবা ব্যুষ্ট (অতিবাহিত) এই অর্থ করিয়া, লিপির সময় বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল হইতে ২৫৬ সাল ঠিক করেন। (১১) কিন্তু উত্তমরূপে পাঠটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেনার্ট সাহেবের কৃত 'প্রচারক' অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রচারকপ্রেরণের কথা অশোক নানা লিপিতে বলিয়াছেন।

অশোকের কার্য্যাবলী তাঁহার নিজের রচনা হইতে প্রদর্শিত হইল। বৌদ্ধ-কিম্বদন্তীতেও অশোকের কার্য্যকলাপের কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়; তবে তথায় এই সকল কার্য্যসমূহের অধিকাংশ তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির নামে উল্লিখিত। তাহা কত দূর সত্য, বলা যায় না। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সমিতির উল্লেখ বিরল ও অস্পষ্ট। কেবল দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধেরাই তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির কার্য্যাবলীর সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় দীপবংশে ও মহাবংশে এতদ্বিষয়ক মূলাধার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

উভয় পালিপুস্তকে প্রকাশ যে, কালক্রমে বৌদ্ধ আচার-ব্যবহারে নানা ভ্রম ও বিবিধ মতানৈক্যের সঞ্চার হয়, ও তাহার ফলে সংঘের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভ্রমসংশোধন ও বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, অশোক, সাম্রাজ্যের নানা বিভাগ হইতে বিদ্বান্ ও পূজনীয় ভিক্ষুগণকে পাটলিপুত্রে আহ্বান করেন। এক সহস্র স্থবির সভায় সমবেত হন, ও মোগ্গলিপুত্র তিষ্যকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। ইহারই নাম তৃতীয় বৌদ্ধসংহতি। অশোকাভিষেকের অষ্টাদশ বৎসর পরে এই তৃতীয় সংহতির অধিষ্ঠান হয়। সংহতি নয় মাস কাল শাস্ত্রাদি ও বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করেন। এই বহুকালব্যাপিনী আলোচনার ফল দুইটি বৃহৎ বিষয়ের ব্যবস্থা। প্রথম, বৌদ্ধত্রিপিটকের সংগঠন; দ্বিতীয়,—বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারিত প্রচার।

ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ও প্রাচীনতম শাস্ত্র। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—

১। বিনয়পিটক,—সংঘস্থ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের নিত্যাচারপদ্ধতি।

২। সুত্রপিটক,—উপাসকগণের জন্য শাস্ত্রীয় পাঠ।

৩। অভিধর্ম্ম,—বৌদ্ধদর্শন।

(১০) Senart, Ind. Ant. xx. 160-1.

(১১) Ep. Ind. vol. iii, p. 142.

বর্ত্তমানকালে ত্রিপিটক অতি বৃহৎশাস্ত্র। পালি বিনয়পিটক পাঁচ [illegible] বিভক্ত ;—পারাজিক (প্রব্রজিক), পাসিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত), মহাবগ্‌গ, চুলবগ্‌গ ও পরিবারপাঠ। সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত। অভিধর্ম্ম ও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়, সাত খণ্ডে বিভক্ত। (১২)

ত্রিপিটক-সংগঠন ব্যতীত, সংহতি হইতে দেশ বিদেশে রীতিমত ধর্ম্ম-প্রচারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে ও মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রকাশ যে, নিম্নলিখিত দেশে নিম্নলিখিত প্রচারকগণ প্রেরিত হন,—

দেশ	প্রচারকগণের নাম
কাশ্মীর ও গান্ধার (কাবুল নদীর দক্ষিণ উপত্যকা),	মজ্‌ঝন্তিক
মহীশ (মহীশূর)	মহাদেব
বনবাসি (উত্তর কানাড়ার বৈজয়ন্তি)	রক্ষিত
অপরন্তক (? সিন্ধু বা উত্তর আফগানিস্থান)	যবন দেশীয় ধর্ম্মরক্ষিত
মহারট্ঠ (মহারাষ্ট্র)	মহাধর্ম্মরক্ষিত
যোনলোক (সিরিয়া ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্য)	মহারক্ষিত
হিমবন্ত (হিমালয়ের পাদপ্রদেশ)	মজ্‌ঝম
সুবর্ণভূমি (ব্রহ্ম বা মালয়)	সোন এবং উত্তর
সিংহল	মহিন্দ ইত্যাদি (১৩)

ক্রমশঃ।

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

২

গতবারে আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতসমালোচনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া প্রত্নতত্ত্বাদির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সহসা কোনও কথা বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বুঝি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দুই চারি কথা বলিয়াছি মাত্র। সুতরাং সে জন্য

(১২) Rhys David's Buddhism, pp. 18-21.

(১৩) Do. p. 227.

বোধ হয় আমাদিগকে দোষভাগী করিবেন না। এবার আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ ও শ্রীকবিজয় সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে চাহি; সেগুলি যে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা অকাট্য প্রমাণ, আমরা তাহা বলিতেছি না; প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত বা প্রমাণ আমরা অভ্রান্ত বা অকাট্য বলিয়া মনে করি না, কাজেই কি বলিয়া আমাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলি সাধারণকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে অনুরোধ করিব? তবে সেগুলি আপাততঃ আমাদের নিকট কতকটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা সেই সিদ্ধান্ত ও প্রমাণগুলিকে গ্রহণ করিয়া একবার সাধারণকে তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বলিতেছি। যদি কেহ গুরুতর প্রমাণবলে তাহার খণ্ডন করিয়া অন্য সিদ্ধান্ত স্থাপিত করেন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; আমরা প্রকৃত সত্য-সংস্থাপনেরই ইচ্ছা করিয়া থাকি। কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া, দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত প্রমাণের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করাকে আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্ত মনে করি না। অনুসন্ধান ও ভূয়সী গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মূল্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপাততঃ আমরা যে দুই একটি সিদ্ধান্ত কতিপয় প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, সাধারণে তাহার একটু বিচার করিলে আমরা যারপরনাই সুখী হইব।

যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, খৃঃ পূ ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সেই সময় হইতে উক্ত অব্দ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রমাণ রাজতরঙ্গিণী হইতে দিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন প্রাচীন ইতিহাস থাকে ত তাহা রাজতরঙ্গিণী, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অস্বীকার করেন না। সেই রাজতরঙ্গিণীর কথাটা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। একমাত্র সেই শ্রীকবিজয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। শ্রীকবিজয়কে আমরা অস্বীকার করি না; পরে সে কথা বলিব। রাজতরঙ্গিণী বলিতেছে,—

> "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
> কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ - ১ম ত রঙ্গ ৫১।"

অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দ্বাপরের শেষে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, রাজতরঙ্গিণী-

কার কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহাদের মতকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন ; তিনি বলেন,—

"ভারতং দ্বাপরান্তেহভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥"

এই কথা তিনি কেবল কল্পনাবলে বলিতে চাহেন না ; তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকাল কলির অতীতাব্দে যোগ করিলে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়,—

"লক্ষ্যাব্দিশত্যসংখ্যাং যর্থাণ্ সংখ্যায় ভূভুজাং।
ভুক্তাৎ কালাৎ কলেঃ শেষো নাস্ত্যেবং তদ্বিবর্জ্জিতাৎ॥"

রাজতরঙ্গিণীকারের কথা এখানে একটু খুলিয়া বলা ভাল। তিনি গোনর্দ্দ নরপতি হইতে কাশ্মীরের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। গোনর্দ্দ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকালের তালিকা তাঁহার জানা আছে, এবং তিনিও তাহা প্রদান করিয়াছেন। সেই গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। সুতরাং গোনর্দ্দের সময়নির্দ্ধারণের অনুসারে, কলির কয়েক শত বৎসর গত না হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে না। তাই তিনি বলিতেছেন যে, কলির যে অতীতাব্দ হইতে কাশ্মীরের রাজগণের বিবরণারম্ভ, তাহাতে তাঁহাদের রাজত্বকাল যোগ করিলে তবে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, গোনর্দ্দ পর্য্যন্ত রাজত্বকালের সংখ্যা কলির প্রথম হইতে হয় না, তাহার কয়েক শত বৎসর পর হইতে হয়, ইহাই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কহ্লন পণ্ডিত রাজত্বের তালিকা দ্বারা যে সময়ের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, তাঁহার প্রমাণটা কি একেবারে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিব, অথবা তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিব ? কোন্‌টি কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

রাজতরঙ্গিণীকার কেবল কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের মঘানক্ষত্রে অবস্থানের কথাটাও বলিয়াছেন,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥ ৫৬॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বসময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন ; ২৫২৬ বৎসর তাঁহার রাজ্যের শককাল। ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দের পর হইতে যুধিষ্ঠির

শক অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য্য। রাজতরঙ্গিণীকার পুরাণাদিতে উল্লিখিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথাটাও গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজের উপস্থাপিত কাশ্মীররাজগণের শাসনতালিকা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণের চেষ্টাও করিয়াছেন শকবিজয়ের দোহাই দিয়া কহ্লন পণ্ডিতের মতটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিতের মত আমরা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরাচার্য্যের উক্তির দ্বারা সমর্থন করিতেছি। সম্ভবতঃ, কহ্লন, বরাহমিহিরের গ্রন্থ হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও যুধিষ্ঠিরের শককালের কথাটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় সপ্তর্ষিচারনামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ ;
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥ ৩ ॥"

রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকের শেষে 'রাজ্যস্য' কথাটি আছে, এখানে তাহার স্থলে 'রাজ্ঞশ্চ' কথাটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; অর্থাৎ, যুধিষ্ঠির রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষা বৃহৎসংহিতার পাঠই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সাহেব বৃহৎসংহিতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই গ্রন্থ হইতে আমরা উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম। তিনি পরিশিষ্টে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পর I. O. Libraryর হস্তলিখিত একখানি বৃহৎসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই,—

"বর্ষসহস্রত্রিতয়ং শতমেকং সপ্ততির্নবাগ্রা চ।
শককালযাতমিশ্রং কলের্গতং ধর্ম্মপুত্রাত্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, কলি ও ধর্ম্মপুত্রের শককালের মিশ্রণ ৩১৭৯ বৎসর। আমরা বৃহৎসংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে পাইয়াছি যে, যুধিষ্ঠিরের শককাল ২৫২৬ বৎসর। তাহা হইলে, ৩১৭৯ হইতে ২৫২৬ বাদ দিলে, ৬৫৩ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং, ৬৫৩ কল্যব্দ হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে, কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হয়। আর্য্যভট্ট ও পরাশরের মতও প্রায় তাহাই। তবে সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে আর্য্যভট্টের মতে কলির ৬৬০ বৎসরে ও পরাশরের মতে ৬৬৬ বৎসরে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘার প্রথমে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কল্প, মন্বন্তর ইত্যাদির পরিমাণ হইতে সপ্তর্ষির গতিগণনা করিয়া সূক্ষ্মরূপে, ঐরূপ বিচারে উপনীত

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

...ত হয়; কাজেই এই সামান্য পার্থক্যে বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। কলহণ, রাজতরঙ্গিণীকার, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, পরাশর প্রভৃতির একই মত, বলা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণী ও বৃহৎসংহিতায় মত গ্রহণ করিলে খৃঃ-পূর্ব্বে ২৪৪৮ বৎসরে যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারিত হয়।

আমরা এতক্ষণ ইতিহাস ও জ্যোতিষের কথা বলিয়া আসিলাম। এক্ষণে ইহাদের সহিত পুরাণের বচনের কত দূর সামঞ্জস্য হয়, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

> "তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ। ৩৪॥
> যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
> বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥৩৫॥
> যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
> তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ ৩৬॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময়ে দিব্য দ্বাদশশতপরিমাণ কলি প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছে। যে সময়ে ভগবান বাসুদেব স্বর্গারোহণ করেন, সে সময়ে কলি উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলির আবির্ভাব হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পাদপদ্ম দ্বারা বসুন্ধরা স্পৃষ্ট ছিল, তত দিন কলি প্রবল হইতে পারে নাই। শ্রীধর স্বামী ৩৪ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ সন্ধ্যারূপ মতিক্রম্য স্বেন রূপেন প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ।" এখানে সন্ধ্যাশব্দে যুগের সন্ধ্যা নহে; কারণ, কলির সন্ধ্যা দিব্য ১০০ বৎসর, যাহা আমাদের ৩৬০০০ বৎসর হয়। এখানে সন্ধ্যাশব্দে আদ্যবস্থা। উক্ত আদ্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কলি প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং কলির যে-সিতাঙ্ক ২১৪ বৎসরমাত্র গত হইয়াছে, তাহা নহে। কলির কিছু অধিক সময়ই গত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। স্বামী ৩৬ শ্লোকের টীকায় আবার লিখিতেছেন যে, "পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে ভূমেঃ পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূর্ব্বমপি কলিঃ প্রবিষ্ট ইতি গম্যতে।" সুতরাং যুধিষ্ঠিরের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই যে কলির আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে তাহা কত পূর্ব্ব, ৩৬ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে পারে কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। ৩৬ শত বৎসর পূর্ব্ব স্থির করা যায় কি না, তদ্বিষয়েও আমরা কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের উক্ত অধ্যায়েই লিখিত আছে,—

> প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
> তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি। ৩৯।

অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, সেই সময়, নন্দের সময় হইতে, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে নন্দের সময়ের কত ব্যবধান, তাহাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৩২॥"

পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেককাল ১০১৫ বৎসর ব্যবধান। ভগবান বাসুদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতে কলি প্রবল হইল, কিন্তু তাহার রাজ্য বাড়িল কবে? না, তাহার ১০১৫ বৎসর পরে। সুতরাং তাহার আদি হইতে যে সময়ে সে প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ের ব্যবধান কি ৫।৬ শত বৎসর হইতে পারে না? এই সমস্ত শ্লোকগুলির বিচার করিয়া দেখিলে, রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের সহিত বিষ্ণুপুরাণের কোনও অনৈক্য হয় না। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের মত একই, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বরাহমিহির, রাজতরঙ্গিণী, এবং আর্য্যভট্ট ও পরাশর, সকলের মতেই খৃঃ পূ ২৪৪৮, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে, যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রমাণগুলি আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বোধ হয়, শ্রীকবিজয়ের সহিত সংঘর্ষ না ঘটিলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এতগুলি প্রমাণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন না। শ্রীকৃবিজয়ের যদি কোন সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমাদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলি সকলে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আমরা যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে খৃঃ পূর্ব্ব ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠিরের সময় বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে তাঁহার অব্দারম্ভ। বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকায় কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের পঞ্জিকাগণের মতে, যুধিষ্ঠিরের শক ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহার পর বিক্রমাদিত্যের শক আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্যের শকের পর শালিবাহনের শকারম্ভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরের শক, এবং সম্বৎ বিক্রমাদিত্যের ও শকাব্দ শালিবাহনের। কল্যব্দকে যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া অভিহিত করা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতেও ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বরাহমিহির, রাজতরঙ্গিণীকার প্রভৃতি তাহার খণ্ডন করিয়া কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে পৃথক করিয়াছেন।

তরঙ্গিণীকার যে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া অভিহিত করা ভ্রমের কার্য্য বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সাধারণতঃ সময়গণনার বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না; তবে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্ণয় করিতে হইলে ও তৎসময় হইতে কোনও গণনার প্রয়োজন হইলে, গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটে। ফলতঃ কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের পৃথক্ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়, ইহা জানা আবশ্যক।

বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত, এবং তাঁহাদের মতে কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। তাহা হইলে কলির ৩১৭৯ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। এখানে কলির ৪৯৯৯ বৎসর। ৩১৭৯ হইতে ৪৯৯৯ পর্য্যন্ত ১৮২০ বৎসর ব্যবধান। এই ১৮২০ বৎসর শকাব্দের পরিমাণ। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকাকারগণের ও অন্যান্য অনেকের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাঁহারা কল্যব্দকে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও সম্বৎকে বিক্রমাদিত্যের অব্দ বলিয়া থাকেন। বরাহমিহিরের টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ। যুধিষ্ঠিরের অব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ প্রচলিত হইলে, তাঁহার মতে, শকাব্দই সেই অব্দ হয়। কারণ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হইলে, এবং তাহা ২৫২৬ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে, তাহার পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। কাজেই শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের অব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী বিক্রমাদিত্যের সময়। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। সময়ান্তরে তাহার সমালোচনার ইচ্ছা রহিল। আমাদের মতে খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হয়। এক্ষণে গ্রীকবিজয়সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়। এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস পালীবোথ্রা নগরীস্থ সান্দ্রাকোটাস রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উক্ত পালীবোথ্রা গঙ্গা ও ইরেনেবসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই প্রমা-

পের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যে, গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু বা শোণের সঙ্গমস্থল পাটলীপুত্রনগর চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য-বংশীয়, এবং তাঁহার সময়েই আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সার উইলিয়ম জোন্স প্রথমতঃ এই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি সম্ভবতঃ পুরাণ ও মুদ্রারাক্ষসাদি পাঠ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রের কথা অবগত হন। এবং আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কথাও তাঁহার জানা ছিল। সেই জন্য তিনি মিগাস্থিনিসের উল্লিখিত সাণ্ড্রাকোটাস, পালীবোথ্রার সহিত চন্দ্রগুপ্ত ও পাটলীপুত্র প্রভৃতি মিলাইবার চেষ্টা করেন।* মিগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে সাণ্ড্রাকোটাস, পালী-বোথ্রা, ইরেনেবস্ প্রভৃতি কয়েকটি কথা ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের বিবরণের আর কিছুই জানা যায় না, এবং তিনিই যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহাও বুঝা যায় না। সাণ্ড্রাকোটাস যদি চন্দ্রগুপ্তই হন, তাহা হইলে তিনি যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, ইহার প্রমাণ কি? সার উইলিয়ম জোন্স কেবল মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্র-গুপ্তের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আরও চন্দ্রগুপ্ত যে ভারতের সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সার উইলিয়ম জোন্সের সময় তাহার আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অসাধারণ

---

* নিম্নে সার উইলিয়ম জোন্সের উক্তির কিয়দংশ প্রদান করা যাইতেছে,—

"I can not help mentioning a discovery, which accident threw in my way......To fix the situation of that *Palibothra* which was visited and described by Magesthenés, had always appeared a very difficult problem,...We could not confidently decide that it was *Pataliputra*, though names and most circumstances nearly correspond, because that renowned capital extended from the confluence of the *Sone* and the *Ganges* to the city of *Patna*, while *Palibothra* stood at the junction of the *Ganges* and *Erannobous*.......But this only difficulty was removed, when I found in a classical sanskrit near 2000 years old, that *Hiranyabahu* which the Greeks changed into *Erannobous*, was in fact another name for the *Sone* itself......This discovery led to another of greater moment, for *Chandra Gupta*, who from a military adventurer, became like *Sandracottus*, the sovereign of upper Hindustan, actually fixed the site of his empire at *Pataliputra*, where he received ambassadors from foreign princes, and was no other than that very *Sandracottus* who concluded a treaty with *Seleucus Nicator*."—Sir William Jones in Asiatic Researches, IV. 10 11. সার উইলিয়ম জোন্সের লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহাকে এই আবিষ্কার করিতে [illegible]-কল্পনা করিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায় ও মুদ্রাদির আবিষ্কারে আরও দুই এক জন চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। এবং তাঁহারাও যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যদি সাণ্ড্রাকোটাসকে চন্দ্রগুপ্ত ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, যখন মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন কথাই মিগাস্থিনিস হইতে পাওয়া যায় না, তখন তিনি অন্য চন্দ্রগুপ্তই বা না হইবেন কেন? বরঞ্চ তাঁহার বিবরণ হইতে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহই উপস্থিত হয়। মিগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উক্ত দরবার সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু সেই দরবারে চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী যে এক জন ছিলেন, যাঁহার প্রসাদবলে চন্দ্রগুপ্ত মগধেশ্বর বা ভারতেশ্বর হইয়াছিলেন, সে চাণক্যের কোন প্রসঙ্গই দেখিতে পাই না কেন? মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা লিখিত হইলে যেখানে চাণক্যের কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায় না, সেখানে সে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় কি না, ইহাতে সন্দেহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং মিগাস্থিনিস মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের দরবারে যান নাই, তিনি অন্য কোনও চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গিয়া থাকিবেন। আমরা যদি গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দরবারে তাঁহার উপস্থিতির কথা বলি, তাহা হইলে আপত্তি কি? অবশ্য সে বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক।

মিগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থল পাটলীপুত্র নগরের রাজা চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন। এবং তাঁহার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২০ বৎসরের কিছু অল্প বা অধিক। তাহা হইলে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে,—

(১) গুপ্ত বংশের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল।

(২) গুপ্ত বংশের চন্দ্রগুপ্তও সম্রাট ছিলেন।

(৩) গুপ্ত বংশের রাজত্ব খৃঃ পূঃ ৩২০ বৎসরের কিছু কম বা বেশী।

আমরা উক্ত বিষয়গুলি যথাসাধ্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) গুপ্তবংশের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; পরে তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলীপুত্র বা পাটনায় গুপ্তবংশীয়দেরও রাজধানী ছিল। স্মিথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসা-

ইটীর পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—"If a choice must be made, I should be inclined to fix upon Pataliputra (Patna) as the head quarters of the eastern dominions of the Gupta Kings."

এই সম্বন্ধে তিনি টিপ্পনীতেও অন্যান্য পণ্ডিতের যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও প্রদত্ত হইল। "Wilford long ago fixed on Patna as the Gupta Capital, but in doing so was guided by a mistaken notion that Padmabati was an equivalent of Pataliputra. (Wilson's Vishnu Purana, 4th, edn, P. 480, note 70). I find that the late Mr. Wilton Old have also speaks of the Gupta dynesty, the Capital of which was in Magadha or Bihar, the city of Pataliputra or the modern Patna" (Hist. and state. Memoir of the Ghazipur District, Part I. P. 38). Ayodhya was probably one of the Chief cities of the Guptas." ইহার পর ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে তিনি স্পষ্ট করিয়াই পাটলীপুত্রকে গুপ্তবংশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "But, I am still of opinion that Pataliputra has the best claim to be considered the Gupta capital." স্মিথ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখাইলাম যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পাটলীপুত্রই গুপ্ত বংশের রাজধানী হইতেছে। এক্ষণে আমাদের পুরাণ হইতেও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, মগধদেশীয় গুপ্তেরা অনুগঙ্গ প্রয়াগে রাজত্ব করিবেন। "অনুগঙ্গপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।" (৪ অংশ; ২৪ অ; ১৮ শ্লোক) বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে,—

"অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।

এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥ ৩৭ অ, ৩৭৭।

দেখা যাইতেছে যে, গুপ্তবংশীয়দের রাজধানীও মিগাস্থিনিসের পালীবোথ্রা বা পাটলীপুত্র।

(২) এক্ষণে দেখা যাউক, মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তও ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন কি না? গুপ্তবংশের দুই জন চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাস বলিয়াই আমরা অভিহিত করিতে চাহি। মুদ্রাবিচারে গুপ্তবংশের রাজগণের যে তালিকা স্থির হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ

জানা যায় (১) মহারাজা শ্রীগুপ্ত (২) মহারাজা শ্রীঘটোৎকচ, (৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত। ইহার পর হইতে সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিতে দেখিয়া অবশ্যই ইহা বোধ হয় যে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুপ্তরাজগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ও সম্রাটপদবাচ্য ছিলেন। এবং বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জ প্রদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের সহিত যে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষণ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সহিতও তাহা ঘটিতে পারিত। অতএব মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তও যে ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

(৩) এক্ষণে গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় খৃঃ পূঃ ৩২০ বা তাহার কিছু কম বেশী হয় কি না, ইহাই আমাদিগকে প্রমাণিত করিতে হইবে। গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্মিথ সাহেবের মতে ১৬০। ১৭০ খৃঃ অব্দ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বের আরম্ভ হয়। ওল্ডেনবর্গ প্রভৃতি ৩১৮। ১৯ খ্রীঃ অব্দ উক্ত বংশের রাজত্বকালের আরম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৪০০ খৃঃ অব্দ গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের কাল। মিষ্টার টমাস শকাব্দকে গুপ্তবংশের কাল বলিয়া অভিহিত করেন। লাসেন সাহেব বলেন, সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা গুপ্তবংশের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ হইতে পারে, লাসেন সাহেবের মতে, ইহাও স্থির করা যায়। অতএব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের সময় নির্ণীত হয়। আনুমানিক সময়নির্দ্ধারণে কিরূপ পার্থক্য হয়, সাধারণে ইহার বিচার করিবেন। এক্ষণে আমরা যদি ঐরূপ আনুমানিক সময়নির্দ্দেশের চেষ্টা করি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত একবারে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের মতে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, অর্থাৎ, তাঁহার সময় খৃঃ পূঃ ৩২১ বৎসর। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া লইলে আমাদের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক

হয় বটে, কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ই গ্রীকবিজয় হইয়াছিল, বলিতে চাহি। কারণ, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করায় গুপ্তবংশের মধ্যে তিনিই যে পরাক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহার পর হইতে সকলেই উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাসও পরাক্রমশালী ছিলেন, এই জন্য আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাস বলিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাহা বলিলে আমাদের প্রমাণ আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩২৩ খৃঃ পূঃ ধরা যায়, তাহা হইলে, তালিকানুসারে তিনি তৃতীয় পুরুষ হওয়ায়, তাহার ৬০।৭০ পূর্ব্ব হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভকাল ধরা যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রবংশের পর গুপ্ত সম্রাটগণকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা প্রথমতঃ কোন্ সময়ে অন্ধ্রবংশের রাজত্বের শেষ হয়, তাহাই দেখাবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা পৌরাণিক মতেই তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক মতের রাজত্ব-পরিমাণ ধরিয়া লইয়াছেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তে পৌরাণিক মতেরই অনুসরণ করিতেছি। বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ, যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অন্ধ্রবংশের রাজত্বশেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা সেই জন্য তিন পুরাণের মতই প্রদান করিয়াছি।

বংশের নাম	বিষ্ণুপুরাণ	বায়ুপুরাণ	মৎস্যপুরাণ
পরিক্ষিতের সময়	৬৫৩ কল্যব্দ	৬৫৩	৬৫৩
পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান	১০১৫	১০৫০	১০৫০
নন্দবংশ	১০০	১০০	১০০
মৌর্য্যবংশ	১৩৭	১৩৭	১৩৭
শুঙ্গবংশ	১১২	১১২	১১২
কণ্ববংশ	৪৫	৪৫	৪৫
অন্ধ্রবংশ	৪৫৬	৪৫৬	৪৬০
	২৫১৮	২৫৫৩	২৫৫৭

উপরে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে কত কল্যব্দে অন্ধ্রবংশের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। ৩১০১ কল্যব্দ খৃষ্টের জন্মকাল। তাহার

৩২১ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকবিজয় হইলে, ২৭৭৯ কল্যব্দ গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময় বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে, বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্রবংশের ২৬১ বৎসর পরে, বায়ুপুরাণের মতে ২২৬ বৎসর পরে ও মৎস্যপুরাণের ২২২ বৎসর পরে, চন্দ্রগুপ্তের সময় স্থির হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উক্ত বংশের পঞ্চম। তাহা হইলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্ততঃ ৬০।৭০ পূর্ব্ব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, গুপ্তবংশের সময় ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীকবিজয় ধরা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে, অন্ধ্রবংশের পর হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভকাল ২০০ বৎসরের কম হইতে আর ১৫০ বৎসর ব্যবধান হইয়া উঠে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরিলে ব্যবধান অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে। যদি আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, বলি,—তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ আপত্তি করিতে পারেন না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সান্ড্রাকোটাস ধরিলে, অন্ধ্রবংশের ও গুপ্তবংশের মধ্যে যে একটু ব্যবধান থাকে, তাহা ২।৪ দিন পরে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কারণ, বর্ত্তমান গুপ্তবংশের তালিকা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আবিষ্কার হইলে সে ব্যবধানটুকু অনায়াসেই পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় যখন গ্রীকবিজয়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্যবধানটুকু একটু অধিক হইতেছে, এবং তাহাও পূর্ণ করিতে ২।৩ জনেরও অধিক অনাবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাটের আবশ্যক হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু অন্ধ্রবংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের একটু ব্যবধান রাখিতে চাহি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশকে আনিয়া ফেলেন, আমরা তাহা ইচ্ছা করি না। পুরাণাদিতে অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশের উল্লেখ নাই। অন্ধ্রবংশের পর নানা স্থানে নানা বংশের কথা লিখিত আছে। যদি অন্ধ্রবংশের পর পর সেই সমস্ত বংশের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে গুপ্তবংশীয়েরা প্রায় আমাদের সমসাময়িক হইয়া উঠেন। সুতরাং কেহ যেন পুরাণাদিতে উল্লিখিত অন্ধ্রবংশের পর যে যে বংশের উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজত্বকাল পর পর ধরিয়া গুপ্তবংশের সময় নির্দ্দেশ না করেন। পুরাণাদির উক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, অন্ধ্রবংশের পরে ভারতে এমন কোন সম্রাট ছিলেন না, যাঁহাদের রাজ্য বহুদূরবিস্তৃত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি বংশের

ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বংশ রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে গুপ্তবংশ অন্যতম। উক্ত গুপ্তবংশ ক্রমে রাজ্যবিস্তার করিয়া ভারতের সম্রাট হন। তাঁহারা কদাচ অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরে নহেন। পুরাণাদিতে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সেই জন্য আমরা অন্ধ্রবংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ পর্য্যন্ত কিছু ব্যবধান রাখিতে চাহি। এবং গুপ্তরাজগণের মধ্যে প্রথমেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট দেখিতে পাই বলিয়া, তাঁহাকে পরাক্রমশালী মনে করিয়া, তাঁহারই সময় গ্রীক্‌বিজয় নির্দ্দেশ করিতে চাহি। সাধারণে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক-বিজয় হওয়া সম্ভব।

যে যে প্রমাণের ভার আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য তাহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা বিচার করিয়া যথা-কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মূলমন্ত্র গ্রীকবিজয় যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় অব্দনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কি বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে? এক্ষণে দিন দিন অশোকাদির যে সকল শিলালিপির আবিষ্কার হইতেছে, তাহার দ্বারা যে সময় নির্ণয় হইতেছে, তাহাও গ্রীকবিজয়ের সাহায্যে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে অথবা অন্যান্য রাজার তাম্রশাসনাদিতে যে সমস্ত লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি সেই সেই রাজার রাজত্বের অমুক অমুক বৎসরে খোদিত বলিয়া দেখা যাইতেছে। তাহার সহিত খৃষ্টাব্দ মিলাইতে গেলে, সেই গ্রীকবিজয় চাই। এক্ষণে আমরা যুক্তি ও প্রমাণের বলে সেই গ্রীকবিজয়কে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে অপসারিত করিয়া গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আনিয়া উপস্থিত করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণতঃ যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাদের সেই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সাধারণকে বিচার করিতে বলিতেছি। অন্ততঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রমাণের উপর একতরফা ডিক্রী না দিয়া যদি দোতরফা শুনিয়া তাঁহারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতিতত্ত্ব।

আসামের অতি-ঐতিহাসিক জাতি।

আসাম যদিও আমাদিগের সন্নিহিত প্রদেশ, তথাপি প্রতীচ্য সভ্যতার আলোকে এখনও তাহার রহস্যান্ধকার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। এখনও আসাম সম্বন্ধে আমাদিগের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। প্রতীচ্য বণিকদিগের অদম্য উৎসাহে—'চা'র কৃষির কল্যাণে আসামের বনভূমি এখন রম্যকাননে পরিণত হইয়াছে। আসামে এখনও অতিপ্রাচীন দেবমন্দির ও বিস্তৃত সরোবরসমূহ পরাক্রমশালী প্রাচীন নৃপতিদিগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। মগদিগের উৎপাতই আসামের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এ. এস্. গুহ মহাশয় কোনও ইংরেজীপত্রে আসামের প্রাচীনজাতি সকলের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। ব্রহ্মপুত্র নদের পূতবারিবিধৌত আসাম প্রদেশ প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিচূড়া হইতে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর পর্য্যন্ত সকলই সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। কোথাও পর্ব্বতগাত্রপ্রবাহিত জলপ্রপাতের মৃদু কলনাদ; আবার তাহারই পার্শ্বে বহুমূল্য-বৃক্ষরাশি-সমাকুল অরণ্যানীর স্নিগ্ধ ছায়ায় ঋক্ষ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর গম্ভীর গর্জ্জন। এই প্রাকৃতিকবৈষম্যময় প্রদেশ অতি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে নানা জাতির আবাসভূমি। এই জাতিসমূহের ভাষা ও শাসনপ্রণালী বিভিন্নপ্রকার। আসামের গ্রীষ্মপ্রধান জনাকীর্ণ প্রান্তরে সাধারণতঃ কৃষিজীবীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু, এবং অপেক্ষাকৃত সুসভ্য। অহিফেনসেবনে যদিও ইহাদের জাতীয় জীবন উত্তরোত্তর নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বাণিজ্যব্যবসায়ী ইংরেজের কৃপায় এখন আর তাহাদিগের আলস্যে দিন কাটাইবার তথায় উপায় থাকিতেছে না। অন্য দিকে দক্ষিণাংশের যাযাবর পার্ব্বত্য জাতিগুলি যুদ্ধপ্রিয়; ইহারা স্ব স্ব দলপতির আজ্ঞাধীন। উত্তরে ও পূর্ব্বে কতকগুলি নিতান্ত অসভ্য পার্ব্বত্য শিকারী জাতির বাস। ইহারা সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ ও রক্তপাত লইয়া ব্যস্ত।

উপক্রমণিকা।

লেখকের মতে, "আসাম" আধুনিক নাম। আর্য্যদিগের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বে এ প্রদেশকে কি নামে অভিহিত করা হইত, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তথাপি তৎসাময়িক অধিবাসী জাতিগণের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। এতদ্দেশীয় উচ্চবর্ণের অধিবাসিগণই বাস্তবিক আর্য্যপ্রভাবে প্রভাবিত; নিম্ন বর্ণের অধিবাসিগণ হিন্দু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে বটে, কিন্তু পানাহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রাচীন বর্ব্বর নিয়ম হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পা-

অনার্য্য জাতি।

নাই। লেখক বলেন, শূকরমাংস ও আসব-ব্যবহার, এবং স্বামী অথবা স্ত্রীর পরিবর্তন ইহাদের [illegible] অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক বর্ষাবিকরণে "পত্নী-অপহরণের" [illegible]ার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং আইন ও উকীলগণের কৃপায়, ইহার হ্রাস হওয়া দূরে [illegible] বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও মরুস্থলে হিন্দুধর্ম্মের [illegible]রাম আজও প্রবেশ করে নাই। সে সকল স্থলে প্রাচীন রীতি-নীতি [illegible] হইতে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিদ্যমান। এই মৃত্যুশয্যাশায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ [illegible] দাসত্বপ্রথার নামান্তরিত কুলী-ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহু লোককে প্রলোভিত করিয়া আসামে লইয়া আইসে; এবং কালে তাহারা এতদ্দেশেই আপনাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়।

আসাম অধিকার।

এই অনার্য্য জাতিগণ অতি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবাসিগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় আপনাদের অধিকার-বিস্তার করে। সময়ে সময়ে পর্ব্বত্য জাতিগণও ইহাদিগের নিধন করিয়া রক্তপিপাসার শান্তি করিয়াছে। লেখকের মতে, এই অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অধিবাসিগণের ইতিহাস প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে ভাষাবিৎ এবং মানবজাতির ইতিহাসবেত্তৃগণ একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নেগ্রিটো জাতি।

লেখক বলেন, সর্ব্বপ্রথমে নেগ্রিটো জাতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, আকৃতি খর্ব্ব ও কৃশ; ঘন কেশ কুঞ্চিত, নাসিকার অগ্রভাগ অত্যধিকমাংসল চক্ষু বিস্ফারিত; এবং মুখ শ্মশ্রুহীন। ইহারা যাযাবর জাতি। ইহাদের সাময়িক বাসস্থান মধুমক্ষিকার চক্রের ন্যায় বহুপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। ইহারা বহু ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীর, এবং বহু ভগ্নী মিলিয়া এক স্বামীর পাণিগ্রহণ করিত। সন্তানগণ মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। লেখক বলেন, এ প্রথা অদ্যাবধি ভুটিয়া জাতির মধ্যে বিদ্যমান, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে গারো ও খাসিয়া জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সফলা এবং মিরি জাতির মধ্যে যাহারা পৃথক স্ত্রী ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহারা বহু ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক স্ত্রীর মূল্য সংগ্রহ করে। এই নেগ্রিটো জাতির ভাষা বহুবর্ণবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর।

"মন-আনাম" জাতি।

এই নেগ্রিটো জাতি দক্ষিণ চীন হইতে আগত অন্য এক জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়। ভাষাবিদেরা ইহাদের "মন-আনাম" নামকরণ করিয়াছেন। আকৃতি খর্ব্ব হইলেও নেগ্রিটো জাতির ন্যায় ইহারা কৃশ নহে। ইহাদের চুল অত্যন্ত পাতলা; চক্ষু ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধনিমীলিত; নাসিকা উন্নত নহে; মুখ চ্যাপটা রকমের। ইহারা অত্যন্ত বৃহৎ গৃহের নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। এই গৃহ কখন কখন ১০০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট উচ্চ হইত, এবং বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। অবিবাহিতদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইত। লেখক বলেন, এরূপ গৃহ নাগা, আবর ও থামাটি জাতির মধ্যে আজিও বিদ্যমান। লালং ও গারো জাতির মধ্যেও এরূপ গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি অপ্রচলিত নহে। এই সকল গৃহের সংলগ্ন বৃহৎ বারান্দায় বসিয়া কেহ বা [illegible] করে, কেহ বা অন্যান্য কার্য্য করে। আবর জাতির সমুদয় অবিবাহিত যুবক কতকগুলি

বিবাহিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন করিত। ভিন্ন জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকলকে রক্ষা করিত। এই "মন-আনাম" জাতি কৃষিব্যবসায়ী ছিল। ইহারা পর্ব্বতগাত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃহৎ বৃক্ষাদির ছেদন করিয়া, ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিত। তার পর সেই জমিতে চাষ করিত। এইরূপ প্রথাকে "ঝুনিং" বলিত। লেখক বলেন, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পর্ব্বতের তৃণবৃক্ষাদিহীন দেহ বহু শতাব্দীব্যাপী "ঝুনিং" প্রথার ফল। গারো, বোদা ও খাসিয়া জাতির মধ্যে ইহাদের প্রভাব আজও দৃষ্ট হয়।

এই "মনআনাম" জাতি তিব্বত হইতে আগত আর এক জাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। ইহারা হিমালয়ের উত্তর দিয়া প্রথমে পূর্ব্ব দিকে গমন করে, এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসামে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাসিয়া পর্ব্বত ভিন্ন "মনআনাম" জাতির অধিকৃত সমুদয় প্রদেশই ইহাদের করতলস্থ হয়। ১৮৭৪ সালে সমগা-ভটিং নামক স্থানের নাগা অধিবাসিগণ কর্নেল জনষ্টোনকে বলিয়াছিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা উত্তরপূর্ব্ব হইতে আগত, এবং তাহারা সাত পুরুষ তথায় বাস করিতেছে। তাহারা গ্রামের স্থাননির্ব্বাচনের সময় সেই স্থানে অনেক হস্তিদন্ত ও হস্তির কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তিব্বতীয় জাতির আকৃতি অতিশয় বৃহৎ, এবং কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর। ইহাদিগের ভাষা অনুচ্চার্য্য-ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ভাষায় অনটন হইলে ইহারা আকার ইঙ্গিতে কার্য্য সমাধা করিত।

তিব্বতীয় অনার্য্যগণ।

অতঃপর ঐতিহাসিকযুগে আর্য্যদিগের আসাম-অধিকার সম্বন্ধে লেখক ভবিষ্যতে কিছু লিখিবার আশা দিয়াছেন। লেখক বলেন, আধুনিক আসাম-নিবাসিগণ এই পরম্পরাগত নানাবিধ জাতির মিলনসম্ভূত। নাগা, লুসাই, বোদো প্রভৃতি জাতির ভাষায় ভারতীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাগা ও বোদো জাতির মধ্যে সর্ব্বনাম শব্দগুলি তিব্বতীয়, এবং "মনআনাম"-প্রভাবাপন্ন। লুসাইগণ আপনাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ভাষা ত্যাগ করে নাই। এই সকল জাতির ভাষা ক্রমে মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাষার মূলে চাইনিস্ ও তিব্বতীয় শব্দ দেখা যায়।

আসামী ভাষা।

প্রাচীন অধিবাসীদিগের আমোদ প্রমোদও তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের ন্যায় বর্ব্বরতা-মিশ্রিত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে "মস্তক শিকারের" প্রথা প্রচলিত ছিল। নাগা ও কুকীদের মধ্যে ইহা আজও দৃষ্ট হয়। যত দিন মানুষের মস্তক ছেদন করিতে না পারিত, ততদিন কেহ সম্মানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত না, এবং এই স্ত্রীজনোচিত কাপুরুষতার নিমিত্ত সে সুন্দরীগণের কৃপার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নরঘাতকগণ গৌরবচিহ্নস্বরূপ একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। নরহত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন নাগাকে কৌড়ি-খচিত তরবারি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। এই নরহত্যাজনিত সম্মানলাভের আশায় ইহারা গুপ্তভাবে পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিকের প্রাণবধ করিত, এবং কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকেও বধ করিত। হত্যা করিয়া বংশধর-

আমোদ প্রমোদ।

খণ্ডিত নরমুণ্ড হস্তে যখন ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিত, তখন সুন্দরীগণ তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিত। কঙ্কালগুলি দলপতি অথবা হন্তার গৃহে রক্ষিত হইত। ইংরেজ-রাজ এই নৃশংস প্রথার বিনাশসাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উল্কি পরিয়া দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে ইহারা বিশেষ যত্নবান। সিংকো-জাতীয় পুরুষগণ সামান্য রকম চিত্র করে। রমণীগণ পদদ্বয় ও বক্ষঃস্থল চিত্রিত করে। "আও নাগা" জাতির পুরুষগণ বক্ষঃস্থলে মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিয়া নরহত্যার সংখ্যা নির্ণয় করে।

স্বজাতিপ্রেম ইহাদের এক বিশেষত্ব। আবর জাতির বিবাহিত যুবকগণ বিবাহান্তে পৃথক বাসগৃহের নির্ম্মাণ করে। এই গৃহনির্ম্মাণে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ তাহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করে। অনেক সময় ইহারা পীড়িতদিগের জন্য শস্যের উৎপাদন করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা এই স্বজাতিপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সাহায্য করে বটে, কিন্তু কাহারও আজ্ঞাপালনে সম্পূর্ণ অসম্মত। ইহারা কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। লেখক বলেন যে, এই সাধারণতান্ত্রিক ভাবের অভ্যুদয় কৌতূহলাবহ।

অতি প্রাচীনকালে যখন অসভ্যজাতিগণ সম্প্রদায়বদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, তখন গৃহস্বামীই তাহার সন্তানসন্ততির একমাত্র প্রভু বলিয়া গণ্য হয়। ক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া যখন স্থানে স্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়, তখন প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরগণ এই দলপতিকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। শাসনপ্রণালীও বিশৃঙ্খল হয়। পর্ব্বতীয় মিরি জাতি তাহাদের সাধারণতন্ত্রের রক্ষণের জন্য দলপতির উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত, এ বিষয়ে কেহ দলপতিকে কোনও প্রকার সাহায্য করিত না। স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিত। দলপতির বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না।

নাগা জাতির মধ্যে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন ও উহার রক্ষণার্থ বাহুবলই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। দলপতিগণ কোন "রাজস্ব" আদায় করিত না, তাহার আদেশ সকলের মনোমত না হইলে পালিত হইত না। এই শ্রেষ্ঠপদে বংশানুক্রমে পিতার পরে পুত্র নির্ব্বাচিত হইত না। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত। ইহারা অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ। সার জেম্‌স্ জনষ্টন বলেন যে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত দুই পক্ষে সমসংখ্যক নরহত্যা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির আশা একেবারেই নাই। মজুমা ও সেফেমা বিবাদ করিতেছে। মজুমা সেফেমার পক্ষীয় পাঁচ জনকে হত্যা করিয়াছে, সেফেমা মজুমার পক্ষের চার জনকে হত্যা করিয়াছে। সেফেমা বলিবে, "আর এক জনকে হত্যা করিয়া তার পর সন্ধি করিব।" হয় ত একদিন সেফেমা সুবিধা পাইয়া এক জনের স্থানে মজুমার পক্ষীয় দুই জনকে হত্যা করিয়া বসিল। অমনি মজুমা যে পর্য্যন্ত না সেফেমার আর এক জনকে হত্যা করিবে, সে পর্য্যন্ত সন্ধি হইবে না। কাজেই যুদ্ধ পরিসমাপ্তি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নাগা জাতির সাধারণতন্ত্র।

কালক্রমে এই সাধারণতন্ত্র উন্নতি লাভ করিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ

নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহ পরস্পরের মধ্যে সখ্যস্থাপন করিল। শাসনপ্রণালী স্থিরীকৃত নিয়মের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। আবর জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাদের শাসনপ্রণালী হইতেই উল্লিখিত সত্যের প্রতিপাদন হয়। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব নিয়মপালনে যত্নবান ছিল, এবং বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত। এই সমস্ত সভায় প্রাচীনগণ সভাপতি হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর অধিবাসিগণ বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিয়া আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি করিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি করিয়া "যোদাং" অর্থাৎ সহর থাকিত।

আবর জাতির সাধারণতন্ত্র।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মোড়লেরা রাজনৈতিক আন্দোলনের নিমিত্ত প্রত্যহ একবার করিয়া সমবেত হয়, এবং সাধারণের ব্যয়ে প্রচুরপরিমাণে মদ্যপান করে। সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচারিত হয়। মোড়লেরা কোন উপহার লইতে পারে না। প্রকাশ্য স্থানে যে সমস্ত উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা তাহাদের সাধারণতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পক্ষেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত। লেখক বলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মোড়লসভার প্রাণদণ্ড অথবা কোনরূপ শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহা হইতে ক্রমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শাসনপ্রণালীতে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কোন কোন স্থলে এক জন অথবা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া নিজহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করে।

খাসিয়াদিগের মধ্যে গ্রামের ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণই শাসনভার গ্রহণ করিত। কোন কোন খাসিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশগত দলপতি নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইহারা গ্রামের মোড়লদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও সাধারণের মত অগ্রাহ্য হইত না। ইচ্ছা করিলে ইহারা দলপতিকে পদচ্যুত করিতে ও মোড়লদিগকে দণ্ডিত করিতে পারিত। সাধারণের ব্যয়ে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইত। দলপতিগণের কারারুদ্ধ করিবার এবং শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা ছিল। আবর জাতির বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ইহারাও পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত। ইংরেজগণ খাসিয়া আক্রমণ করিলে ইহারা তিরুৎ সিংহের অধিনায়কত্বে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

খাসিয়া রাজতন্ত্র।

জীবনচরিত।

অধ্যাপক বুলার।

প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগিগণের নিকট হোফ্রাথ জোহন জিওর্গ বুলারের নাম সুপরিচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে সুইজারলাণ্ডে কনষ্টান্স হ্রদে নৌকা-ডুবিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে বোধ হয় তাহা বিদিত আছেন। বিগত এপ্রেল মাসের "এথিনিয়ম" পত্রে মিঃ সিসিল বেণ্ডাল তাঁহার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হানোভার প্রদেশে বারষ্টেল নামক স্থানে বুলার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লুথার-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং স্বীয় গ্রামে ধর্ম্মযাজকতা করিতেন। প্রথমে হানোভারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুলার বিখ্যাত গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায় প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক বেনফির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বুলারের তীক্ষধী-শক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, তদীয় অধ্যাপকের আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় ছিল। তথায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি তিন বৎসর পারিস, লণ্ডন ও অক্‌সফোর্ডে প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথি সকল পাঠ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বুলার উইণ্ডসর কাসলের রাজকীয় পাঠাগারে কোনও কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার-প্রণীত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" নামক পুস্তকের নির্ঘণ্ট (index) নির্ণয়ে গ্রন্থকারকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে উক্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় ১৮৬২ অব্দে বোম্বাই শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। এ দেশে আসিয়া তিনি প্রথমে বোম্বায়ের এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদলাভ করেন। পরে গুজরাট প্রদেশের স্কুলসমূহের ইনস্‌পেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি যখন এই শেষোক্ত কার্য্যগ্রহণ করেন, তখন গুজরাট প্রদেশে সাত শত বিদ্যালয় ও সেই সকল বিদ্যালয়ে ৪৭০০০ ছাত্র ছিল। এ দেশের কার্য্য হইতে তাঁহার অবসরগ্রহণের সময় গুজরাট প্রদেশের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৩৩ ও ছাত্রসংখ্যা ১০১২৭০ হইয়াছিল।

শিক্ষালাভ ও ভারতে আগমন।

অধ্যাপক বুলার ও কেলহরণ প্রভৃতি কৃতবিদ্যগণের চেষ্টায় ও গবেষণায় বোম্বাই-বিভাগস্থ লোকেরা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা সংস্কৃত বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদের মতে, সংস্কৃতশিক্ষার জন্য এরূপ ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের কোনও আবশ্যকতা নাই ;—দেশীয়েরা নিজ চেষ্টায় এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে।

সংস্কৃতানুরাগ।

শিক্ষাবিভাগীয় কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণকালে বুলার অনেক প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ করেন, এবং দেশীয় পাঠাগারগুলির পুস্তকাবলির একটি সূচী প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ অব্দে কাশ্মীরভ্রমণসময়ে তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যসংক্রান্ত অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হয়। অবশেষে ১৮৮০ অব্দে এ দেশ হইতে অবসর লইয়া ইয়ুরোপে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ভায়েনা নগরীতে সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক বুলারের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে হিন্দু আইনবিধির সংক্ষিপ্তসার, সুন্দর ভূমিকা সহ মনুর অনুবাদ, আপস্তম্ব ও অন্যান্য বিধিকারগণের মূল অনুবাদ, বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তকের সংকলনে বোম্বাই আসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর রিচার্ড ওয়েষ্ট তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সংস্কৃত আভিধানিক গ্রন্থের মূল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ও অন্যান্য অনেক পুস্তক প্রকাশ করেন। অনেক সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইত। তন্মধ্যে "ভায়েনা ওরিয়েণ্টাল জর্ন্যাল" ও "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি" পত্রের প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার "ইণ্ডিয়ান

ষ্টডিজ," নামক পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত। এতৎসম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণের সহজবোধ্য হইবে বলিয়া ইহা ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে।" "এন্সাই-ক্লোপিডিয়া অব্ ইণ্ডো-এরিয়ান রিসার্চ্চ" নামক পুস্তকে তাঁহার আজীবন অনুসন্ধানের ফল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছিল। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ও সহযোগী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিকতত্ত্বনিরূপণে নিযুক্ত ছিলেন। সেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বিবরণ সাধারণে প্রকাশিত হইত। কিন্তু হায়! যে মহতী ধীশক্তি এই অনন্যসাধারণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, নিয়তিবলে তাহা অনন্তকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

হারাধনের বট।

যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে খরস্রোতা মধুমতীর তীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তাহার চিক্কণশ্যামপত্রবহুল বহু শাখা বিস্তার করিয়া আপনার মহিমাগর্ব্বে গর্ব্বোদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে যেখানে কুলকামিনীগণের স্নানের ঘাট ছিল, তাহার উপরেই এই বটবৃক্ষ অবস্থিত;—এই বৃক্ষতল দিয়াই ঘাটের পথ ছিল। এখন সে ঘাট পরিত্যক্ত;—এখন আর কুলকামিনীকুল সে ঘাটে জলে কলস ভাসাইয়া মধুমতীর নির্ম্মল নীরে আগ্রীব-নিমজ্জিতা হইয়া নানা কথায়, কৌতুকহাস্যে সে ঘাট শব্দমুখর করিয়া তুলেন না; এখন আর বর্ষীয়সীগণ সেই ঘাটের কূলে সৈকতোপরি উপবেশন করিয়া তদগতচিত্তে পূজাহ্নিকে রত থাকেন না। এখন সে পরিত্যক্ত ঘাটের পথে তৃণ জন্মিয়াছে;—এখন আর কেহ কক্ষে কলস লইয়া সে পথে গমন করে না; এখন সে পথে কোনও স্নানার্থিনীর অলক্তকরাগরঞ্জিত কোমল চরণের মধুর নূপুরনিক্কণ শ্রুত হয় না; এখন আর সে পথে কাহারও কঙ্কণ কলসে মৃদুমৃদুস্পর্শজনিত মৃদুমধুর ধ্বনি উত্থিত করে না; এখন আর নিদাঘকালে স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কেহ সে বটবৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া যায় না। সে ঘাট এখন শূন্য;—সে পথ এখন পরিত্যক্ত;—সে বটবৃক্ষ এখন একাকী দণ্ডায়মান।

১

পূর্ব্বে গ্রামে হারাধন নামক এক জন গোপযুবক বাস করিত। অল্প বয়সেই হারাধনের মাতাপিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। হারাধন কতকটা পাগল, কতকটা আজন্ম নির্ব্বুদ্ধি, অর্থাৎ "ইডিয়ট"। আত্মীয় স্বজনগণ কেহই এই অসহায় অদ্ভুত জীবটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে নাই; তবে গ্রামের লোকের দয়ায় হারাধন দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পাইত। গ্রামের লোক হারাধনকে দয়া করিত,—ভালও বাসিত। হারাধন তাহাদের অনেক কাজে লাগিত। হারাধনের এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, কেহ তাহাকে কিছু করিতে বলিলে, সে প্রাণপণে সে কাজ করিতে চেষ্টা করিত। কাহারও পীড়া হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামান্তর হইতে ডাক্তার বা কবিরাজ ডাকিতে হইলে, দূরগ্রামে কাহারও কোনও পীড়িত আত্মীয়ের বা কুটুম্বের সংবাদ আনিতে হইলে, হারাধনকে একবার বলিলেই হইল; হারাধন তখনই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিত।

হারাধন এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে বড়ই ভালবাসিত; গ্রীষ্মকালে সে এই তরুমূলেই নিশাযাপন করিত। মধুমতীর কলকলধ্বনি, বটবৃক্ষের ঘন-পত্ররাজির মৃদুমর্ম্মর, আর চারি দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব—এই সকল পাগলের মনে কি সুখ দান করিত, তাহা সেই বলিতে পারে।

সে এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া, গ্রামের লোক—কেহ খড়, কেহ বাঁশ, কেহ রজ্জু, কেহ বা শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক সাহায্য করিয়া এই বটবৃক্ষের নিকটেই হারাধনের জন্য একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। সেই কুটীরাভ্যন্তরে থাকিয়া হারাধন মধুমতীর বীচিভঙ্গ দেখিতে পাইত, বটপত্রের মৃদুমর্ম্মর শুনিতে পাইত। তাহার কুটীরখানি যেমন ক্ষুদ্র, কুটীরের দ্রব্যাদিও তেমনই সামান্য। কুটীরাভ্যন্তরে গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত কয়খানি বস্ত্রমাত্র থাকিত। হারাধন কুটীরের এক কোণে একটি উনান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। যে দিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না, সে দিন সে আপনি রন্ধন করিত। চাউল প্রভৃতির জন্য তাহার কোন ভাবনা ছিল না—চাহিলেই মিলিত।

২

বর্ষার অপরাহ্ণ। আজ শেষরাত্রি হইতে আর বৃষ্টির বিরাম নাই; এখনও টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘন ধূম্র মেঘমালায় আচ্ছন্ন—

সে নিম্নবচ্ছির মেঘাবরণে কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই,—কোথাও এক নীল দৃষ্ট হয় না। আজ প্রভাত হইতে রৌদ্র দেখা যায় নাই,—এখন না হইতেই চারি দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। নদীর তীরতরুরাজি স্বচ্ছান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে।

আজ গ্রামের রমণীরা সকাল সকাল ঘাট সারিয়া গিয়াছেন। ঘাটে আর লোক নাই, কেবল এইমাত্র এক কিশোরী কলস কক্ষে জল লইতে আসিয়াছেন। কিশোরীর দীপ্ত গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহে যৌবন তাহার শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; সে দেহে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে—যেন বর্ষাবারিরাশিপ্লাবিতা তরঙ্গিণী কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কুঞ্চিতকেশভারে কবরী শিথিল হইয়া গ্রীবাদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কিশোরীর সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন নাই,—তিনি এখনও অবিবাহিতা। তাঁহার পিতা বড় কুলীন; সে প্রদেশে তাঁহার সমান ঘর দুর্ল্লভ; তাই আজও যুবতীর বিবাহ হয় নাই। যুবতীর এক ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃষসাও এখনও অবিবাহিতা। কৌলীন্যের কল্যাণে সে অঞ্চলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হারাধন আজ আর আপনার কুটীর ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। পূর্ব্ব দিন সে কোথা হইতে কয় মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; আজ দ্বিপ্রহরে আপনি রন্ধন করিয়াছে। এখন একটু অন্ধকার হইতেই সে কুটীরমধ্যে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া আপনার ছিন্ন মাদুরখানি বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল,—চালের নিম্নে একটা টিকটিকি একটা ক্ষুদ্র পোকা ধরিতে চেষ্টা করিতেছে।

সহসা বাহিরে ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। হারাধন চমকিয়া উঠিল। এরূপ শব্দ তাহার নিকট পরিচিত; সে বুঝিল,—বর্ষাবারিপাতপ্রমত্তা মধুমতী কোথাও আপনার তটভূমি ভাঙ্গিয়া লইল।

কোথায় তট ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেখিবার জন্য, হারাধন কুটীরের বাহিরে আসিল; দেখিল, ঘাটের বামপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকার চাপ খসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে জলরাশি আবিল হইয়াছে;—জলের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঘাটের পার্শ্বেই একটা পিত্তল-কলস ভাসিতেছে; ঘাটে জনপ্রাণী নাই! কলস তুলিবার জন্য জলে নামিয়া হারাধন পদে নরদেহের স্পর্শ অনুভব করিল। হারাধন জলমধ্যে

[illegible]ত একটি রমণীদেহ তুলিল। ঘাটের পার্শ্বে তটভূমি হইতে যে মৃত্তিকার [illegible]য়াছিল, তাহারই একাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যুবতীর পৃষ্ঠদেশে পতিত [illegible]ল ;—সেই আঘাতে তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন। বর্ষার বারিপাতে নদী-গর্ভে অল্প জলে প্রভূত ধোয়াট মাটি জমিয়াছিল—সে মৃত্তিকা আটালো। তখন রমণীর দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল ; তিনি সেই আটালো মৃত্তিকা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইয়া আসিতেছিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ লইয়া হারাধন কুটীরে ফিরিল ; তাঁহার কলস নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিতে লাগিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ কুটীরে আনিয়া হারাধন তাহা সযত্নে আপনার ছিন্ন মাদুরের উপর সংস্থাপিত করিল। সে রন্ধনান্তে উনানের অগ্নি নির্ব্বাপিত করে নাই ;—কুটীর মধ্যে মৃদুতাপ অনুভূত হইতেছিল। সেই মৃদুতপ্তপবন-স্পর্শে শীঘ্রই রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দেখিলেন,—তিনি হারাধনের কুটীরে শায়িতা, হারাধন তাঁহার নিকটে বসিয়া এক-দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে। স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ তিনি কিছু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া হারাধন বলিল, "ঠাকরুণ, তুমি ঘরে থাক, আমি বাহিরে বসিতেছি।" রমণী কুটীরমধ্যে রহিলেন। হারাধন [illegible] বসিয়া ভিজিতে লাগিল।

[illegible]ক্ষণ পরে রমণী একটু সুস্থ হইলেন ; তাঁহার শরীরে তখনও [illegible] প্রকাশ পায় নাই। তিনি হারাধনকে ডাকিলেন, সে তাঁহার [illegible]কটে আসিল। রমণী বলিলেন, "হারাধন ! আমি বাড়ী যাইব, আমার সঙ্গে চল।"

রমণী গৃহাভিমুখে চলিলেন ; হারাধন তাঁহার সঙ্গে চলিল। তখন চারি-দিক এমন ঘনান্ধকারে ব্যাপ্ত যে, পল্লীপথ উভয়ের পরিচিত না হইলে যুব-তীর পক্ষে সে রাত্রে গৃহে যাওয়া সম্ভব হইত না। যাইতে যাইতে রমণী বলিলেন, "কি অন্ধকার ! সাপের ঘাড়ে পা দিলেও দেখিতে পাইব না।"

যুবতী গৃহে উপনীত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী বলিলেন, [illegible] যে সারদা, এতক্ষণে আসিলি ! এই দুর্য্যোগে কি ঘাটে এত বিলম্ব করিতে [illegible]ছে ? আমি ভাবিয়া সারা হইতেছিলাম।"

সারদা সিক্তবস্ত্রেই সেইখানে বসিয়া জননীকে আদ্যোপান্ত সকল কথা

[illegible]ল। তখন গৃহিণী বাটীর সকলকে শুনাইবার মত উচ্চস্বরে বলিলেন, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই, মা, আজ তো'কে পাইয়াছি।" [illegible] কথাটা বলিবার সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে একটু ক্রন্দনের ঝঙ্কার আসিল।

সহসা এই কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা কি, তাহা জানিবার জন্য, বাটীর সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন গৃহিণী সারদার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা (এবং দুই চারিটা অতিরিক্ত কথাও) বলিলেন, এবং সর্ব্বশেষে, গল্পসমাপনে "আমার কথাটি ফুরাল" ইত্যাদির মত, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই তোমাকে পাইলাম" বলিতে ভুলিলেন না। গৃহিণীর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া পৌত্রী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার কথা শুনিয়া সে বলিল, "তবে যে, ঠাকুমা, তুমি বল—মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি! মানুষকে দিলেও গেলি?"

"তুই বড় জ্যাঠা হইয়াছিস" বলিয়া গৃহিণী তাহাকে এক তাড়া দিলেন, এবং কর্ত্তাকে বলিলেন, "হারাধনকে কাল এখানে খাইতে বল।"

সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাধনের সন্ধানে বহির্বাটীর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু হারাধনকে আর সেখানে পাওয়া গেল না, সে ততক্ষণ কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গিয়াছে।

৩

পর দিবস প্রত্যূষে পাড়ার আর আর গৃহিণীদিগের সহিত এই দুর্ঘটনার কথা বলিতে বলিতে ঘাটে যাইবার সময় সারদাসুন্দরীর মাতা ঘাটের পথ হইতে হারাধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হারাধন, আজ আমাদের বাড়ী যাইয়া খাইয়া আসিস্।" কুটীরের বাহিরে আসিয়া হারাধন উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা, মাঠাকরুণ।"

সারদার মাতার কথা শুনিয়া বামার মাতা বলিলেন, "ভরা সন্ধ্যায় মেয়েকে একলা ঘাটে যাইতে দিতে আছে! ও নিশ্চয় 'উপর-দৃষ্টি'। [illegible] ভালয় রক্ষা হইয়াছে, এখন একটা স্বস্ত্যয়ন করাইও।"

নদীতীরে একখণ্ড মৃত্তিকা ধসার মত একটা তুচ্ছ নৈসর্গিক ব্যাপার [illegible] গ্রামের গৃহিণীগণ যতপ্রকার মতামত প্রকাশ করিলেন, সে সকল বর্ণিবার [illegible] আমাদিগের নাই; তবে এ কথাটা স্থির রহিল যে, "উপর-দৃষ্টি" নহিলে [illegible] ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই।

সেই দিন মধ্যাহ্নে হারাধন সারদার পিতৃগৃহে আহার করিতে [illegible]

গৃহিণী আপনি দাঁড়াইয়া তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতে[illegible]
সেই দিন হইতে হারাধন প্রায়ই সারদাসুন্দরীর পিতৃগৃহে যাইত। দুই [illegible]
দিন টার্পিন মালিস করিয়া সারদার দেহের ব্যথা দূর হইল। হারাধন [illegible]
গেলে, হয় সারদা স্বয়ং, নয় ত তাহার জননী, তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক
ভোজন করাইতেন।

এমনই ভাবে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল।

পাগল হারাধন কিছু ভাবিত কি না,—সে কিছু ভাবিতে পারিত কি না,
তাহা সেই বলিতে পারে। হয় ত বা তাহার হৃদয়ের কোনও নিভৃত [illegible]
কোথাও মরুমধ্যে ওয়েসিসের মত এমন একটু অংশ ছিল, যাহা অপর [illegible]
লের হৃদয়ের মত সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ, অনুভব
করিতে পারিত। অনুশীলনের অভাবে আলোকবিহীন স্থানে উদ্ভিদের মত
তাহার হৃদয়ের সে অংশ বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। ঘনান্ধকারমধ্যে বিদ্যুদ্বি-
কাশে যেমন চারি দিক সচকিত হইয়া উঠে, তেমনই কোন তীব্র সুখ বা দুঃখ,
ঘৃণা বা ভালবাসা, আনন্দ বা বিষাদ অনুভব করিলে, তাহার রুদ্ধ মানসীশক্তি
সচকিত হইয়া উঠিতে পারিত। একখানি প্রস্তরের অন্তরায় অপসারিত
করিলে যেমন নির্ঝরের বারিরাশি বিনির্গত হয়, তেমনই হয় ত একটা কারণে
তাহার হৃদয়ের সেই অংশ সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিতে পারিত। সে কথা
কে বলিতে পারে!

হারাধন কি ভাবিয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। তবে একদিন
সকালে সে সারদার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। তখন সারদার দুই
ভ্রাতা ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ নিবিষ্টচিত্তে
একটা ডাবা হুঁকায় ধূমপানে রত ছিলেন; কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের এক পুত্রের জন্য
একখানা ঘুড়ী প্রস্তুত করিতেছিলেন। হারাধনকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন,
"কি রে, হারাধন!" হারাধন বলিল, "একটা কথা বলিব!" তিনি হাসিতে
হাসিতে বলিলেন, "তোর আবার কথা কি?" হারাধন বলিল, "ঠাকুর[illegible]
এর সঙ্গে আমার বিয়ে দিন না কেন?"

তাহার কথা শুনিয়া সারদার জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "দূর পাগল! [illegible]
বলিতে নাই।" শুনিয়া হারাধন ফিরিয়া চলিল। তখন কনিষ্ঠ [illegible]
বলিলেন, "দাদা, ওটা বদ্ধ পাগল। উহার কাণ্ডজ্ঞান নাই;—উহাকে
বাটীতে আসিতে দিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি হারাধনকে ডাকি[illegible]

হারাধন ফিরিয়া আসিল ;—তিনি তাহাকে বলিলেন ; "তুই আর আমাদের বাড়ী আসিস্ না।" হারাধন পূর্ব্বোন্মুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার বক্তার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপনার কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গেল।

তখন পথিপার্শ্বে পাড়ার কলহনিরতা দুই জন রমণীর উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। ইহারা দুই জন গ্রামের প্রসিদ্ধ ঝগড়াটে; এরূপ কলহ ইহাদিগের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের লোকে বলিত যে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কোন দিন কলহ করিবার লোক না পাইলে বেণামুক্ত বিমুক্ত কেশ বাধাইয়া "কালামুখি আমার চুল ধরিলি কেন ?" বলিয়া আপের সহিত বেশ কলহ করেন, তাহার পর জলগ্রহণ করেন। কলহকালে আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণের পুংস্কোকিলকলবিজয়িনী বাণী কিরূপে আতায়িচীৎকারে পরিণত হয়, তাহা যাঁহারা না শুনিয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই। হারাধন যখন পথ দিয়া যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল, কলহকারিণীদ্বয়ের মধ্যে এক জন অপরকে সম্বোধিয়া বলিতেছেন, "লোকসমাজে ও পোড়ামুখ দেখাইতে তোর লজ্জা করে না ? কেন ? এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরিতে পারিস্ !"

শুনিয়া হারাধন আপনা-আপনি বলিল, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি !" সে আপনার কুটীরে গেল; সে দিন আর বাহির হইল না।

সেই দিন হইতে হারাধন মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনি গম্ভীরভাবে বলিত, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি।"

৫

কিছু দিন পরে বহু চেষ্টায় সারদার বিবাহের পাত্র মিলিল। অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক দরদাম, অনেক চড়াদর হাঁকা ও সস্তাদর ডাকা প্রভৃতির পর পাওনা স্থির হইলে, পঞ্চাশৎবর্ষীয় পাত্র আর একবার টোপর মাথায় দিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল, সারদা, তাহার এক ষষ্ঠবর্ষীয়া পিতৃব্যপুত্রী ও [illegible]র বষ্টিবর্ষীয়া পিতৃস্বসা একত্র সেই একই "বরে" প্রদত্তা হইবেন। বরের পক্ষে ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তিনি দ্বাদশবার ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং সেই দ্বাদশবারে তাঁহার ভাগ্যে ঊনবিংশটি রমণীরত্ন লাভ হইয়াছিল।

ভুক্তিদরের কিছু অগ্রিম পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটক, নাপিত ও পাঁচ দশ জন

লোক লইয়া বর বাটী হইতে বাহির হইলেন। কন্যার গ্রামের প্রান্তে সরো-বরকূলে আসিয়া বরযাত্রীরা মেটে পথের এক হাঁটু ধূলি বিধৌত করিয়া ফেলিল, বোঁচকা হইতে জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিল, উত্তরীয় লইয়া তৈল-মর্দ্দনপিচ্ছল গ্রীবাদেশে বিলম্বিত করিল,—সাজগোজ শেষ করিয়া সকলে বরের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করিল।

হারাধন তখন কোথায় যাইতেছিল। গ্রামে একখানা পাল্কী ও কতগুলি অপরিচিত লোক দেখিয়া সে এক জন বাহককে জিজ্ঞাসা করিল, "পাল্কীতে কে ?" বাহক তখন বিবাহবাড়ীর বক্‌সিসের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল,—হারাধনের কথা কানে তুলিল না। পথে এক দল বালক খেলা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "হারাধন, ব্রাহ্মণবাড়ী বিবাহ। সেই, তুমি যাহাকে জল হইতে তুলিয়াছিলে, আজ তাহারই বিবাহ।"

হারাধন চলিয়া গেল।

এক দল ছেলে চেঁচাইতে চেঁচাইতে, ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে পল্লী-পথে ধূলি উড়াইয়া বরের পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবাহবাড়ী পর্য্যন্ত চলিল। ভল্লুক যেমন মশকের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া উঠে, অথচ তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারে না, বরযাত্রিগণও সেইরূপ বিষম বিরক্ত হইয়াও বালকদলকে তাড়াইবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৫

সন্ধ্যার পর "লগ্ন" উপস্থিত হইলে, বর যাইয়া আলিপানা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইলেন। কনে তিনটি পূর্ব্বেই সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সম্প্রদানের কিছু পূর্ব্বে মর্য্যাদায় একটা কথা উঠিয়া তর্ক উপস্থিত হইল। মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশিখাধারী পুরোহিত হইতে টোপরপরা বরটি পর্য্যন্ত সকলেই সে তর্কে যোগদান করিলেন। তর্ক উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। জরাজীর্ণা পিসিমার আরও বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতেছিল; তিনি বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আর বসিয়া থাকিতে পারি না। বাপু, একটা ফুল ফেলিয়া দাও।" চারি দিক হইতে সকলে "কি কর! কি কর!" করিয়া উঠিল। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণের জন্য পিসিমার আর সে বরের সহিত বিবাহ হইল না—বোধ হয়, জীবনের অবশিষ্ট কয় দিনের মধ্যে তাঁহার কৌমার-দশা শেষ হইবার সম্ভাবনাও শেষ হইয়া গেল। কোন রূপে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তর্ক মিটিলে বিবাহ শেষ হইল। সমবয়স্কা ও অসমবয়স্কাদিগের নিকট সারদা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে সে দৃঢ় বুঝিয়াছিল যে, ভূমিসম্পত্তির মত স্বামিসম্পত্তিতেও দখলীস্বত্বই প্রধানস্বত্ব,—কাজেই দখল ছাড়া কিছু নহে। তদ্ভিন্ন নিজের রূপের গর্ব্বও যে তাহার ছিল না এমন নহে; (কাহারই বা না থাকে?) সে ভাবিয়াছিল যে, নূতনের আকর্ষণে স্বামীটিকে দিন কয়েক কাছে রাখিতে পারিলেই, সে আপনার রূপ-বহ্নিতে তাঁহার পক্ষ দুইখানি ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারিবে। তাই ফুলশয্যার রাত্রেই সে স্বামীর সহিত তাঁহার গৃহে যাইতে চাহিল। স্বামী প্রথমে স্থানাভাব প্রভৃতি আপত্তি করিতে লাগিলেন। সারদা বলিল, "তোমার চরণসেবা করিতে পাইলে, সকল কষ্টই আমার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হইবে।" এই বলিয়া সারদা দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিল। তাহার সেই প্রভাত-শিশির-সিক্ত ফুল্লারবিন্দবৎ অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া স্বামীর সঙ্কল্প টলিল। সারদা মনে মনে হাসিল; ভাবিল,—"তুমি পুরুষ, তোমার সাধ্য কি যে চাতুরীতে রমণীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে! চিরকালই নামে তোমরা প্রভু, আমরা দাসী · কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রভু, তোমরা দাস! চিরদিনই আমার চরণতলে শিব, মহেশের মস্তকে মন্দাকিনী।"

তাহার পর সারদাসুন্দরী একবিংশতি সরিকের একজন হইয়া বিংশতিটি সপত্নী-সঙ্কুল স্বামিসম্পদে আপনার অংশ বুঝিয়া লইতে ও দখল রাখিতে স্বামিগৃহে গেল;—মনে আশা ছিল, ক্রমে একাই সবটা দখল করিয়া লইতে পারিবে।

সারদার সপত্নীরা সকলে স্বামিগৃহে থাকিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহারা আর স্বামিসদনে আসিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল, কেবল তাঁহারাই স্বামিগৃহে বুকড়ী চাউলের অন্ন আহার করিয়া ও পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এখন একজন সাধারণ শত্রু উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী সন্ধিসংস্থাপন করিয়া, ঝগড়া আপোষে মিল করিয়া ফেলিলেন ও সমবেতশক্তিতে সারদাকে আক্রমণ করিলেন।

সারদা চালাক মেয়ে, সে প্রথমেই সপত্নীদিগকে চটাইল না। সে প্রথমে তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিল, তাহার পর স্বামীর উপর আপনার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া লইয়া সপত্নীদিগকে দুই পায় হেঁচিতে লাগিল। ক্রমে সেই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, স্বামী তাহার হস্তে খেলিবার পুতুল হইয়া দাঁড়াইলেন।

এমনই ভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর সারদার স্বামী এক জন ধনীকে কন্যাদায়মুক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। এবার আর সারদা স্বামীকে বাগে রাখিতে পারিল না; অর্থলোভে তাহার স্বামীটি অসমসাহসে বিষম জোরে টান দিয়া দড়ী ছিঁড়িলেন। সারদা বুদ্ধিমতী;—সে বুঝিল যে, আর বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নহে, অধিক কচ্লাইলে লেবু তিক্ত হইয়া উঠিবে; বিশেষ এ বিবাহে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ ধনীর দুহিতা আর দরিদ্র স্বামীর ঘর করিতে আসিবে না, মধ্য হইতে কিছু অর্থলাভ হইবে।

সারদার অনুমানই সত্য হইল। পাঁচ ছয় দিন পরেই স্বামী ফিরিয়া আসিলেন;—সঙ্গে কিছু অর্থও আনিলেন। তাঁহার নবপরিণীতা বধূ পিত্রালয়েই রহিলেন। গৃহে সারদাসুন্দরীর প্রভাব যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

৬

কিন্তু সারদার অদৃষ্টে এ সুখ অধিকদিন সহিল না। শেষ পক্ষের শ্বশুরালয়ে পানাপুকুরের পচা জল পান করিয়া স্বামী জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত, মধ্যে মধ্যে যাইত,—জ্বর না থাকিলে, স্নানাহার সাধারণ মতই চলিত। ক্রমে নিত্যই একটু জ্বর দেখা দিতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় নাড়ী টিপিয়া "পুটপাকের বিষমজ্বরারি লৌহ" ব্যবস্থা করিলেন। জ্বর বন্ধ হইল না; শীতের প্রারম্ভেই রোগীর পা ফুলা ফুলা বোধ হইতে লাগিল। সারদার অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা সত্ত্বেও শীত যাইতে না যাইতেই তাহার কপাল ভাঙ্গিল।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামিগৃহে সারদার সকল প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল। এখন সপত্নীদিগের জ্বালায় তাহার পক্ষে সে গৃহে বাস করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিধবার পুণ্য শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া অলঙ্কারহীন প্রকোষ্ঠে, বিধবা সারদা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। কন্যাকে দেখিয়া মাতা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; মাও কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়েও কাঁদিতে লাগিল।

কয় দিন পরে একদিন জননীর সঙ্গে স্নানার্থ ঘাটে যাইবার সময় সেই বটবৃক্ষের নিকটে হারাধনের কুটীর দেখিয়া সারদা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, হারাধন কি আজও বাঁচিয়া আছে?" মা বলিলেন "আছে বৈ কি!" সারদার অনুরোধে তাহার জননী হারাধনকে সে দিন তাঁহাদিগের গৃহে যাইয়া আহার করিতে বলিলেন। শুনিয়া হারাধন কিছুক্ষণ নদীর দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সম্মতি প্রকাশ করিল।

হারাধন আসিলে সারদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হারাধন, আমায় চিনিতে পার ?" হারাধন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না।" সারদাসুন্দরীর বিষাদবিমলিন আনন, কোটরগত নয়ন, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। সারদা বলিল, "আমি সারদা। সেই যে আমি নদীতে ডুবিয়া গেলে তুমি আমাকে তুলিয়াছিলে!" হারাধন কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া অতিকরুণ, অতিকাতর, অতিক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "চালাকি করিও না। তুমি সে নও ঠাকরুণ, তুমি সে নও।" নির্ব্বোধ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের যে মূর্ত্তির কথা ভাবিয়াছে, সে মূর্ত্তি আর এ মূর্ত্তি এক কি ?

হারাধন রাস্তার দিকে চলিল। সারদা ডাকিল, "হারাধন, ভাত খাইয়া যাও।" হারাধন ফিরিল না;—সে যাইতে যাইতে শুনিল, সারদার পিতা বলিলেন, "ও পাগল। উহার কি বুদ্ধি আছে যে, কিছু মনে রাখিতে পারিবে ?" শুনিয়া সারদা বলিল, "আহা, উহার কি দুঃখের জীবন!" আপনি দুঃখে দগ্ধ হইয়া সারদা অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করিতে শিখিয়াছিল।

হারাধন আপন মনে বলিতে বলিতে গেল, "আমার জীবন কি এতই দুঃখের! তবে এ জীবন রাখি কেন ?" সে যাইয়া আপন কুটীরে প্রবেশ করিল। সারদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাকিতে আসিলেও হারাধন আর কুটীর হইতে বাহির হইল না।

* * * * *

পরদিবস প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানার্থিনীরা ঘাটের পথে বটবৃক্ষের নিকটে যাইযাই, কক্ষের কলস ফেলিয়া ভয়চকিতদ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া গ্রামের লোক সেখানে গেল। জীবনের ক্ষুদ্র সুখে দুঃখে হারাধন যে বটবৃক্ষকে এত ভালবাসিত, সেই বটবৃক্ষই তাহার মরণের অবলম্বন হইয়াছে;—বটশাখায় রজ্জু ঝুলাইয়া সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সেই অবধি গ্রামের লোকে সেই বটবৃক্ষটিকে 'হারাধনের বট' বলিয়া থাকে। হারাধনের 'অপমৃত্যুর' পর হইতে একটা অজ্ঞাত ভীতির আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পর প্রাণান্তেও সে বটবৃক্ষের নিকটে যাইতে স্বীকৃত হয় না। কেহ সে বিষয় লইয়া তাহাদিগকে কোনরূপ উপহাস করিলে তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি ওখানে আশঙ্কার কোন কারণ না থাকে, তবে ও বটবৃক্ষে পাখীরাও বাসা বাঁধে না কেন ?" বাস্তবিক 'হারাধনের বটে,' কেন জানি না, কোন পাখীই বাসা বাঁধে না!

ভারতবর্ষে।

১

মার্কটোয়েন ছদ্মনামধারী, সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান পরিহাসরসিক, মিষ্টার স্যামুয়েল ক্লিমেন্স,বৃদ্ধবয়সে প্রকাশকের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণপরিশোধকল্পে দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে পৃথিবীপরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রকাশকের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া সাহিত্যসেবকের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। সার ওয়াল্টার স্কটও বৃদ্ধবয়সে প্রকাশকের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নেও বিশ্রামলাভ করিতে পারেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে ঋণশোধচেষ্টায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

মার্কটোয়েন More Tramps Abroad নামক গ্রন্থে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের আভাষ প্রদান করিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষাংশে মার্কটোয়েন বোম্বাই সহরে আসিয়া উপনীত হয়েন। বোম্বাইয়ে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিল—বর্ণবৈচিত্র্য ও দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার। বোম্বাই দেখিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

বোম্বাই সহর সুমোহন—মনোহর—বিস্ময়োৎপাদক, দেখিলে স্বতঃই আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। প্রকাণ্ড সহর;—সহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ—দেশীয়দিগের তুলনায় য়ুরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি সামান্য। এখন শীতকাল, কিন্তু আকাশে আমাদিগের দেশের জুন মাসের আকাশের মত শোভা, বৃক্ষরাজিও সেই সময়োপযোগী পত্রপল্লবশোভাসমন্বিত। সম্মুখে ঘনচ্ছায় তরুতলে সমুজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যময়বেশধারী দেশীয় নরনারীগণ উপস্থিত। বাগানদিগেও সেই শোভা। এই সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ হয় না। বাজারে দেশীয়গণের জনতা; পরিধেয়বস্ত্রের ও সৌধমালার বর্ণবৈচিত্র্য অনির্ব্বচনীয়। সে শোভা প্রাচীন ভারতের প্রণালীতে গঠিত বাজারেরই উপযোগী। আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন গৃহে গমনের সময় উপস্থিত হয়,তখন আর এক প্রকার দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। * * * এই সময়, স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমজীবিগণ দলে দলে গৃহাভিমুখে গমন করিতে থাকে। পুরুষের পরিধানে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র—কেবল তাহাই কোমরে বেষ্টিত।—তাহাদের গঠন অতি সুন্দর, বর্ণ পালিশ করা সাটিনের ন্যায় চিক্কণ ও উজ্জ্বল। রমণীরা তন্বী, তাহাদের দেহযষ্টি সুগঠিত—সরল, [illegible] মণ্ডিত। তাহাদের হস্তে, পদে ও নাসিকায় পীতাভ কিছু অলঙ্কার। তাহাদিগের গমন সরল, চলন গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক,—সেই এক দৃশ্য।

দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার দেখিয়া আমেরিকার ক্রীতদাসগণের প্রতি কুব্যবহারের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।—

ভারতবর্ষীয়গণ স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি ও কোমলভাবাপন্ন। তাহাদিগের ব্যবহারেই তাহাদিগের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আমাদিগের ঘরের বারান্দায় একটি সুবৃহৎ কাচের দ্বার ছিল। সেই দ্বারে একটা কি করা আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্য একজন শ্রমজীবী আহূত হইল। দেখিয়া বোধ হইল, সে ভাল করিয়াই কাজ করিতেছিল; হয়ত সে ভাল করিতেছিল না, কারণ (হোটেলের) সেই বিশালকায় জার্মাণ কর্ম্মচারীটি কোন দোষ না দেখাইয়া, তাহার গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল,—পরে তাহার দোষ দেখাইয়া দিল। আমাদের সকলের সম্মুখে এরূপ আচরণ বিশেষ লজ্জাকর বলিয়া মনে হইল। সেই দেশীয় লোকটি এই ব্যবহার ধীরভাবে সহ্য করিল। আমি পঞ্চাশ বৎসর এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া নিজের বাল্যজীবনের কথা আমার মনে পড়িল, আর মনে পড়িল যে—তখন এইরূপ করিয়াই ক্রীতদাসদিগের নিকট মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইত। জন্মাবধি সেই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া তখন তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইত এবং সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি যে অন্য কোনরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি তখন এইরূপ ব্যবহারে সেই হতভাগ্যগণের প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হইত, আর সেই শাস্তিদাতার জন্য আমি লজ্জা বোধ করিতাম।

ভারতবর্ষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মার্কটোয়েন বলিয়াছেন,—

এই দেশ * * * মানবজাতির শৈশবাবস্থার ক্রীড়াভূমি, ভাষার উৎপত্তিস্থল, ইতিহাসের জন্মভূমি, whose yesterdays bear date with the mouldering antiquities of the rest of the nations. কেবল এই দেশই ভিন্নদেশীয় নৃপতি বা কৃষক, পণ্ডিত বা মূর্খ, ধনী বা নির্ধন সকলের পক্ষেই সমান আকর্ষক। একবার সামান্যরূপে এই দেশ দেখার সহিত পৃথিবীর অন্য সকল স্থান দেখাও সমান নহে।

ভারতে ভৃত্যের মাসিক বেতন সাধারণতঃ সাত টাকা, কৃষাণের মাসিক বেতন সাধারণতঃ চারি টাকা মাত্র। এই কথার উল্লেখ করিতে গিয়া মার্কটোয়েন বলিয়াছেন যে, কয়েক জন দেশীয় ভদ্রলোক মধ্যভারতের চিফ্-কমিশনারের নিকট ভারতের দারিদ্র্যের কথা বলায়, তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে কৃষাণের বেতন মাসে আট আনা মাত্র ছিল। লেখক এই উপলক্ষে তৎকালীন ও বর্ত্তমান সময়ের খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য ও করভারের তুলনা করিয়া দেখাইলে বিদেশীয় পাঠকগণ ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের বিষয় বুঝিতে পারিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষ নগরপ্রধান দেশ নহে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে নগর নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের এই বিশাল জনসমবায় প্রধানতঃ কৃষিজীবী। সমস্ত ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড

দুর্ভিক্ষের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—ভারতের দারিদ্র্য কি বিশাল।

অন্যত্র গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ভারত অদ্বিতীয়—ইহার তুলনা সম্ভবে না। বিশাল ব্যাপার কেবল ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। যখন অন্য কোন দেশে কোন বিষয়ে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, তখন অপর কোনও দেশে যে সেই বিষয়ে সেইরূপ বিশেষত্ব দৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহের আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ভারতসম্বন্ধে ব্যাপার স্বতন্ত্র। * * *

মহামারী ভারতেই উৎপন্ন। ভারতবর্ষই ইহার রাজ্য,—লীলাভূমি।

সতীদাহও ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। বৎসরে আট শত বিধবা স্বেচ্ছায়—সানন্দে স্বামীর মৃতদেহের সহিত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এ দৃশ্য দেখিয়াছে, এমন লোক আজও জীবিত আছে। ইংরাজ-রাজ বাধা না দিলে এখনও বৎসরে আট শত বিধবা স্বামীর চিতায় দেহদাহ করে।

দুর্ভিক্ষই ভারতবর্ষের প্রধান বিশেষত্ব। অন্যত্র দুর্ভিক্ষ সামান্য ব্যাপার,—ভারতে তাহা বিষম ব্যাপার। অন্যত্র দুর্ভিক্ষে শত শত লোকের মৃত্যু হয়, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ধ্বংস লোলুপ শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে।

ভারতবর্ষে বিংশতি লক্ষ দেবতা—সকলেই উপাসিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্য সকল দেশ দেউলিয়া, কেবল ভারতবর্ষই ক্রোরপতি।

ভারতে সকলই বিশাল। দারিদ্র্যবিষয়েও অন্য কোনও দেশ ভারতের সহিত তুলনীয় নহে। এক সময়ে তাহার ধনও তেমনই অসাধারণ অধিক ছিল। তাহার বহু অর্থ-জ্ঞাপক শব্দগুলি এক এক কথায় সমাপ্ত। আমরা বলি—এক শত হাজার, ভারতে বলে—লক্ষ; আমরা বলি—দশ মিলিয়ন, ভারতে বলে—ক্রোর।

কি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারেই ভারতবর্ষীয়গণ সুকঠিন শৈলাভ্যন্তরে মহামন্দিরমালা ক্ষোদিত করিয়াছে; আবার তাহাতে কত মূর্ত্তি, কত স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছে, আর সেই সকল চিরস্থায়ী প্রাচীর কত চিত্তাকর্ষক চিত্রে সুশোভিত করিয়াছে। তাহারা যে সকল দুর্গের নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে সকলের তুলনায় অন্যান্য জাতির প্রধান প্রধান দুর্গও অতি ক্ষুদ্র। মূল্যবান গঠনোপকরণে, শিল্পচাতুরীতে ও সৌন্দর্য্যে, তাহাদের প্রাসাদমালার তুলনা নাই। তাহাদের নির্ম্মিত একটি সমাধিস্তম্ভ দেখিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে লোক আইসে। ভারতবর্ষে আশীটি বিভিন্ন জাতি—আশীটি বিভিন্ন ভাষা।

জাতিভেদও ভারতবর্ষের বিশেষত্ব,—আর ভারতবর্ষের বিশেষত্ব—ঠগী-সম্প্রদায়।

আদিতে ভারতবর্ষই সর্ব্ব দেশের অপেক্ষা অধিক উন্নতিশীল ছিল। এখানে সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়, এখানেই পার্থিব ধনের প্রথম সঞ্চয়, এখানেই গভীর দার্শনিকগণের ও কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণের প্রথম আবির্ভাব। এই দেশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকাই উচিত ছিল। ধীরভাবে বিদেশীয়ের অধীন না থাকিয়া,আজ ভারতেরই সর্ব্বদেশের অধিকারী ও নিয়ন্তা হইবার কথা। কিন্তু এই জাতিভেদের দেশে—এই ভাষাভেদের দেশে, তাহা সম্ভবপর নহে। দেশের এরূপ অবস্থায় দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না।

বরদার য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত নূতন প্রাসাদ দেখিয়া গ্রন্থকার বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—বহুমূল্যতা ব্যতীত ইহার আর কোনও গুণ নাই। ইহার পর পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—ঠগীনিবারণের এই এক বিষম ফল; ঠগী থাকিলে, বোধ হয়, এই প্রাসাদনির্ম্মাতা নিস্তার পাইত না!

গ্রন্থকার যখন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন, তখন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মাঘ-মেলা। সেই বিশাল জনসমুদ্র দেখিয়া গ্রন্থকার বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থযাত্রীতে পথ পূর্ণ। কারণ,এখন এখানে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমেলা হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে যাত্রিদল সমাগত হইতেছে। কত জন কত মাস ধরিয়া ক্ষুধা,তৃষ্ণা, ধূলি, রৌদ্র, সকল সহ্য করিয়া, ক্লান্তিক্লিষ্ট হইয়া কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় এই তীর্থপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখন সুখী ও সন্তুষ্ট, পথকষ্টের কথা আর তাহাদের মনে নাই,—কারণ, পুরস্কার সন্নিহিত; কারণ, তাহাদের ধ্রুববিশ্বাস যে, এখানে—এই পূতসলিলে স্নান করিলে তাহাদের সকল কল্মষকালিমা বিধৌত হইয়া যাইবে, তাহারা পবিত্র হইবে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসে বৃদ্ধ ও যুবা, সুস্থকায় ও রোগী—লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দচিত্তে এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে, সে বিশ্বাস কি প্রবল! ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক, ভারতবাসীরা এই কার্য্য করে। আমরা শ্বেতকায়গণ এ কষ্টের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু এই দেশীয়গণের সহিত আমাদের অবশিষ্টাংশের তুলনা করা যায় না। তথাপি আমরা স্বার্থত্যাগের কথা বলি। আশা করি, আমরা এইটুকু বড় যে, আমরা হিন্দুদিগের এই স্বার্থত্যাগের সম্মান করিতে পারি।

বর্ষে বর্ষে এখানে বিংশতি লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। আর কত লোক যে যাত্রা করিয়া জরাভারে, পথকষ্টে, পীড়ায়, উপযুক্ত আহারাভাবে পথে প্রাণত্যাগ করে, কেহ তাহার তালিকা রাখে না। আবার কত জন যে গৃহে ফিরিয়া এই সকল কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাও কেহ জানে না। এই এক বিশাল কাণ্ড!

এলাহাবাদ হইয়া গ্রন্থকার বারাণসীতে গমন করেন। সেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের অলন্ত প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

বারাণসী দেখিয়া কাহাকেও হতাশ হইতে হয় না। বারাণসী দেখিবার উপযোগী বটে। গঙ্গার একটা বড় বাঁকে, উচ্চভূমিতে কাশী সংস্থাপিত। সেই উচ্চভূমি গৃহে পরিপূর্ণ। সেই গৃহপূর্ণ নগরে সঙ্কীর্ণ পথগুলি যেন নিরবচ্ছিন্ন অট্টালিকামালার মধ্যে ফাটল বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে মন্দিরচূড়াগুলি দৃশ্য আরও সুন্দর করিয়া তুলে। সেই সঙ্কীর্ণ রাজপথে অবিরাম জনস্রোত দেখিলে পিপীলিকাশ্রেণীর কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে এক বিষম উৎপাত—গাভী। এই পবিত্র জীবকে কেহই তাড়না করে না, কাজেই তাহার জন্য পথে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বারাণসী ঐতিহাসিক যুগ অপেক্ষাও সুপ্রাচীন—উপকথা ও কিম্বদন্তী অপেক্ষাও পুরাতন।

হিন্দুর মতে, এখানেই জগৎসৃষ্টির আরম্ভ;—অনন্ত-সমুদ্রে এখানেই বিষ্ণু 'এককুলিজম্' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহারই চতুর্দ্দিকে দশ মাইল বিস্তার। ইহাই পঞ্চক্রোশী কাশী। তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, চারি দিকে এই জগতের সৃষ্টি। কাজেই বারাণসী জগতের কেন্দ্র।

বারাণসীর ইতিহাস ও ধর্ম্মেতিহাস বড়ই গোলযোগময়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে প্রথম হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়। তাহার পর ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়,—সে প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর আবার হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। হিন্দুর চক্ষে বারাণসী অতি পবিত্র। বারাণসী যেমন পবিত্র, তেমনই অস্বাস্থ্যকর। বারাণসী ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রধান স্থান, ইহার জনসংখ্যার অষ্টাংশ পুরোহিত। কিন্তু পরিমাণে ইহা অধিক নহে;—কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষের উপর ইহাদিগের আধিপত্য। * * * বোম্বাই নগরে অবস্থানকালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে ৬৪০ জন 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মযাজক আছেন। এই সংখ্যা প্রথমে অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা করিলে মনে হয়, এ কথা ভ্রমমাত্র। হিসাবে ৫০০০০০ জন ভারতবাসীর জন্য একজন ধর্ম্মযাজক। যেন ৩০০০০০০০০ জন সৈন্যে পূর্ণ দৃঢ় দুর্গের বিরুদ্ধে ৬৪০ জন মাত্র সৈনিক! এক বারাণসীতে ৮০০০ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বিরুদ্ধে কার্য্য করাই এই ৬৪০ জন ধর্ম্মযাজকের পক্ষে সুকঠিন। ধর্ম্মযাজকদিগের আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের এই গুণ দেখা যায়। বারাণসীতে মিষ্টার পার্কারেরও এ গুণ আছে। তাই যেখানে অপরে আশার কোন কারণ দেখিতে পায় না, সেখানেই তিনি আশার আলোকরেখা দেখিয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতেই নমুনা দেখুন;—তিনি প্রথমে বলিতেছেন,—অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে বিগত কয় বৎসর ধরিয়া বারাণসীতে যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহার পর তিনি বলিতেছেন,—এই পুনরুত্থান মরণের পূর্ব্বাভাসমাত্র; ইহা পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ শারীরিক 'আক্ষেপ'-মাত্র।

আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভাবেই 'রোমান ক্যাথলিক' ধর্ম্মের আসন্নমৃত্যুসংবাদ পাইতেছি। বহুবার আমরা তাহার সৎকারার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই সে সৎকার স্থগিত করা হইয়াছে—হয় ত আকাশ পরিষ্কার ছিল না, নয় ত সেইরূপ আর কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শববাহীরা সৎকারভূমির দিকে অগ্রসর না হয়, ততক্ষণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। জগতে কোনও ধর্ম্মের মৃত্যু বড়ই অনিশ্চিত। * * *

মিষ্টার পার্কার বলেন যে, কাশীর প্রতি ধার্ম্মিক হিন্দুর ভক্তির ও ভালবাসার উপযুক্ত আভাষ দেওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি হিন্দুর এই ভক্তির সমুজ্জ্বল, প্রাণস্পর্শী, জলন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখনই কোন হিন্দু সিপাহী দল বারাণসীর নিকট দিয়া যায়, তখন এই পবিত্র ক্ষেত্রের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা 'কাশীজিকি জয়! জয়!—জয়!' রবে গগনমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলে। বার্দ্ধক্যে ও দৌর্ব্বল্যে প্রায় চলৎশক্তিরহিত, উত্তাপে ও ধূলিবাহুল্যে প্রায় অন্ধ, পথশ্রমে মৃতপ্রায় যাত্রী, অতিকষ্টে কোনরূপে উত্তপ্ত রেলওয়ে-শকট হইতে অবতরণ করিয়া, বারাণসীর পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র কীরূ

শীর্ণ বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া 'কাশীজি কি জয়!' ... করে। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যখনই কোন য়ুরোপীয় কথা... নিকট বলেন যে, তিনি বারাণসীতে ছিলেন, তখনই লোকে তাঁহার জন্ত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, কারণ, বারাণসীবাসীরা ঈশ্বরানুগৃহীত।

ধর্ম্মবিশ্বাস যখন যুক্তি বা তর্কের বিষয় নহে, পরন্তু কেবল ভক্তির বিষয়, তখন মিষ্টার পার্কারের প্রদত্ত এই চিত্রে মনে হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু এখন অনিশ্চিত কালের জন্ত স্থগিত রহিল।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ড্রেণের ময়লায় ও শবদেহে জাহ্নবীসলিল অ... হইতে দেখিয়াছিলেন। সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

যখন আমরা আগ্রায় যাই, তখন এক অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। এই অপরিষ্কার গঙ্গাজল যে সর্ব্বোত্তম পরিষ্কারক, তাহাই তখন আবিষ্কৃত হয়। বহুদিন হইতে দেখা যায় যে, যদিও মধ্যে মধ্যে বারাণসীতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হয়, তথাপি সে পীড়া কখনই অন্তত্র হইতে নীত হয় নাই। পূর্ব্বে কখনও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গভর্মেণ্টের অধীন বিজ্ঞানবিদ্ মিষ্টার হ্যানকিন গঙ্গাজল-পরীক্ষার জন্ত বারাণসীতে গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। স্নানের ঘাটের নিকটে ড্রেনের মুখ হইতে জল লইয়া তিনি দেখিলেন,—জল লক্ষ লক্ষ বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ। কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল যে, সেই সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে! তাহার পর তিনি একটি ভাসমান শব ... নিকটে আনিয়া তৎপার্শ্ব হইতে জল সংগ্রহ করিলেন,—সে জল বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ; কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল—সে গুলিও মৃত। তিনি এই জলে বহু বিসূচিকামূল জীবাণু ... করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফল একই। ছয় ঘণ্টা পরে তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পর মিষ্টার হ্যানকিন কোন-প্রকার-জীবাণুশূন্ত কূপোদক গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিসূচিকাবীজ দিতে লাগিলেন; এবার ছয় ঘণ্টার মধ্যে জল জীবাণুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।*

কত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ এই গঙ্গোদক পবিত্রজ্ঞানে ইহাতে অগাধভক্তি সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, ইহা কোনও প্রকারেই অপবিত্র হইতে পারে না, পরন্তু ইহা সর্ব্বশুচিকর। এই বিশ্বাসেই তাহারা ভাসমান শব ও দৃশ্যতঃ ময়লাপূর্ণ জলও দ্বিধাশূন্ত হইয়া স্নানার্থ ও পানার্থ ব্যবহার করে। এই জন্য হিন্দুগণ এতদিন উপহসিত হইয়াছে; কিন্তু এখন পরিহাসের পাত্রপরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেই পুরাকালে তাহারা কেমন করিয়া এই জলের পাবনী শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিল? তখন কি এ দেশে জীবাণুবিদ্ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল? তাহা জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে, আমাদের অসভ্যাবস্থা দূর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারা সুসভ্য ছিল।

---

* এ বিষয়ে আমরা মিষ্টার হ্যানকিনকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার 'Cholera in Indian Cantonments' ও 'The Pr... Cause of Cholera' পুস্তিকাদ্বয়ে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

...প্লাবিত কর্ণফুলীর কি নয়নানন্দকর বক্রিমগতি! শ্যামার ও শ্বেতকুন্দের এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে! গিরি-শেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উদ্যান চন্দ্রকরে খণ্ড-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণ বসন্তের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সেই কৌমুদীপ্রোদ্ভাসিত শোভা কল্পনাতীত। অট্টালিকার ... ও টবের নানাজাতীয় ক্রোটন, ফুল ও লতার মনোহর উদ্যান ও ... স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নার একটি অদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মানবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে; যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানব-হৃদয় তাহার মত জ্যোৎস্না-বিধৌত শ্বেতকান্তি ধারণ করিলে তবে নির্ব্বাণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' এবং ভানুমতী তাঁহার পদতলে আরক্তমকমলমণ্ডিত 'ফুটষ্টুলে' বসিয়া স্থিরচিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সরিৎ-মালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও বিগত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়। উভয়ের মুখ প্রশান্ত; অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিষাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছু ক্ষণ স্থিরনয়নে এই শোভা দেখিয়া এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—"মা! আমি স্থির করিয়াছি, তোকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিব।"

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কন্যারূপে ... করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা! বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণ ... গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা ... প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের ... বলিতেছে, তুমি কোনও ...

চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে, আমাদের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক ভাষায় জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম হইতে পারে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোনার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন প্রধান ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম। যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্র, আচট্টল পাঞ্জাব যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের [illegible] এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, [illegible] এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাকার;—বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে।—ভারতের নানা দেশে নানা আচার।

পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দু... ঘোরতর মদ্যমাংসাশীও হিন্দু, এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্ম্মের মূল কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এবং ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াপদ্ধতি সহ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ণভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত; সর্ব্বত্র উক্ত পদ্ধতি অনুসারে অল্পাধিকপরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্ম করিয়া সমাজসংরক্ষণ।" ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ বুনিবে, এক জন মহাপণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করিয়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই একবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাহা হইলেও উহার যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের এই তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

জা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা-

শরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন তাহার পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হয়, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে। আর দেশে থাকিয়াই কোন্ হিন্দু ইংরাজ মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা ১০ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু বাবা! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনতমুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

> সুখ যাহা বল কথার কথা,
> দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
> আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
> জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
> ওই আকাশের নীলিমার মত
> দুঃখই জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
> সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,
> বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা এককালে সুখ কি তাহা জানে না,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহার

ত সেরূপ কোনও ভাব নাই। সে স্থির গম্ভীর প্রফুল্ল মুখে জ্যোৎস্না-প্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে; গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল! কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে তৃপ্ত হইয়াছে,—সুখী হইয়াছে, এ কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন। ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজীওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বস্থ একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জনস্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত

কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও"—তাহা বুঝিতে পারি না। ব্রজের গোপ গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। এইরূপে যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, [illegible] পথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে [illegible] ধর্ম্মপথের প্রকৃতপথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম, সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে পিতার মত, পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটি গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্মাশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়!
রাসে তোরা দেখে নাচিবি আয়!
ওরে চন্দ্র নাচে, তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি,
গ্রহেতে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী,
বুদ্ধ হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
(ওরে) পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
(ওরে) পত্নীপুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

দিন প্রাণ, ততদিন স্বপ্নের ক্রীড়া-পুত্তলি; কাচ ঘুরাইয়া অকারণে হাসে, অকারণে কাঁদে, অকারণে লোকের সঙ্গে কোন্দল করে, কখনও তাহাকে বুকে পুরিয়া লয়, কখনও তাহাকে গলিত দুর্গন্ধ শবের মত ন্যক্কার করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ করে; আবার হয় ত ক্ষণবিলম্বে তাহারই চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দেহি পদপল্লব" বলিয়া কৃপাভিক্ষা করিবে। ধিক্ মানুষ!

মহত্ত্বের বিচিত্রতা এই কালচক্রে। নীচতা ও মহত্ত্ব মানুষের সকলই সমান। উভয়ই মোহবশাৎ। আমায় দেখিয়া তুমি হাঁসিতেছ, তোমায় দেখিয়া আমি হাসিতেছি। পাগল আমরা সকলে, এ হাসিও পাগলামি, কান্নাও পাগলামি। নীচতাও পাগলের পাগলামির উচ্ছ্বাসে, মহত্ত্বও পাগলামির উচ্ছ্বাস। বায়ুতাড়নায় মাছি উড়িয়া কখনও পয়োনালীমধ্যে, কখনও পর্ব্বতশিখরে। পর্ব্বতশিখরে বসিয়া তাহার গৌরবে অধিকার যেমন, সামান্য গুহাগহ্বরে তাহার দীনতার কারণও তেমনই অকিঞ্চিৎকর।

প্রাণ থাকিতে আশা, বাসনা, মোহ। জন্মই বাসনার মূল। মোহ না হইলে প্রাণের প্রাণতা থাকে না, মদ না খাইলে স্ফূর্ত্তি হয় না, মদ খাইলে দুর্ব্বল সবল হয়, মরা মানুষ নাচিতে থাকে। কি বীভৎস দৃশ্য! প্রাণ আছে, মোহ নাই, এমনটি কোথাও পাইবে না। মোহ যত টানিবে, প্রাণে তত উচ্ছ্বাস আসিবে। এ জন্য মোহ মানবের অবশ্যম্ভাবী। ধিক্ মানবজীবন! এই মানুষ কবি, বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য, মাতৃসেবী, বীর, কত কি নামে গৌরব করে। যে পদাঘাতেরও ঘৃণার পাত্র, সে মাথায় বসিয়া বীরপূজা দেবপূজা লাভ করিতে লালায়িত।

যে পর্ব্বতে চড়িয়া গৌরব মনে করিতেছে, সেই কৃপাপাত্র, ঘৃণিত। যে গহ্বরে পড়িয়া, সে ঘৃণিত নহে, দীন নহে। আকাশে ঘুড়ি উড়ে বাতাস, সূতা ও আকর্ষণের জোরে। ঘুড়ি যখন খুব উপরে উঠে, ছেলেরা করতালি দিয়া বলে—চমৎকার ঘুড়ি। সহসা ঘুড়ির মাথা ছিঁড়িল, কি কাণ ভারি হইল, ঘুরিতে ঘুরিতে মাটীতে পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেল। বালক রাগে তাহাকে পদাঘাত করিল। রাগ এমনই অকারণ! যে মুখখানি দেখিয়া কাল প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই,—যত দেখি, বোধ হয় আরও দেখি, বুকে করিতে বুক জুড়াইতে গা কাঁপিয়াছে, আজ সেই মুখখানি দেখিয়া ঘৃণায় জ্বলিতেছি, তাহাকে দেখিতে ঘৃণা হয়, নিজের প্রতি ঘৃণা হয়, সমস্ত নারীচরিত্রে ঘৃণা হয়। [illegible] তাহাকে লজ্জাশীলা ভাবিয়াছি, আজ তাহাকে লজ্জা-

না ভাবিতেছি। কাল যাহাকে প্রেমময়ী, কবিতারাণী মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহাকে বেনেনীর কাঁণা কড়া গণিতে দেখিতেছি। কালিকার সে চক্ষু কি আজ নাই? আছে, কালিকার সেই কাচখানি নাই। মনের নূতন কাচ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন রাগে আঁখি রঞ্জিত করিয়াছি। রাগে কাল সে দেবী ছিল, রাগে আজ সে দানবী হইয়াছে। বস্তুতঃ সে দেবীও নহে, দানবীও নহে।

ভালবাসার সাধ পূরিল না। যে হৃদয়খানি লইয়া বসন্তে কোকিলের ন্যায় প্রফুল্লতার এ জগতে আসিয়াছিলাম, আজ তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গুঁড়াগুলি হাতে কুড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। বাজারে আসিয়া ঘুরিয়া মরিলাম! কেনা কিছু হইল না। হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সাথের সাথী চলিয়া গিয়াছে, শ্মশানে তালগাছের মত একাকী দাঁড়াইয়া হাহা করিয়া জীবনটা কাটাইতে হইবে। সুখী হইব ভাবিয়াছিলাম; দুঃখের কটোরা পূর্ণ হইল; আনন্দে জীবন দীর্ঘতর হইবে আশা করিয়াছিলাম; এ ধাক্কায় বুঝি বা কখন চূর্ণ হইবে। ভাবিয়াছিলাম মালতী,—তুলিয়া দেখি ঘেঁটুফুল।

সখি! কি মোর করম লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি।

প্রেমিকের এই হাহুতাশ চিরদিন। ফুলের বনে একটি প্রজাপতি বসিয়াছিল; ধরিতে গেলাম, কাঁটা-গাছে উড়িয়া বসিল। এই ধরি, এই ধরি, করিয়া ধরিতে আর পারিলাম না, সে ধরা দিল না, কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দু' হাতে বুক চাপিয়া—নহিলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়—দু' হাতে বুক চাপিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। কেহ হাসিল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ ঘৃণা করিল, মুখ ফিরাইল, কেহ বা আহাহা করিয়া একটু ভুলাইতে আসিল, অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে, শূন্যপ্রাণে, শূন্যদেহে, সে যে পথে গিয়াছে, সেই পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা কোথা হইতে আসিয়া সে ধরা দিল, ধরিতেই সাধ মিটিল, ধরিয়া তাহার ডানা দু'খানি ছিঁড়িয়া তাহাকে কাদায় ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া হাসিলাম। এই আমার প্রেম! এই আমার ভালবাসা। কান্না ভাল, না হাসি ভাল? যে হাসে সে দেবতা, না যে কাঁদে?

আমি কাঁদিতেই জন্মিয়াছি, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি; ভাব করিতে গিয়া ঝগড়া করি, বুঝিতে গিয়া বুঝাইয়া আসি; আমার হৃদয়ের এমনি

বিচিত্র গঠন। দোষ কি আমার? প্রেমে সুখ নাই, জগতে প্রেমই নাই; অথচ সেই সাহারার মরীচিকা, আকাশের রামধনু ধরিতে নরনারী বালবৃদ্ধ সবাই দৌড়িতেছে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত দৌড়িতেছে! আজ তুমি আমাকে বাতুল, বাউল, বাউড়, বলিয়া উপহাস করিতেছ, গুরুতর মুস্কিল বলিয়া গান বাঁধিতেছ, মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে বলিয়া হাসিতেছ, কাল তোমাকেই আরক্তনয়নে ঊর্দ্ধশ্বাসে সফেনবদনে দৌড়িতে দেখিয়া আমি হাসিব। এক-খানি ঘুড়ি উড়িতে দেখিয়া তুমি দৌড়িতেছ, একটি চাঁদ উঠিতেছে দেখিয়া হাত দু'খানি বাড়াইতেছ, পাপিয়ার গানে মুগ্ধ হইয়া ধরিবার ফাঁদ পাতিতেছ, সে মুখখানি দেখিলে—আবেশে ঢল ঢল মুখখানি দেখিলে কে না পাগল হয়? ভাই! দোষ তোমারও নহে, দোষ আমারও নহে; সকলই আমাদের কর্ম্মফল। বাসনা-সুরা পান করিলে সকলেই মাতাল হয়; মাতালের প্রাণটি যেমন সরল, রসেভরা, তেমনি ঢল ঢল; সে কুরূপকে সুরূপ দেখে, মানবীকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লয়।

এ কর্ম্মফল, কপালের লেখা নহে। ঘুড়ির রজ্জু, বায়ু ও আকর্ষণ। সেই আরক্ত আবেশপূর্ণ নয়ন দুটি, সেই ননীছাঁকা গোলাপমাখা মুখখানি, সেই মালতীর লজ্জাশীলতা, সেই শিশিরস্নিগ্ধ মধুরতা, সেই প্রভাতের কমলকোরক, সেই চাঁদের জোছনা, সকলই এই কল্পনায়! এ কল্পনা তোমার সৃষ্ট নহে, তোমার আয়ত্ত নহে, এ তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রাক্তন কর্ম্মফল।

বহরমপুরের পাগলাগারদে দেখিয়াছিলাম, সব পাগল ঠিক করিয়াছে যে, তাহাদের অধ্যক্ষ মহেন্দ্র বাবুই পাগল, আর তাহারা সকলে সেয়ানা। মানুষ এমনি পাগল, সে আপনার পাগলামি না বুঝিয়া ভগবানকেই পাগল সাজাইয়াছে। তার ভগবান বাসনামদে যদি মাতাল; সে মাতালের পূজা করে।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।

তার ভগবান নাচে, গায় ও বাজায়, সে কেবল ছায়াবাজির পুতুল। নিজে নাচে, ভগবান নাচান; বস্তুতঃ ভগবান বাসনাবিকারের অতীত; নাচেনও না, নাচানও না। নাচায় জীবের কর্ম্মফল—প্রাক্তন ও ঘটনারাশি—জন্মার্জ্জিত উত্তরাধিকৃত প্রবণতা ও ঘটনাচক্র—এই প্রবণতা ও এই ঘটনা, ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্মে মানুষ কর্ম্মী; এই ধর্ম্মে মানুষ ধর্ম্মী। এ ছাড়া মানুষের কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, মান অপমান নাই, ঘৃণা ভালবাসা নাই। এই

...র নাম মোহ। এই মোহ চক্ষে অঞ্জন মাখাইয়া একবার তোমাকে আমার হৃদয়ের পুতুল করিতে শিখাইল, আবার এই মোহই তোমাকে ঘৃণা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পথে প্রক্ষেপ করাইল। আমায় তুমি অসৎচরিত্র, মাতাল, চপল, বল। হয় ত কর্ম্মফলের ধাক্কায় আমি এমনি করি; তুমিও হয় ত এমনি করিয়াছ, করিতেছ, কি করিবে। দম্ভ করিও না, বৃদ্ধাকে দেখিয়া পাগল বলিয়াছিল, মা! তুমি ছিলে; যুবতীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি আছ; কুমারীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি হইবে। না, কৃপাভিখারী হইও না। স্রোতের তৃণকণা! তোমার সার্থকতা কি! আজ পর্ব্বতশিখরে, কাল গিরি-গহ্বরে, আজ আনন্দের স্বর্গে, কাল নিরাশার নরকে, আজ যে প্রেমদাস, কাল সে বৈরাগী।

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

ওষধিপতি।

চন্দ্রের এক নাম ওষধিপতি। বিষ্ণুপুরাণে (২।১২) দেখা যায়, চন্দ্র অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদসমূহকে পরিবর্দ্ধিত করেন। অমাবস্যা তিথিতে তিনি প্রথমে জলে, পরে লতাসমূহে বাস করিয়া, পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন লতাতে গমন করেন, তখন যদি কেহ লতা ছেদন করে, কিংবা লতার পত্রচ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাপাপের ভাগী হয়।

চন্দ্রের সহিত লতার কোন সম্বন্ধ আছে কি? চন্দ্র ওষধীশ,—এ বিশ্বাসের কোন মূল আছে কি?

বৈদিক পণ্ডিতগণ বলিবেন, ঋগ্বেদে সোমের প্রশংসা স্তুতি থাকিলেও, সেখানে চন্দ্রের নাম সোম হয় নাই। অথর্ব্ব ও শতপথব্রাহ্মণে সোমের অর্থ চন্দ্র

হইয়াছে। সোমলতা লতার শ্রেষ্ঠ ; চন্দ্রের সহিত সোমলতার সম্বন্ধ হইতে চন্দ্র ওষধীশ হইয়াছেন।

এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না। সোমলতা বৈদিক ঋষিগণের সবিশেষ আদরের লতা ছিল ; তাঁহারা সোমলতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু সোমলতার সহিত চন্দ্রের কেন সম্বন্ধ হইল ? চন্দ্র কুমুদবান্ধব,—ইহার অর্থ পাওয়া যায়। চন্দ্রের নাম ওষধীশ হইবারও কোনও কারণ থাকিতে পারে।

সূর্য্য দিবাকর, তেমনই চন্দ্র নিশাপতি। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র দৃশ্য হন না, তথাপি তিনি নিশাপতি, তারানাথ। রাত্রি নহিলে তাঁহাকে যে পাওয়া যায় না। অহর্পতি আছেন, নিশাপতিও থাকা আবশ্যক। এইরূপে রাত্রি বা অন্ধকারের সহিত লতার কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, অন্ধকার সেঁতা ঘরে আলুর যে অঙ্কুর হয়, তাহা আলোতে জাত অঙ্কুরের মত নহে। দেখা যায়, উহাদের বর্ণ এক হয় না। আঁধারে জাত অঙ্কুরের ডাঁটা শাদা, পাতা হল্‌দে ; আলোতে জাত অঙ্কুরের ডাঁটা পাতা উভয়ই সবুজবর্ণ হয়। আঁধারে জাত লতার ডাঁটা বা অন্তর্পর্ব্ব লম্বা ও সরু হয়, আলোতে জাত তেমন হয় না। প্রথম লতার পাতা ও কাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোণ ছোট হয়, পাতা ছোট হয় ; দ্বিতীয় লতার সেরূপ হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, অবিরাম আঁধারে থাকিলে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্রের বিপরীত ফল হয়। আঁধারে পাতা বাড়ে না, কাণ্ড বাড়িয়া উঠে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে, যে সময়ে আলোতে আলুর গাছ এক ইঞ্চি লম্বা হয়, সে সময়ের মধ্যে আঁধারে ১৫। ১৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। এমন কি, অতিশয় প্রখর আলোতে লতার বৃদ্ধি একেবারেই বন্ধ হয়। কিন্তু পাতার বেলায় উল্টা। অন্ধকারে পাতা ছোট হয়, মৃদু আলোতে বড় হয়, প্রখর আলোতে তত বড় হয় না। সকল গাছেরই এই রকম হয় না। খাম আলু অবিরাম অন্ধকারে বাড়ে না। যাহা হউক, দেখা যায়, আঁধার লতাবৃদ্ধির অনুকূল, আলো বৃদ্ধির প্রতিকূল।

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেওয়ালের গায়ে কোন গাছ জন্মিলে গাছটা দেওয়ালের বাহির দিকে বাঁকিয়া উঠে। দেওয়ালের দিকে আলো বেশী লাগে না, অন্য দিকে বেশী লাগে। গাছের যে পাশে আলো বেশী লাগে, সে পাশটি বেশী বাড়ে না ; যে পাশে কম লাগে, সে পাশটি বেশী বাড়ে। ফলে গাছটা বাঁকিয়া উঠে। যেন আলো পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

আলো লাগিবামাত্রই লতাবৃদ্ধি কম হয় না, তেমনই আঁধার হইবামাত্রই

বেশী হয় না। কোন কোন ওষধি লইয়া দেখা গিয়াছে, বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সময় বৃদ্ধির শেষ হইয়াছে। মধ্যাহ্নের পরে বেশী তাপ পাইলেও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কম হইয়াছে। এই পরীক্ষাগুলি শীতকালে করা গিয়াছিল।

কিন্তু কোন গাছ স্বভাবতঃ অবিরাম আঁধারে কিম্বা অবিরাম আলোতে থাকে না। দিনের বেলা আলোতে থাকে, রাত্রেই কেবল আঁধারে থাকে। এ স্থলে দেখা যায়, দিবারাত্রিভেদে লতাবৃদ্ধির কম বেশী হয়।

রাত্রে বৃদ্ধির মান অধিক, দিবসে অল্প। দিবা কিংবা রাত্রি আরম্ভ হইবা-মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। অল্পে অল্পে বৃদ্ধির মান কমে, অল্পে অল্পে বাড়ে। এইরূপে দেখা যায়, মধ্যরাত্রে বৃদ্ধি পরম না হইয়া তাহার পরে হয়।

আলোতে বৃদ্ধি কম হইবার কারণ বুঝা সহজ নহে। সে কথা এখন থাক। সূর্য্য হইতে আমরা কেবল আলো পাই না, আলোর সঙ্গে তাপও পাই। রাত্রে আলোর হ্রাস হয়, তাপেরও হয়। দিবাভাগে আলোর বৃদ্ধি, তাপেরও বৃদ্ধি। উপরে কেবল আলো ও আঁধারের গুণে লতাবৃদ্ধির বিচার করা গিয়াছে। তাপ সম্বন্ধে দেখা যায়, লতাবৃদ্ধির পক্ষে যেমন প্রখর আলোও ভাল নয়, মৃদু আলোও নয়; তেমনই প্রখর গ্রীষ্মও ভাল নয়, শীতও ভাল নয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বেশী বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোর ক্রিয়া কতটুকু, তাপের বা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। দেখা যায়, আমাদের দেশে অত্যন্ত শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে দিবসে যত গ্রীষ্ম হয়, তাহা অধিকাংশ গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ঠিক নহে; রাত্রে, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বরং ঠিক হয়। আর এক কথা আছে। আমাদের মত উদ্ভিদের দেহ হইতেও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের সময় ঘর্ম্ম অধিক নির্গত হয়। অধিক ঘর্ম্মনিঃসরণ বৃদ্ধির অনুকূল নহে।

তবেই মোটের উপর সূর্য্যতেজঃ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়, রাত্রি লতাবৃদ্ধির সহায়। মহীরুহের বৃদ্ধি সহজে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। ওষধির সহজে লক্ষ্য হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সোমলতার ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ঐ লতার বৃদ্ধির অনুকূল কারণও নিশ্চিত জানিতেন। বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিষয়টা জানিতে হইবে, এমন নয়। আমাদের ও অন্যান্য দেশের কৃষি-জীবীরা উদ্ভিদবৃদ্ধির অনুকূল কারণ জ্ঞাত আছে। বিজ্ঞানে অনেক জ্ঞাত বিষয়ের সূক্ষ্মতাসম্পাদন করে মাত্র।

তবে নিশাপতি চন্দ্র প্রকৃত পক্ষেই ওষধীশ। রাত্রিকালে ওষধি বর্দ্ধিত

হয়, দিবাভাগে হয় না। চন্দ্রই অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদগণকে পরিবর্দ্ধিত করেন। চন্দ্রের কিরণ অমৃতময়; কেন না, তাঁহার আধিপত্যসময়ে লতা বর্দ্ধিত হয়, মরে না। তিনিই যেন শিশিরসঞ্চারের কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণবৃদ্ধি করিবার কারণ। রাত্রেই চন্দ্র লতাতে গমন করেন; অমাবস্যার রাত্রে আকাশে দেখা দেন না, নিশ্চয়ই লতাতে বাস করেন। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার অন্য তিথিতে সম্ভবে না। তখন লতা কিংবা লতার পত্র ছেদন করিলে পাপ হয়। কবিচক্ষে লতা পাতার উপরে সঞ্চিত শিশির অশ্রুকণায় পরিণত হইয়াছে। লতা বা পাতা ছেদন করিলে অশ্রুধারা স্পষ্টই দেখা যায়। হেমন্তে অনেক লতারই পত্ররূপ চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে। ইহা শিশির নহে, বস্তুতঃ লতার রস। অশ্রুও আমাদের দেহের রস। ছেদন করিলে অনেক গাছই অবিরলধারায় কাঁদিতে থাকে। তাই ত দুর্দ্দান্তেরা খেজুর গাছকে কাঁদাইয়া রসসংগ্রহ করে। প্রাচীনেরা হয় ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাত্রে বৃক্ষচ্ছেদন নিষেধ করিয়াছেন; হয় ত বা বুদ্ধিসমক্ষে ক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

২। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার অভিনব প্রণালী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির সৌভাগ্যসঞ্চার-কালে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন করিয়া সেই মৃতপ্রায় জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, একনাথ স্বামী ও রামদাস স্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের ন্যায় তাঁহারা জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ও অদ্বৈতভক্তিমূলক ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়গণের লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির উৎকর্ষসাধন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে বৎসর একনাথ স্বামী সমাধিগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই

রামদাসের জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রদেশের ভক্ত-চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, "একনাথ স্বামীর আরব্ধ ব্রতের উদ্যাপন করিবার জন্য"—"গ্লানিপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসমাহিত করিবার নিমিত্ত" রামদাস স্বামীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই অসাধারণ মহাপুরুষ ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অভিনব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। প্রস্তাবান্তরে তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় আলোচিত হইবে।

রাজ্যসংস্থাপনের ন্যায় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যেও 'গঠন' ও 'রক্ষণ' নীতির প্রয়োজন হয়; রাজ্যের স্থায়িত্ববিধান করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উপায়বিধান করা যেমন আবশ্যক, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের পক্ষেও তাহা তেমনই অপরিহার্য্য। এই জন্য মহাপুরুষ রামদাস এক দিকে জ্ঞান, ভক্তি ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করিয়া অপথচারী মহারাষ্ট্রসমাজে ধর্ম্মভাবের গঠন ও বর্দ্ধন করিতেছিলেন, অন্য দিকে ধর্ম্মদ্বেষী বিজাতীয় রাজশক্তির সংঘর্ষ হইতে তাহার 'রক্ষণের' উপায়বিধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে সকল বাহ্য বিঘ্ন বা বহিঃশত্রুর অত্যাচার জাতীয় ধর্ম্মভাব-বিকাশের অন্তরায়-স্বরূপ, তাহাদের উচ্ছেদের উপায়বিধান না করিলে এই নবোদিত ধর্ম্মভাবের স্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে। প্রতীচ্যদেশের 'ক্রুসেড' ও মোসলেমদিগের 'জেহাদ' বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে স্বধর্ম্মরক্ষণ-প্রয়াসের নামান্তর-মাত্র; খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্মভাবের পুনরুজ্জীবনের যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার জন্য এইরূপ ক্রুসেডের আবশ্যক হইয়াছিল। তুকারাম প্রভৃতি যে সকল সাধু পুরুষ "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের" অন্তরঙ্গ দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, একমাত্র রামদাস স্বামী ব্যতীত তাঁহাদিগের মধ্যে আর কাহারও মনে বিজাতীয় রাজার প্রভাব হইতে ধর্ম্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের কল্পনা উদিত হয় নাই। অবহিতচিত্তে সমগ্র ভারতের ধর্ম্মসংক্রান্ত অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ-ফলে অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহপ্রিয় মোসলমানদিগের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্মরক্ষার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করিতে না পারিলে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের" শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। হয় ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ও ভক্তিমার্গ-বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার এই সংস্কার

অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেকালের মোসলমানদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্ম্মের যে অবমাননা ঘটিত, তাহা নিবারণের জন্য রামদাস স্বামীর ন্যায় স্বধর্ম্মের অভ্যুদয়কামী মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মোসলমান নরপতি ও দেশাধিকারী হিন্দু-ধর্ম্মের নিগ্রহ তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ও কোরাণসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—এই পরমোদার ভাগবতনীতি মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসকগণ প্রজাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান-স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যে প্রকৃত নীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, মোসলমান ভূপতিগণের মধ্যে প্রায় তাহার অস্তিত্ব ছিল না। শাসননীতির সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতির সংমিশ্রণ যে, সকলদেশে ও সর্ব্ব-কালে সকল নরপতির পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ, এ কথা তাঁহারা বুঝিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে কোনও নরপতি হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে স্বসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তির হানি হইত, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই কারণে মোসলমান শাসনকালে হিন্দুধর্ম্মের উপর সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরি-মাণে উৎপীড়ন হইয়াছিল। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বখরলেখক 'মল্লার রাম রাও চিটনীস বলেন,—"(যবন শাসনকালে) দাক্ষিণাত্যে (হিন্দু) ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়াছিল। বহুপ্রকারে ব্রাহ্মণগণের নিগ্রহ ও অপরিমিত গো-বধ হইত। দেবমন্দির ও তীর্থস্থানাদির ধ্বংস এবং যজ্ঞযাগাদির উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। উত্তর-ভারতে হিন্দু নরপতিগণের সহিত সখ্য নিবন্ধন দিল্লীর সম্রাট স্বরাজ্যমধ্যে হিন্দুধর্ম্মের অধিক বিড়ম্বনা করেন নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অত্যাচার সীমার অতিক্রম করিয়াছিল।" কদাচিৎ দুই এক জন সুলতান উদারপ্রকৃতি বা ধর্ম্মসম্বন্ধে সমদর্শী হইলেও, তাঁহাদিগের "দেবানুগৃহীত" স্বজাতীয়গণের হস্তে দুর্ব্বল প্রজাকুলের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই ন্যূনাধিকপরিমাণে উপহত হইত। মহীপতিকৃত ভক্তবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে, সদাশয় নরপতির শাসনকালেও রামনবমী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া হরিনামাঙ্কিত পতাকা ও বাদ্যমৃদঙ্গাদি-নিনাদ সহকারে 'নগরসঙ্কীর্ত্তন' করিতে করিতে কোনও মসজেদের নিকটবর্ত্তী হইলে "ন্যায়-নীতি-শূন্য" "ধর্ম্মোন্মত্ত যবনগণ" তাঁহা

দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার ও তাঁহাদিগের যন্ত্রপতাকাদি নষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের অশেষ লাঞ্ছনা ও উৎসবভঙ্গ করিতেন। মোসলমান জমিদারগণ মহারাষ্ট্রদেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে সময়ে সময়ে ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহের জন্যও উৎপীড়িত করিতেন। তেজস্বী মারাঠাগণ যে সকল অত্যাচারই নিঃশব্দে অবনত-মস্তকে সহ্য করিতেন, তাহা নহে। নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে হিন্দুপক্ষ হইতেও সময়ে সময়ে মসজেদ প্রভৃতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত।

সেই দুর্দ্দিনে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য বহুদিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-ধর্ম্মীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। গোলকোণ্ডার অধিপতি কর্ত্তৃক পণ্ঢরপুরের বিঠোবা দেবের মন্দির ভগ্ন হইয়া তথায় মসজেদ্ নির্ম্মাণের উপক্রম হইলে হিন্দুগণ দেবমূর্ত্তি লইয়া বিজয়নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন। একনাথ স্বামী[illegible] পিতামহ ভানুদাস কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি পুনরায় পণ্ঢরপুরে আনীত ও প্রতি[illegible] হয়। বিজয়নগর রাজ্য মোসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে দাক্ষিণাত্য হিন্দু-ধর্ম্ম এক প্রকার আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র "হিন্দুস্থানকে" "যবনস্থানে" পরিণত করিতে না পারিলে ভারতে মোসলমান শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইবে না, কোনও কোনও যবনভূপতির এরূপ সংস্কারও জন্মিয়াছিল। সুতরাং শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে অনেক হিন্দুই স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। এতদ্ভিন্ন রাজপ্রসাদলাভের বাসনায় ও জেতৃ-জাতির অনুকরণ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেও অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্য[illegible] ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা [illegible] এই সকল সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সাহসী কষ্টসহিষ্ণু আরবেরা যেরূপ প্রাচীন রোমকীয় ও রুষীয় সম্রাটের আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারাঠাগণও আদিলশাহী ও নিজামশাহী সুলতানগণের অধীনতায় কার্য্য করিয়া সমরবিদ্যায় নিপুণতা ও শাসনকার্য্যে জ্ঞানলাভ করিতেছিলেন। স্বাভাবিক কার্য্যদক্ষতা, নীতি-জ্ঞতা ও শৌর্য্যসাহসাদিগুণে তাঁহারা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের মন্ত্রণাসচিব ও সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা ও বিগ্রহ-ব্যাপারে অগ্রণীত্ব লাভ করিতেছিলেন। মোসলমানদিগের বিলাসিতা ও কার্য্যবিমুখতার জন্যও কার্য্যকুশল দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি ক্রমশঃ রাজ-কীয় কার্য্যের ভার অধিকপরিমাণে অর্পিত হইতেছিল। মোসলমান দরবারে

দেশীয়গণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতেছিল বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধুপুরুষদিগের অধ্যাত্ম-শক্তি, ক্ষমা, শান্তি ও তিতিক্ষাদিগুণ দর্শনে বিস্মিত হইয়াও অনেক মোসলমান শাসক তাঁহাদিগের নির্য্যাতনের লাঘব করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে এ সময়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজাদেশে হিন্দুগণের সার্ব্বজনিক নিগ্রহ সাধিত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের ন্যায় সেকালে হিন্দুপল্লীতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল না, প্রজাগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্মানরক্ষার জন্য কোনও প্রকার বিশেষ রাজবিধানও প্রবর্ত্তিত ছিল না। সুতরাং সুলতানদিগের সদিচ্ছা ও দুই একজন সাধুপ্রকৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সদ্ব্যবহারসত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল মোসলমান জমিদারবর্গের ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্ধ স্বজাতীয়গণের বিসদৃশ ব্যবহারে এবং মোসলমান সেনাপতিদিগের হিন্দুধর্ম্মোৎসাদন প্রথায় (১) দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ বিধর্ম্মী শাসকসম্প্রদায়ের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রামদাস, তুকারাম, রঙ্গনাথ স্বামী, বামন পণ্ডিত, মুক্তেশ্বর, বিঠ্ঠল-কবি, জয়রাম স্বামী, কেশব স্বামী ও আনন্দ মূর্ত্তি প্রভৃতি স্বদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষক-গণের যত্নে মহারাষ্ট্রবাসীর মনে স্বধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্রমশঃ আত্মসম্মান-বোধের উদ্রেক হইতেছিল। স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মী দেশবান্ধবগণের সামান্য নিগ্রহ বা অবমাননা তাঁহাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। কোথাও ধর্ম্মের উপর অত্যাচার হইলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুহৃদয়ের সহানুভূতির প্রবাহ নিঃশব্দে উৎপীড়িতের উদ্দেশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ সহানুভূতিসঞ্চারের ফলে স্বধর্ম্মের অবমাননাকারীদিগের সংস্রব ও আনুগত্যস্বীকার ক্রমে সাধারণের চক্ষে ঘৃণাজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তুকারামের ন্যায় পার্থিব-বিষয়-বিমুখ সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুপুরুষের মুখেও তখন,—

হিন্দু তুমি তুরস্কীর দাস!
তবে কেন অকারণ করিতেছ অনুক্ষণ
আপনার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশ!

৩২৩২ সংখ্যক অভঙ্গ।

---

(১) ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে কুতবশাহের সেনাপতি, আমীর জুমা দক্ষিণ মহারাষ্ট্র বা কর্ণাট দেশ বিজয়কালে অতীব ক্রূরতার সহিত হিন্দুধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। ধর্ম্মান্ধ দিল্লীশ্বরের দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাও এই শতাব্দীতেই বহুবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিল।

ইত্যাদি অতক্ষ শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ মোসলমানগণ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুদিগের অতিশয় বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বিবর্জিনী অসমদর্শিতা এবং শাসননীতির সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতির সংমিশ্রণের দোষেই মহারাষ্ট্ররাজ্য তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের স্থায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শাসনদক্ষ সম্রাটও এই ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিতে গিয়াই অজ্ঞাতসারে বিশাল মোগলরাজ্যের ভিত্তিমূল উৎখাত করিয়াছিলেন।

এক দিকে মোসলমানদিগের অসমদর্শিনী নীতির দোষে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ যেমন তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতেছিলেন, অপর দিকে তেমনই উচ্চপদ ও রাজসম্মানলাভের সহিত দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছিল। দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দ স্বধর্ম্মের বিড়ম্বনা দর্শনে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার-কামনা ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ শক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। হিন্দু সর্দ্দার ও জাইগীরদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছিলেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, মহারাষ্ট্র-সমাজের এই দুই বিভিন্নমুখী শক্তিস্রোত সম্মিলিত করিতে না পারিলে মোসলমানদিগের দমন ও মহারাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই দুষ্কর কার্য্যসাধন করিতে যে সর্ব্বাভিভাবিনী প্রতিভা, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, অসীম অধ্যবসায়, অসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও চরিত্রে তাহার সম্ভাব ছিল না। মহাত্মা শিবাজীর পিতা রাজা শাহাজী সামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার সমরকৌশল তৎকালে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র প্রবাদের স্থায় প্রথিত ছিল। তিনি নীতিকৌশলে সমসকালীন সমস্ত সর্দ্দারগণকে অতিক্রম করিয়া একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নবোদ্ভাবিত প্রণালীক্রমে তাহার শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা করিতেছিলেন। (২) কিন্তু সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতির হৃদয়ে একপ্রাণতার বীজবপনপূর্ব্বক ইতস্ততো-বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত ও একতান করিয়া "স্বরাজ্যের" অটল ভিত্তিস্থাপন দ্বারা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি লইয়া একজন অসাধারণ মহাপ্রাণ ব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা ছিল। মহারাষ্ট্রজাতির দুঃখাবসানের নিমিত্ত বিধাতা রাজা শাহাজীর পুত্রকে

(২) Walks' Sketches of the South. pp. 72/73.

সেই সকল অসাধারণ ক্ষমতায় সমলঙ্কৃত করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রামদাস যখন ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার জন্ত মহারাষ্ট্র-সমাজের বিভিন্ন-পন্থাবলম্বী শক্তিসমূহের সমন্বয়-সাধন-ক্ষম একজন যোগ্যতম নেতার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন তরুণ শিবাজী গো-ব্রাহ্মণের প্রতিপালন, স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও উচ্ছৃঙ্খল মোসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনের জন্ত তাঁহার ক্ষুদ্র ও পরিমিত শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় মোসলমানদিগের অধীন থাকিয়া সমরশিক্ষা করিয়াছিলেন, শিবাজী প্রথমে তাঁহাদিগের সহায়তা পান নাই। আলেকজাণ্ডার বা সীজার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেরূপ অনায়াসে আপনাদিগের প্রতিভার অনুরূপ উপকরণাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিবাজীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়সহকারে নানা প্রতিকূল অবস্থার অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে কার্য্যসাধনোপযোগী সমস্ত উপকরণই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই গিরিকাননচারী অসভ্য মাওলী জাতিকে সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া একটি বিশ্বস্ত ও অসমসাহসিক সৈন্তদল গঠন ও গিরিদুর্গাদির নির্ম্মাণপূর্ব্বক যেরূপ বিদ্যুদ্বেগে ও বিনা রক্তপাতে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। তিনি নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের জন্ত সেই অল্প বয়সেই যে সকল বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ, সদাচার, পরাজিত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার, রমণীকুলের সম্মানরক্ষার জন্ত আন্তরিক যত্ন, সাধুসহবাসে আকাঙ্ক্ষা এবং দর্পহীন মধুর সৌজন্ত প্রভৃতি সদ্গুণও তাঁহার অসাধারণত্বের আভাস প্রদান করিয়াছিল। কিন্ত প্রতিভাশালী রামদাস ভিন্ন সামসময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহই তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শিবাজীর অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে তদানীন্তন অন্তান্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বপ্রাধান্ত-বিস্তার-প্রয়াসী মারাঠা ভূম্যধিকারীদিগের অন্ততম বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উদ্যমশীল ও ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রামদাস যে সেই শিষ্যের চরিত্র-নিহিত অলৌকিক শক্তির অবিকশিত ছায়াময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তাঁহার

কার্য্যকলাপে মহাপ্রাণতার অস্ফুট লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অক্ষয় প্রতিভারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

স্বদেশের দুর্দ্দশামোচন ও মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বধর্ম্মের উদ্ধার-সাধনে শিবাজীকে অধ্যবসায়সম্পন্ন দেখিয়া রামদাস কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইবেন, সংকল্প করিলেন। শিবাজীও বহুদিন হইতে রামদাস স্বামীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম শক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার "দর্শন-প্রসাদ" লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বখর লেখক চিটনীস বলেন,—

"সিদ্ধপুরুষগণের অনুগ্রহাশীর্ব্বাদে ধর্ম্মসংস্থাপনের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া যাহাতে ভগবৎকৃপা-লাভ করিতে পারেন, তাহাই এই সময়ে শিবাজীর 'নিদিধ্যাস' হইয়াছিল। এই কারণে তিনি সাধুপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহাদিগের মুখে ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও পবিত্র পুরাণ-কথার শ্রবণে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সাধুপুরুষগণের ধর্ম্মোৎসব ও অন্ন-দানাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিবাজী তাঁহাদিগকে ভূমিদান ও অর্থসাহায্যও করিতেন। সমর্থ রামদাস স্বামীর সৎকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। (৩) কিন্তু রামদাস তাঁহার পরীক্ষার জন্য আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম কাননে গুপ্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবাজী কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দর্শন পান নাই। পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হওয়ায় তিনি রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎলাভের জন্য অহর্নিশি উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

শিবাজীর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তিনি সহসা একদিন রামদাস স্বামীর লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন,—

"হে মহারাজ! আপনি মেরু পর্ব্বতের তুল্য অটলসংকল্প, ধীরতার আধার, বহু লোকের আশ্রয়স্থল ও শ্রীসম্পন্ন যোগী। যাঁহার দ্বারা অহরহঃ অসংখ্য ব্যক্তির উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহার মহত্ত্বের (মহানুভাবকতার) তুলনা কোথায়? হে নরপতি! আপনি হয়-পতি, গজপতি, দুর্গপতি ও ধরণীর অধীশ্বর, পুরন্দর ও শক্তি আপনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে-ছেন। রাজন! আপনি যশোবান্, কীর্ত্তিমান্; পুণ্যবান্ ও ক্ষমতাবান্; এবং জ্ঞানবান্ ও সুনীতিসম্পন্ন। আপনার সদাচারপরায়ণতা ও সুবিবেচকতা, দানশীলতা ও ধর্ম্মশীলতা, বিজ্ঞতা ও সর্ব্বত্র সুশীলতা সুপ্রসিদ্ধ। আপনি ধীর, গম্ভীর ও শূরকার্য্যে তৎপর। হে নৃপবর! সাবধানতায় আপনি সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

---

(৩) মহীপতি বলেন, শিবাজী একদিন মৃগয়ার্থ কোনও গভীর বনে প্রবেশ করিলে তথায় সহসা তিনি যোগমগ্ন রামদাস স্বামীকে দেখিতে পান। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া শিবাজী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামদাসকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ শাপদ ক্রীড়া করিতেছিল দেখিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তদবধি রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর প্রবল হইল।

"আমাদিগের তীর্থক্ষেত্র সকল [illegible] হইয়াছে ; ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিসমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপদপূর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমাদিগের ধর্ম্মের, দেবমূর্ত্তিসমূহের ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়স্থ হইয়া প্রেরণা (আপনাকে উদ্বুদ্ধ) করিয়াছেন। আপনার নিকট বহুসংখ্যক পণ্ডিত, পুরাণবেত্তা, কবিশ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার্কিক ও চতুর সভানায়ক আছেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন, সম্প্রতি ভূমণ্ডলে এরূপ কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হইতেছেন না। কেবল আপনারই যত্নে 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' এখনও কিয়ৎপরিমাণে সজীব রহিয়াছে। আপনার সহায়তায় এখনও নানা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, আপনার আশ্রয়ে কত লোক সুখে কালযাপন করিতেছে ; মহারাজ ! আপনিই ধন্য, যে হেতু জগতে সর্ব্বত্র আপনার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। হে কল্যাণীয় রাজা শিব ! আপনি কত দুষ্টের বিনাশসাধন করিয়াছেন, কত লোকের ভয় দূর করিয়াছেন, কত লোককে আশ্রয়দান করিয়াছেন। আপনার দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু আপনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই ! কি জানি, আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রারব্ধ ফলেই বা আপনার এরূপ স্মৃতিবিভ্রম ঘটিল। যাহা হউক আপনারা সকলে বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক, আপনাদিগকে অধিক আর কি বলিব ? ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কীর্ত্তি আপনাকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। বিবিধ রাজকার্য্যের বাহুল্যবশতঃ আপনার চিত্ত হয় ত এখন ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিকরূপে আপনাকে এই পত্র লিখিলাম—দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

এই পত্র পাঠ করিয়া শিবাজীর "নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত ও শরীর রোমাঞ্চিত" হইল। তাঁহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বর্দ্ধনের জন্য পত্রের আরম্ভভাগে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি যেরূপ হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের দুর্গতির বর্ণনাপাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রয়াস যে কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে, এবং রামদাস স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা তাঁহার উদ্যম প্রশংসিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনের অনুরোধ" রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। রামদাস স্বামী তাঁহার কার্য্যাবলীর নিগূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া শিবাজী তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চরণদর্শনের জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহা জানাইয়া তাঁহাকে একখানি বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে শিবাজী কোনও কথকের মুখে ধ্রুবোপাখ্যান-শ্রবণপ্রসঙ্গে অবগত হইয়াছিলেন যে, গুরূপদেশ ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

তদবধি কোনও মহাপুরুষের নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিবার বাসনা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। তিনি সামসময়িক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষগণের মধ্যে অনেকেরই সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তিনি তখনও তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। সমর্থ রামদাস স্বামীর অধ্যাত্মশক্তির প্রশংসা ও দেশের সমস্ত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া শিবাজীর হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দর্শনলাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে স্বামীর প্রেরিত উৎসাহপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শিবাজীর শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। রাজপুত্র মহারাষ্ট্র-সাধু-সমাজের নেতা "মহাসমর্থ" রামদাস স্বামীকে তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন, সংকল্প করিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া জননী জীজীবাঈয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কতিপয় অনুচর সহ স্বামীজীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্ব্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ হইল। তিনি সমর্থের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রোপদেশগ্রহণের ও তাঁহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামী বলিলেন, "তুমি প্রাসাদবিহারী রাজ-পুত্র, আমরা অরণ্যচর সন্ন্যাসী; ধর্ম্মসাধনও সহজসাধ্য নহে। অতএব তুমি এই বিসদৃশ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। অকারণ 'ভেক ধারণ' করিয়া জগৎকে প্রতারিত করার ফল কি ?" (৪) এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাষ্পাকুল-লোচনে বলিলেন,—"রাজ্যধন সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহপ্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হউক।" (৫) শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে স্বামী তাঁহাকে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত "দাসবোধ" নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ দশকের (অধ্যায়ের) ষষ্ঠ সমাসে (পরিচ্ছেদে) অবিকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(৪) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয়, চিটনীস-রচিত শিবাজীর বখর ও শিবদিগ্বিজয়।

(৫) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয় ও চিটনীস-কৃত [illegible]

এই ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খৃঃ) বৈশাখ-শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে সংঘটিত হয়। (৬)

---

(৬) মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলেন,—১৬৫৫ খৃঃ জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে ও ১৬৬১ খৃঃ শৃঙ্গারপুরের স্বাধীন জমিদার 'সুর্বই'কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যাহরণ করায় শিবাজী স্বদেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই কারণে, সাধারণের সহানুভূতিলাভের আশায় তিনি ১৬৬১ খৃঃ প্রতাপগড়ে ভবানীদেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও দেশের প্রসিদ্ধ সাধু রামদাস স্বামীর মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, সাহেব মহোদয়ের মতে শিবাজী "লোক ভুলাইবার জন্য" ধার্ম্মিকতার ভান করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফের এই উক্তি নিতান্তই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। আমরা কোনও গ্রন্থেই এই উক্তির পোষক কোনও প্রমাণের উল্লেখ পাই নাই। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম ১৬১৭ শকের (১৬৯৫ খৃঃ) মাঘ শুক্লা সপ্তমী শুক্রবারে প্রতাপগড়ের মন্দিরের পূজারীকে যে রাজমুদ্রাঙ্কিত অভয়পত্র (সনন্দ) দান করিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি বিগত ১৮৯৬ সালের ১৯শে মে তারিখের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আফজলখাঁর হত্যার অব্যবহিত পরে প্রতাপগড়ের ভবানীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে শিবাজী শৃঙ্গারপুর অধিকার করেন। জাওলীর রাজ্য ইহার বহু পূর্ব্বে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে ভবানীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার সহিত উক্ত রাজ্যদ্বয়গ্রহণের যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভবানীভক্ত শিবাজী যে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি-লাভের জন্যই ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া প্রতাপগড়ে ভবানীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

রামদাস স্বামীর উপদেশ সম্বন্ধেও আমরা সাহেব মহোদয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা শিবাজীর দীক্ষা-গ্রহণের যে অব্দ নির্ণয় করিয়াছি, সমস্ত বখর-লেখকই একবাক্যে তাহার সমর্থন করেন। ডফ মহোদয় ১৬৬১ অব্দ কোথায় পাইলেন, বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তিনিও পাদটীকায় এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই। শিবাজীর জাওলী রাজ্য ও শৃঙ্গারপুর গ্রহণে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ যে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোনও আভাস কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই নাই। শৃঙ্গারপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, শিবাজী ন্যায়যুদ্ধে তাহা অধিকার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য মহারাষ্ট্রবাসীর অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না। জাওলী রাজ্য শৃঙ্গারপুর অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ ও দেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উহার অধিকার করিতে শিবাজীকে কূটকৌশলের অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ডফ মহোদয় বলেন, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক জাওলীপতির বিধ্বংসাধন করায় শিবাজীর প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও শিবাজীর দীক্ষাগ্রহণের সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধকল্পনা সুসঙ্গত [illegible] খৃঃ জাওলী-বিজয়ে যে কলঙ্ক অর্জ্জিত হইয়া-

স্বামীর উপদেশে "আত্মজ্ঞান" লাভ করিয়া সংকল্পবিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিল। রামদাস তাঁহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে তিনি বলিলেন,—"রাজ্য-বৈভব ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আর এই 'দুর্নিবার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণসেবায় জীবন-পাতপূর্ব্বক পরমার্থসাধন করিব।" ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয়ভঞ্জনের জন্য তাঁহাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে ধর্ম্মপালন করিয়া জনক, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপে মোক্ষপদবীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা "শিবদিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে এ স্থলে অবিকল অনূদিত হইল,—

"যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে; তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ চণ্ড পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে; সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে; নামসংকীর্ত্তন বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল হইয়াছেন; এই সঙ্কটকালে সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগম হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে; দেবতাগণ (দেবমূর্ত্তিসমূহ) অত্যাচারভয়ে লুকায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবন-দিগের অনুকারী হইয়াছে। যবনগণ (দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি?) বিবিধ কটুভাষা ব্যবহার করে; নানা প্রকারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়, রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া (যবনদিগের বিরুদ্ধে) তোমায় যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বরাংশ-সম্ভূত পুরুষ, তুমি প্রজাদিগের কিছু হিতসাধন কর। এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্ম্মস্থাপন করা তোমার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন কর; নিজের প্রাণ দান করিয়াও তাহাদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্ম্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ধর্ম্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা; সত্যপথে বিচরণ করিলে ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম লাভ হয়। আপনার রাজ্য-রক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরিকুল সংহার করেন, জগতে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধক কীর্ত্তি প্রচারিত হয়। সকলের প্রতি আনন্দময় ভাব ধারণ করিবে; শৌর্য্যসহকারে উপার্জ্জন করিবে, উপার্জ্জনকারী জগতে সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। (শিবদিগ্বিজয়; ৩৮১ পৃষ্ঠা)।

ছিল, তাহা প্রক্ষালন করিবার জন্য ১৬৭১ অব্দে শিবাজীর রামদাস স্বামীর নিকট [illegible] গ্রহণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি?

তুমি ক্ষত্রিয়, অতএব ক্ষাত্রধর্ম্মী পুরুষদিগের ন্যায় রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করিয়া দেবব্রাহ্মণের সেবা, ধর্ম্মসংস্থাপন ও দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর। এ বিষয়ে রঘুপতির ইচ্ছা এই যে,—ম্লেচ্ছদিগের এই বহু দিবসের অত্যাচার ও উদ্দাম ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে 'বিধ্বস্ত' করিয়া তুমি রাজ্যপালনের ভার গ্রহণ কর।"—রামদাস স্বামীর বখর। (৭)

এইরূপ উপদেশে শিবাজীর বৈরাগ্য তিরোহিত হইল। তিনি গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন তিনি বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সহ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক রাজকীয় সমারোহের সহিত সমর্থের পূজা করিলেন। নিঃস্পৃহ রামদাস বস্ত্র-ভূষণ-মাল্যদ্রব্যাদি পূজোপচারসমূহ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া কাননান্তরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর শিষ্যগণ শিবাজীকে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বিদায় করিলেন।

স্বামীর উপদেশে শিবাজী এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ স্বামীর দর্শনার্থ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামদাস কখন কোথায় বাস করিতেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়া তিনি শিবাজীকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বরচিত "দাসবোধ" (৮) নামক "পরমার্থ গ্রন্থ" প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই গ্রন্থ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পাঠ ও ইষ্টদেবতার উপাসনা করিলে আমার দর্শনের ফললাভ হইবে।" শিবাজীকে অগত্যা এই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

স্বধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া রামদাস কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, শিবাজীর প্রতি তাঁহার উপদেশে পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য তিনি যে অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারও আভাস উল্লিখিত উপদেশে পাওয়া যায়। স্বদেশবাসীর হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মোন্মাদের উদ্রেক করিতে না পারিলে বিজাতীয় শাসনের প্রভাব হইতে স্বধর্ম্মকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না দেখিয়া রামদাস সকলকে ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র মরাঠাজাতিকে লক্ষ্য করিয়া

---

(৭) ম্লেচ্ছ ও যবন শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তুল্যার্থবোধক; অন্ততঃ রামদাস মোসলমানদিগের সম্বন্ধে উভয় শব্দেরই নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা অনুবাদে মূলের শব্দগুলি যথাযথ ও অবিকৃত রাখিয়াছি।

(৮) দাসবোধ তখনও সমস্ত রচিত হয় নাই। যে অংশটুকু রচিত হইয়াছিল, তাহাই রামদাস শিবাজীকে পাঠ করিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন; ইহা অসম্ভব নহে। দাসবোধ একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভসংগ্রহ পুস্তক।

[illegible] কর্মচারীদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মসম্বন্ধে যে দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই ভাব সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। এই [illegible] আমরা এ স্থলে তাহার একাংশের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"এইবার পরম দুর্লভ ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রবণ কর। যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত নহে—অন্য কোনও উপায়ে উদরপূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। যাহারা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহাদিগকে ইহলোকে লজ্জা ও অপমান এবং মরণান্তে নরক ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। সমরে শত্রুনাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে সদ্‌গতি লাভ হয়; এবং শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিলে মহান্ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারা যায়। কামানের গোলা যেরূপ নির্ভয়ে সৈন্যদলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইলে শত্রুদিগের জন্য আর ভয় কি? ব্যাঘ্র যেরূপ সকলসমক্ষে মৃগযূথকে ধরাশায়ী করে, (ঐরূপে উত্থিত হইলে) শত্রুদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে পারা যায়। পুরুষের সাহস পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেই জয় লাভ হয়।

"দেশের সমস্ত দেবমূর্ত্তি উৎসাদিত হইয়াছে, আমাদিগের ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হইয়াছে! এরূপ অবস্থায় আমাদিগের জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয়কে একত্র কর, আপনাদিগের 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের' বিস্তার কর। এই কার্য্যের সহায়কারী না হইলে পূর্ব্বপুরুষগণ উপহাস করিবেন। মরণের আহ্বান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; শত যত্ন করিলেও শরীর রক্ষা হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য, তাহা বিবেকের সাহায্যে অবধারণ কর। যাঁহারা উচ্চবংশসম্ভূত বলিয়া সাহঙ্কারে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সময়ে যথাসত্বর 'হাজির' (কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ) হউন। এ সময়ে আলস্য ও অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে ইহ পরলোকে কষ্ট পাইতে হইবে। [illegible] পুরুষগণ যদি সদ্গতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া ভাল বলিব? এই কথায় যদি আপনাদিগের ক্রোধোদয় হয়, তাহা হইলে আমায় প্রতি ক্ষমা [illegible] করিতে হইবে। দেবদ্রোহীদিগকে কুকুর জ্ঞানে মারিয়া তাড়াইয়া দাও। নিশ্চয় জানিও যে, দেবভক্তগণই জয়লাভ করিয়া থাকেন। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণ কর; একোদ্যমে সকলে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দেশ বিজয় কর; [illegible] প্রদেশসমূহ হস্তচ্যুত হইতে দিও না। আপনাদের দেশ রক্ষা কর, এবং তাহার মধ্যে যাহারা পরকীয় (স্বদেশদ্রোহী?), তাহাদিগকে আনিয়া [illegible] তাহাদিগের সংহার কর। [illegible], বিচার, সাবধানতা ও দীর্ঘ প্রযত্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া তুলজাদেবীর (ভবানীর) বরপ্রসাদে রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

হিন্দুধর্ম্মের সেই নির্য্যাতনের যুগে এরূপ উপদেশ প্রকৃতই [illegible] ছিল। যখন,—

যবনাক্রান্ত-পবনাশ্বশোভিনো
ভব-নাম্বশারি-ভবনাভিমর্দ্দিনঃ।
সবনাদিকর্ম্ম-নবনাশ-দীক্ষিতা
যবনাশ্চরন্তি ভুবনা বিভীষণাঃ।—বিশ্বগুণাদর্শ; ২১৮

হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ করিবার জন্য যবনদিগের দুর্দ্ধর্ষ তুরগসেনা ভৈরববেশে দেশে দেশে দেবমন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া বেড়াইত, (৯) তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য এইরূপ উপদেশের যে অতীব আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? রামদাস স্বামীর এই উপদেশামৃত পান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অমর শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে, তাঁহারা কখনই এত অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হইতেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে লুণ্ঠনপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল দস্যুদল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি রামদাস স্বামীর এই উপদেশাবলীর মর্ম্মানুধাবন করেন, তাহা হইলে Sydney Owen মহোদয়ের সহিত একবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে,—

Shivaji and his people even in their warfare were by no means mere bandits. A halo of heroism, patriotism and religious zeal invested their proceedings and induced them to regard the Son of Shahji as a predestined, devinely favoured, indeed as an inspired deliverer. *** Both Shivaji and his original followers might well hold and did hold that in waging war after their own fashion with the Mosalmans, they were doing both God and man good service."—India on the Eve of British Conquest pp. 129/30.

সামসময়িক কবি ব্যঙ্কটাধ্বরি যথার্থই বলিয়াছেন —

শাবাটক্ তয়া তরাবহপতিঃ প্রত্যর্থি-পৃথ্বীভুজাম্
মহারাষ্ট্র-ভটচ্ছটা রণপটুর্যো পর্য্যটত্যেষ চেৎ।

(৯) উল্লিখিত শ্লোকের রচয়িতা ব্যঙ্কটাধ্বরি কাঞ্চীপুরের (বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরমের) অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত হয়। সামসময়িক কবির এই বর্ণনা অত্যুক্তিমূলক নহে। মোসলমানদিগের সহৃদয়তা ও রাজদরবারে দেশীয়দিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এরূপ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ যদিও কিয়ৎ-পরিমাণে ক[illegible]য়াছিল, তথাপি মোসলমান সেনাপতিদিগের দেশবিজয়কালে ধর্ম্মোৎসাদনের প্রথার কিছুমাত্র [illegible] নাই। আমীর খুস্রোর কর্ণাটবিজয় ও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অভিযান এ[illegible]স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

যেবব্রাহ্মণবর্গ-নিগ্রহকৃতো দেশাংস্তরক্ষা ইমে
নিক্ষিপ্ত-মনোরথা বিতনুয়ুর্নির্দ্দৈবভূমিস্থমান্॥ ১৯২
যেব-ক্ষোণীন্দ্র-হিতকৃতে দামিতম্লেচ্ছপংক্তে—
র্মহ্যাং গীহ্যা কথমপি মহারাষ্ট্র যুথস্য চেষ্টা।
ব্যাধিস্থাহৃপ্রতিহতিকৃতা ব্যক্তমুগ্রৌষধানাং
কারারোগ-প্রণয়ি-হৃদয়ৈঃ কার্তিবং বর্ণনীয়ং॥ ১৯৩

হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক ইংরাজ ইতিহাস-লেখক মহারাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রোন্নতির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। তদনীন্তন মহারাষ্ট্র সাহিত্যে সেকালের মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্মত্ত হৃদয়ের যে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ-লেখকই তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং ইংরাজ-রচিত দুই একখানি ইতিহাস-গ্রন্থ যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, তাঁহাদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্যকলাপ যে দস্যুজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাব বিচিত্রতা কি? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ইংরাজদিগের মধ্যে সিডনী ওয়েন মহোদয় ভিন্ন আর কোনও লেখক যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রীয় উন্নতির এই নিগূঢ় কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।

রামদাস স্বামীর উপদেশাবলীর মধ্যে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" শব্দের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ অভিনব শব্দটি এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির স্বরচিত—সামসময়িক অন্য কোনও কবির বা সাধুপুরুষের গ্রন্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় না। আমাদিগের বোধ হয়, স্বধর্ম্মের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুরাগবর্দ্ধনের জন্যই তিনি ঐ শব্দটির গঠন করিয়াছিলেন। "হিন্দুধর্ম্ম" ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব সকলেরই রক্ষণীয়। যাহা সাধারণের সম্পত্তি, তাহার অবস্থা অনেকে স্থলেই "ভাগের মাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির" ন্যায় ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, মহারাষ্ট্র দেশে নব ধর্ম্মভাবের (ভাগবত ধর্ম্মের) প্রবর্ত্তনাকালে নীতিজ্ঞ রামদাস উহাকে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" নামে পরিচিত করিলেন। সুতরাং উহার রক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্কন্ধেই পতিত হইল। "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মকে" আপনাদিগের বিশিষ্ট সম্পত্তি বলিয়া মনে হওয়ায় তাঁহাদিগের অনুরাগ-স্রোত স্বতঃই তাহার দিকে ধাবিত হইয়া রামদাস স্বামীর উদ্দেশ্যের সফলতাসাধন করিল।

শ্রীসখারাম [illegible] দেউস্কর।

ভারতবর্ষে।

২।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীর শিষ্য মিনা বাহাদুর রাণা নেপালের এক জন ভূতপূর্ব্ব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিষয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ইনি সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ। ইঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইনি সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কুটীরবাসে, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের (খৃষ্ট) ধর্ম্মের মত। খৃষ্ট ধনবানদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দীনভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমেরিকান ও ইংরাজ ধনিগণ এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মের বিশাল বলের ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন; তথাপি কত লোক সেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকে! তাহারা মিনা বাহাদুর রাণাকেও উপহাস করিবে, এবং তাঁহাকে বুদ্ধিধৈর্য্যহীন বলিবে। তিনি শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকরণ জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কত খৃষ্টানও এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ইঁহাকে বুদ্ধিধৈর্য্যহীন বলিবে! লোকে যাহা বলে বলুক, আমি কিন্তু ইঁহাকে শ্রদ্ধা করি। এ শ্রদ্ধা মৌখিক শ্রদ্ধামাত্র নহে,—আন্তরিক। তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে; কেহ তোমাকে সেরূপ শ্রদ্ধা করিতে বলেও না। কিন্তু চেষ্টা করিলে তুমি এই সকলের প্রতি তাঁহার প্রবল বিশ্বাসকে ভক্তি করিতে পার। আরও একটু চেষ্টা করিলে তুমি তাঁহাকেও ভক্তি করিতে পার। তবে সে কার্য্য বড়ই কঠিন, তাই আমরা প্রায়ই সে বিষয়ে চেষ্টা করি না। কোন লোকের বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের বিশ্বাস একরূপ না হইলেই আমরা তাহাকে বুদ্ধিধৈর্য্যহীন বলি। পূর্ব্বে ভিন্নবিশ্বাসীদিগকে আমরা অনলে দগ্ধ করিতাম, এখন আর তাহা করিতে পারি না, তাই তাহাদিগকে বুদ্ধিধৈর্য্যহীন বলিয়াই নিরস্ত হই।

সিড্‌নিতে গ্রন্থকারের সহিত এক জন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন,—

ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার না হওয়ায় ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হয়। তাহারা শুনে যে, ভারতবাসীরা সহজবিশ্বাসশীল ও অলৌকিক ঘটনায় দৃঢ়বিশ্বাসবান্। কাজেই তাহারা বলে যে, এই সহজবিশ্বাসশীল ভারতবাসীরা অতি সহজেই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে,

আর সেই সঙ্গে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিলে তাহাদের অবিশ্বাসের আর কোনও কারণই থাকিবে না। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তাহারা মনে করে যে, কেবল ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দোষেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার অন্যরূপ। আমাদিগের বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকলের মত কার্য্যকর হয় না। হিন্দুধর্ম্মের সকল খুঁটিনাটি অলৌকিক ঘটনার উপর সংস্থাপিত ও অলৌকিক ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত। আমাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা না হইলে তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করান সহজ হইবে না। আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে গমন করি, তখন আমার (তদ্দেশীয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করা) কার্য্য অতি সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে ভ্রম অতি অল্পদিনেই অপনোদিত হইয়াছিল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই বাল্যকল্পনা অলৌকিক ঘটনাপ্রিয় জাতিকে অলৌকিক ঘটনার সহিত ধর্ম্মের কথা বলিলেই তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই বিশ্বাসে আমি সোৎসাহে তাহাদিগের নিকট Samsonএর কাহিনী বলিতে লাগিলাম। প্রথমে তাহারা বিশেষ মনোযোগসহকারে আমার কথা শুনিতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম, ক্রমেই তাহাদিগের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। শেষে বুঝিলাম, আমার এত কথায় তাহাদিগের কোন মনোভাব স্থায়ী হয় নাই।

এক জন বৃদ্ধ হিন্দু আমাকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা হিন্দুরা কেবল তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি; অন্য কোনও প্রমাণে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও বোধ করি এইরূপ মনে করেন। যখন কোন মানব কোন মানবক্ষমতাতীত কার্য্য করে, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সে দৈববলে বলী, তাহার শক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও এইরূপ কার্য্য দেখিয়া বুঝেন যে, সেই কর্ম্মকারী ঈশ্বরের ক্ষমতায় পূর্ণ। স্যামসনের কেশে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল; কারণ দেখা গেল, কেশের সহিত তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। হিন্দুদিগেরও এই মত।

* * * *

'স্যামসনের এই দৈববল ছিল বলিয়াই তিনি এক গর্দ্দভের গণ্ড-অস্থি দিয়া সহস্র শত্রুনরকে নিহত করিতে পারিয়াছিলেন;—সেই দৈববলেই নগরতোরণ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আপনারা ইহাতে ভীত ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া পড়েন, কারণ আপনারা দেখেন যে, সে অসাধারণ শক্তির মূলে দৈববল। কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই; কারণ, আমাদিগের দেবতারা যখন হনুমানকে [illegible] দিয়াছিলেন, তখন দৈববলে বলী হনুমানের কীর্ত্তির তুলনায় স্যামসনের কীর্ত্তি [illegible], [illegible] এই কারণেই হিন্দু শ্রোতৃগণ আপনার কথায় বিস্মিত হয় না।

'যখন পুরাকালে ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্রের লঙ্কায় গমনের জন্য সিন্ধুনদীতে সেতুনির্ম্মাণের আবশ্যক হইয়াছিল, তখন রামসেবক দৈববলে বলী হনুমান দুই দিনে সার্দ্ধ শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া হিমাচল-পর্ব্বতখণ্ড আনয়ন করে ও তদ্দ্বারা সেতুবন্ধন করে। বিপদকালে গোবর্দ্ধনবাসীরা তাহার [illegible] অবধি রক্ষিত পাইল; সে পর্ব্বতকে [illegible]

হইয়া উঠিতে না দিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া তাহারা দেখিল, চিরতুষারমুকুটমণ্ডিত গগনস্পর্শী গিরীশ্বরসমূহ অগ্রসর হইতেছে, পর্ব্বতাঙ্গে শত শুভ্র গভীর আলোক সেই দৈশশৃঙ্গকে জ্যোতির্ম্ময় প্রতীয়মান হইতেছে। এই পর্ব্বত হইতে যেশক্রোশব্যাপী একাংশ খলিত হইয়া সেখানে পতিত হইল। তাহার অর্দ্ধাংশ কালে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; এখনও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান। হনুমানের মত ঐশ্বরিক শক্তির সহায় ব্যতীত হনুমান এ কার্য্য করিতে পারিত না। হনুমানের শক্তির বিষয়ে কিংবদন্তী ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই;—সে তোরণ আজ আর দৃষ্ট হয় না; কিন্তু গিরিগোবর্দ্ধন এখনও বর্ত্তমান।"

গ্রন্থকার বারাণসী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ক্লাইভ্ ও হেষ্টিংস উভয়ের কাহারও কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই, অথচ কোন [illegible]ক অক্টারলোনীর নামে এক সমুচ্চ 'মনুমেন্ট' আছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং গমনকালে পথে একটা ব্যাপার দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন,—

"[illegible] দুই ঘণ্টাকাল আমি এক জনও স্ত্রীলোক কি বালককে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখি [illegible]দের ধর্ম্মযাজকদিগের একটি মধুর গীত আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, গ্রীনল্যাণ্ড [illegible] ও আফ্রিকা,—নানা দেশ হইতে লোকে তাহাদিগের দেশ ভ্রান্তিমুক্ত করিবার [illegible]দিগকে (খৃষ্টানদিগকে) আহ্বান করিতেছে।*

[illegible] কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাদিগের আহ্বানে আমরা যখন এ দেশ ভ্রান্তিমুক্ত করিতে আসিব, আশা করি, তখন আমরা আমাদিগের সমুচ্চ প্রতীচ্য সভ্যতার কতক অংশ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের (এই বিধর্ম্মীদিগের) সভ্যতার কতক অংশ লইয়া আমাদিগের সভ্যতা সমুজ্জ্বল করিয়া লইব। আমরা যদি ইহাদিগকে উন্নত করিতে চাহি, তবে ইহাদিগের [illegible] আমাদেরও একটু উন্নত হওয়া আবশ্যক। বহুদিন পূর্ব্বে আমি একবার প্যাটেগোনিয়ায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়াছিলাম;—'রোম্যান-ক্যাথলিক' ধর্ম্মাবলম্বীরা সেখানকার অধিবাসী। বোধ করি, বারাণসীবাসীরাও তত গাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে। আমার ভূতকালের ডায়েরীতে দেখিতে পাই,—

---

* "From Greenland's icy mountains,
From India's coral strand,
Where Afric's sunny fountains
Roll down their golden sand,
From many an ancient river,
From many a palmy plain,
They call us to deliver
Their land from error's chain."

গত কল্য সুন্দর সুদৃঢ় রাজ্যপথ দিয়া বহু দূর ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সে পথের আনন্দ দুই কারণে নষ্ট হইয়াছিল;—প্রথমতঃ, পথিপার্শ্বে ধর্ম্মালয়; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রে অতিদুঃখী স্ত্রীলোকদিগের কঠোর শ্রম। পথিপার্শ্বে প্রচুর ধর্ম্মালয়ে ক্রুশোপরি খৃষ্টের লৌহকীলক ও কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—রক্তাক্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থান হইতে ভারতীয় খৃষ্টান প্রচারকগণ কি বিদেশে দেবমূর্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন? আর দেখিলাম, পথিপার্শ্বে কোথাও সপ্তর কি অশীতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধারাও ক্ষেত্রের ফসল আঁটি করিয়া বাঁধিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিতেছে।

ইহার পর আমি অষ্ট্রিয়ায় যাই। পরে আমি মিউনিচে গমন করি। মিউনিচে দেখিয়াছি, বৃদ্ধারা গুরুভার মদ্যের পিপায় বোঝাই ঠেলাগাড়ী চড়াই ও উৎরাই সঙ্কুল পর্ব্বতপথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমার অষ্ট্রিয়ার লিখিত ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম,—ক্ষেত্রে কর্ষণকার্য্যের জন্য লাঙ্গলে একটি স্ত্রীলোক ও একটি গোজাতীয় জীব একত্র বদ্ধ দেখিতে পাই,—চালক এক জন পুরুষ। রিজেন্সবার্গ সহরে প্রকাশ্য রাজপথে দেখিলাম, এক বৃদ্ধা ও একটি কুকুর একত্র বদ্ধ,—তাহারা একখানি 'স্লেজ' গাড়ী টানিতেছে; পুরুষ চালক নিশ্চিন্তচিত্তে ধূমপান করিতে করিতে যাইতেছে;—তাহার বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসরও হইবে না।

পাঁচ কি ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার রোন নদীতে বারদিনব্যাপী নৌভ্রমণে বাহির হই। তখনকার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম, * * * * অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলাম। সে দিন সেখানে অবস্থান করাই স্থির করিলাম। অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতে লাগিল; শীত প্রবল; "ওভারকোট" পরিয়া শীত ভাঙ্গে না—তাহার উপর আবার "র‍্যাগ্" জড়ান আবশ্যক। বৃষ্টির ফোঁটা এতই বড় যে, জলে প্রস্তর-খণ্ডপতনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুই এক জন কৃষক ব্যতীত কোনও পুরুষ গৃহের বাহির হইতেছে না। এ সকল প্রদেশে স্ত্রীলোকের পক্ষে সকল সময়ই সমান।—স্ত্রীলোকের আর পশুদিগের দাসত্বের বিরাম নাই।

আমি যখন সেখানে উপনীত হইলাম, তখন তিন জন স্ত্রীলোক নদীতীরে কাপড় কাচিতেছিল। যতক্ষণ দিবসের আলোকে কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া না উঠিল, ততক্ষণ তাহারা সেই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তাহাদিগের মধ্যে এক জনের বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসর,—আর এক জনের বোধ করি পঞ্চাশ,—তৃতীয়ার বোধ করি আশী বৎসর। তাহাদিগের 'ওয়াটার-প্রুফ' কি অন্য কোনও প্রকার বারিনিবারক আচ্ছাদন নাই, আছে কেবল মস্তকে এক একখণ্ড চটের ছালা। বৃষ্টিধারার অধিকাংশ সেই ছালা বাহিয়া ভূমিতে পড়িতেছে—আর অবশিষ্টাংশ তাহাদিগের গাত্র সিক্ত করিতেছে।

কিছু ক্ষণ পরে এক জন বলিষ্ঠ যুবক ছাতা মাথায় দিয়া—চুরুট টানিতে টানিতে একখানি গর্দ্দভ-শকটে আরোহণ করিয়া সেইখানে উপনীত হইল। সে বোধ করি বৃদ্ধার পৌত্র, প্রৌঢ়ার পুত্র, যুবতীর পতি। সে গাড়ীতে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগকে হুকুম করিতে লাগিল, আর হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক কয় জন তাহার হুকুম

নীরবে ভ্রমণ করিতে লাগিল ;—তাহারা গাড়ীতে ছয় ঝুড়ী আর্দ্র বস্ত্র তুলিয়া দিল। সেই ঝুড়ীগুলি এতই ভারি যে, বোধ করি এক জন সাধারণবলশালী ব্যক্তি সেগুলি সহজে তুলিতে পারে না। গাড়ী বোঝাই হইলে যুবক অবতরণ করিয়া ছাতা মাথায় সরাইয়ে প্রবেশ করিল; আর স্ত্রীলোক কয়টি ভিজিতে ভিজিতে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে ফিরিল। আমি আসিয়া দেখিলাম, যুবক সরাইয়ে সুরা ও খাদ্য লইয়া বসিয়াছে—তাহার হস্তে একখানি ধর্ম্মপত্র রহিয়াছে। দেশে এই দুর্দ্দশা—আর গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স অন্যান্য অসভ্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেছে! এই রমণীদিগের মত অত্যাচারপীড়িতা-দিগের দুর্দ্দশামোচন কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে ?

একটি কবিতায় আছে যে, ভারতবর্ষে সকলই সুন্দর, কেবল মানবই নীচ। তাহার কারণ এই যে, ব্যাভেরিয়ার, অষ্ট্রিয়ার ও ফ্রান্সের 'সভ্যতা' আজও ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে আর অধিক বিলম্ব নাই। সে 'সভ্যতা' আসিতেছে। সে 'সভ্যতা' ভারতবর্ষকে 'উদ্ধার' করিবে—তাহার 'নীচতা' বিদূরিত করিবে।

ইহার পর লেখক সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্নদর্শনাভিলাষে কানপুরে ও লক্ষ্নৌ সহরে গমন করেন। পরে নয়নাভিরাম তাজমহল দেখিবার জন্য তিনি আগ্রায় উপনীত হন। তাজমহলে ইংরাজগণ সময়ে সময়ে ভোজ ও নাচ দিয়া থাকেন শুনিয়া, লেখক বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

সত্য কথা বলিতে কি—আমরা যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুকেই আমরা অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; সেই সকল বস্তুই যে অপরে পবিত্র বলিয়া মনে করে, তাহা আমরা একবার মনেও করি না। কিন্তু একটা রহস্য দেখুন—আমরা যাহাকে শ্রদ্ধা করি, কেহ তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলে আমরা বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হই। যদি এক দিন সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, এক জন অভিজাতবংশীয় ইংরাজ (আমেরিকায়) 'মাউণ্ট ভার্ণনে' যাইয়া ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে ভোজন ও নৃত্যগীতাদি সম্পন্ন করিয়াছে, তবে আমরা (আমেরিকানরা) কতই ক্রুদ্ধ হই—সেই ইংরাজদিগকে কত শক্ত কথা শুনাই। আবার যদি ইংরাজগণ এক দিন শুনে যে, এক দল আমেরিকান 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে'তে যাইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছে, তবে তাহারা কতই ক্রুদ্ধ হয়—সেই আমেরিকানদিগকে কতই কুকথা কহে।

'মাউণ্ট ভার্ণনে' আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের দেহাবশেষ রক্ষিত, 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে' ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণের সমাধিমন্দির। তাজমহলের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বহুমূল্য উপাদানে রচিত সমাধিমন্দির আর কোথাও নাই। এখানে যে রাজরাজেশ্বরীর দেহাবশেষ সংরক্ষিত—তিনি এক জন নরপতির জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাঁহার পবিত্র প্রেমে পতির হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্রা,—আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। আমেরিকানের পক্ষে 'মাউণ্ট ভার্ণন' যাহা, ইংরাজের পক্ষে 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে' যাহা,

ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে এই [illegible]হল তাহাই; তাহাদিগের নিকট তাজ-মহল অতি পবিত্র স্থান।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মেজর স্লীম্যান লিখিয়াছেন,—এই সম্রাটপত্নীর সমাধিমন্দিরে স্থানীয় ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে যে নাচ ও ভোজ দিয়া থাকেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। নাচ ও ভোজ ব্যাপার মন্দ নহে; কিন্তু সমাধিমন্দিরের পক্ষে শোভনও নহে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে বা 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে'তে নাচ বা ভোজ দিলে যাহারা সেই বর্ব্বরোচিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়, তাহারাই আবার সুবিধা পাইলে তাজমহলে সেই সকল বর্ব্বরোচিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে!

দিল্লী, লাহোর, জয়পুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গ্রন্থকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। সে সকল স্থান সম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই; প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমরা এইখানেই বিদায় লইলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার ভারতবাসীদিগের গুণের প্রতি অন্ধ নহেন, বরং তাঁহাদের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বন্যা।

সাহেব! আজ রাত্রে নদী পার হওয়া দুষ্কর। একখানা বয়েল-গাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। আপনার আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে একা ছাড়িয়াছে, তাহা এখনও ওপারে যাইতে পারে নাই। সাহেবের কি বড় তাড়াতাড়ি? আচ্ছা! আমি পারের হাতীটা সম্মুখে লইয়া যাইতেছি! মাহুত! রামপ্রসাদকে এ দিকে নিয়ে আয়! স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে ত ভালই। সাহেব! হাতী কখনও মিথ্যা কথা বলে না। রামপ্রসাদ বন্ধু কাল্লানাগকে দেখিতে পাইতেছে না। তাই ওপারে যাইবার জন্ত বড় উৎসুক। সাবাস্! সাবাস্ আমার বাচ্চা! মাহুতজী! অর্দ্ধেক দূর গিয়া দেখ, নদী কি বলিতেছে। সাবাস্ রামপ্রসাদ! মাণিক আমার! একবার জলে নাম। বোকা! আগাড় যায়। শালা, অঙ্কুশ কি শুধু তোর মোটা পিঠ চুলকাইবার জন্য? মার, মার! পাথরে রামপ্রসাদের কি করে? আমার হুকুম! আমার জোরের পাহাড়! দুৎ! দুৎ!

না সাহেব। সব বৃথা! আপনি ডাক শুনিতে পাইতেছেন। সে কালা-নাগকে বলিতেছে—তাহার যাইবার ক্ষমতা নাই। দেখুন সে ফিরিয়া মাথা নাড়িতেছে। ও নির্ব্বোধ নয়, বাহির রাগের কথা বেশ বুঝে। সেলাম রাম-প্রসাদ বাহাদুর! মাহুত। রামপ্রসাদকে গাছের নীচে নিয়ে গিয়ে মশলা দাও। বহুৎ আচ্ছা রামপ্রসাদজী! সরকারকে সেলাম দিয়ে ঘুমাওগে।

কি হবে? জল না কমা পর্য্যন্ত সাহেবকে অপেক্ষা করিতে হইবে। খোদার মর্জ্জিতে কাল সকালে বা পরশু জল কমিয়া যাইবে। সাহেবের এত রাগ কেন? আমি সাহেবের নফর। খোদা থাকিতে আমি কিছু এই নদীর সৃষ্টি করি নাই! আমি কি করিব? আমার কুঁড়ে ঘর ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই সাহেবের। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খোদাবন্দ! এই দিকে আসুন। নদীকে গালি দিলে কি জল কমিবে? সেকালে সাহেবলোকেরা এমন ছিল না। আগুন গাড়ীতে সমস্ত মাটী করিয়াছে। সেকালে সাহেবরা যখন দিনরাত ঘোড়ার পিছনে পিছনে যাইত, নদীতে পথ আটকাইলে বা একখানা গাড়ীর চাকা কাদায় বসিয়া গেলে তাহারা কিন্তু এ রকম করিত না। খোদার মর্জ্জি! এ রকম আগুন গাড়ীর মতন নয় যে, চল্‌বেই—চল্‌বেই—দেশের সমস্ত ভূতগুলো ল্যাজে বাঁধিয়া দিলেও তবুও চলে! আগুন-গাড়ীতে সত্যসত্যই সাহেবলোককে নষ্ট করিয়াছে। এক দিন না হয় দু' দিন গেলেই বা কি হয়? সাহেব কি সাদী কর্ত্তে যাচ্ছেন? তাই এত তাড়া? হো হো হো! আমি বুড়া হইয়াছি, এখন বড় একটা সাহেব দেখিতে পাই না। খোদাবন্দ! গোস্তাকী মাফ করিবেন যদি আপনার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া থাকি। সাহেবের গোসা হয় নাই ত?

সাদী! নিজের সাদী! হো হো হো! বুড়াদের মন সুমা গাছের মতন; ফল কুঁড়ি ফুল আর পুরাণ বছরের মরা পাতা, সব এক সঙ্গে আছে। পুরাণ, নূতন, আর যাহা ভুলিয়াছি, সমস্তই এক স্থানে। সাহেব চারপাইতে বসে না হয় একটু দুধ খান। সাহেব! একবার আমার তামাকটা খেয়ে দেখুন। তামাকটা বড় সরীফ। এ নুক্সাওয়ের তামাক। আমার ছেলে সেখানে চাকরী করে—সে আমায় পাঠাইয়াছে। সাহেব, যদি নল ধরিতে জানেন তবে টানুন না কেন? সাহেব যে মুসলমানের মত তামাক খাইতে পারেন! বাহবা! কোথায় শিখলেন?

নিজের সাদী! হো হো হো! সাহেব বলছেন বিয়ের কথা কিছুই নয়। কালা আদমীকে কি সাহেবরা কখনও খাটি কথা বলেন? তবে তাড়াতাড়ির আর আশ্চর্য্য কি? প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পারঘাটায় আমি খড়ী বাজাইতেছি, কিন্তু কোনও সাহেবকে এত তাড়াতাড়ি যাইতে দেখি নাই। ত্রিশ বৎসর! ওঃ! অনেকদিনকার কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘাটে অনেক বেনিয়া পার হইত। একরাত্রে দুই হাজার বোঝাই বলদ পার হইতে দেখিয়াছি। এখন রেল্ হয়েছে—আগুন-গাড়ীতে বজ্ বজ্ শব্দ কচ্ছে—লাখো লাখো মন মাল এখন ঐ সাঁকোর উপর দিয়া যায়। খুব আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু পারঘাটা এক প্রকার ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বেনিয়ারা আর গাছতলায় তাঁবু ফেলিয়া থাকে না।

আকাশ দেখিয়া আর লাভ কি? সকাল অবধি বৃষ্টি হবে ... জলের ভিতর পাথরে কথা কহিতেছে। সাহেব আজ যদি পার হইবার চেষ্টা করিতেন, তা হ'লে, পাথরে আপনার হাড়গুলি তুষঝাড়া করিত! আমি দুয়ার বন্ধ করিতেছি। বোধ হয়, আর বৃষ্টি হইবে না। আঃ! ত্রিশ বৎসর এই নদীর ধারে! বুড়া হইয়াছি—চেরাগের তেল কোথায়?

খোদাবন্দ মাফ করিবেন! কুকুরের মত আমারও ভাল ঘুম হয় না। সাহেব দুয়ারের কাছে গিয়াছেন, একবার তাকাইয়া দেখুন আর শুনুন— এ পার হইতে ও পার এখন পূরা আধ কোশ। আপনি ঐ ... কাছে দেখিতে পাইতেছেন—জলও সাত আট হাত গভীর। আপনার চথে রাগ দেখাইয়া জল কমিবে না; গালাগালিতেও নদী শান্ত হইবে না। কোনটার বেশী জোর সাহেব? আপনার গলার, না নদীর? শুইয়া ফের ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। পাহাড়ের নীচে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ... রাত আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি একবার রাত্রে এর চেয়ে দশগুণ ভয়ঙ্কর নদী পার হইয়াছি। সে দিন শুধু খোদার মেহেরবানীতে জাহান্নমের দরজা হইতে ফিরিয়াছিলাম!

আমি সেদিনকার কথা বলিব কি? বেশ সুন্দর গল্প। আর একবার তামাক সাজিয়া দিতেছি।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে,—আমার তখন বয়স কম—এইখানে আসিয়াছি। দেহে অসীম শক্তি! আমি যখন বলিতাম—এখন পার হওয়া যাইবে, তখন বেনিয়ারা আমার কথা অবিশ্বাস করিত না। আমি সমস্ত রাত্রি কাঁধ পর্য্যন্ত

স্রোতের জলে ডুবাইয়া এক শত ভয়ব্যাকুল বলদ পার করিয়াছি—একখানা খুরও খোওয়া যায় নাই। ইহার পর লোকগুলাকেও পার করিতাম। যাইবার সময় সেরা বলদটা আমাকে বক্‌শিস্ করিয়া যাইত। আমার এতই খাতির ছিল। আজ বৃষ্টি পড়িতেছে—নদী বাড়িতেছে—আর আমি কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করিয়া ঘরে ঢুকিতেছি। সে তাকত নাই—আমি বুড়া হইয়াছি—আর আগুন-গাড়ীর জন্ত ঘাট খালি হইয়া গিয়াছে। সকলে আমাকে বলিত 'বাহির জোয়ান।'

সাহেব, আমার মুখ দেখুন। বাঁদরের মতন। হাত বুড়ীর হাতের মতন। খোদার কিরা, এক দিন এক সুন্দরীর এই মুখ ভাল লাগিত। এই বাহুমূলে এক জন মাথা রাখিত। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সাহেব। বিশ্বাস করুন। কিছুই মিথ্যা বলিতেছি না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে!

দুয়ারের কাছে আসিয়া নদীর ও পারে দেখুন দেখি। অনেক দূরে নদীর ভাঁটীতে একটা আলো দেখিতে পাইতেছেন কি? পাতিয়া গ্রামের হনুমান-মন্দিরের আলো। ঐ বড় তারাটার নীচে উত্তর দিকে পাতিয়া গ্রাম। নদীর বাঁকে গ্রামখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অনেক দূর সাঁতার দিয়া যাইতে হয় সাহেব। কাপড় চোপড় খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? আমি সাঁতার দিয়া পাতিয়াতে গিয়াছি একবার নয়—অনেক বার। নদীতে মগরের অভাব নাই।

ভালবাসার কাছে জাতির বিচার নাই। না হ'লে আমি এক জন মুসলমান, এক জন মুসলমানের ছেলে, এক হিন্দু রমণীর জন্ত—পাতিয়ার লম্বরদারের বিধবা ভগিনীর জন্ত, এত আকুল হইব কেন? কিন্তু ঘটিয়াছিল তাই। লম্বরদারের পরিবারেরা তীর্থদর্শন উপলক্ষে মথুরাতে আসিয়াছিল। সে তখন নববিবাহিতা বধূমাত্র। গরুর গাড়ীর চাকায় রূপার হাল। রেশমী পর্দ্দা দিয়া গাড়ীখানা ঢাকা। সাহেব, আমি তাহাদিগকে শীঘ্র পঁহুছিয়া দিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হই নাই। কারণ, বাতাসে পর্দ্দা উড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম। যখন তাহারা তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বালক স্বামী মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে পুনর্ব্বার গাড়ীর ভিতর দেখিলাম। খোদার দোহাই! হিঁদুরা অতি নির্ব্বোধ! সে হিন্দু হৌক, আর জৈন হৌক,—সে কুষ্ঠাগ্রস্ত হউক বা সুস্থ হউক, তাহাতে আমার কি? আমি নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিয়া এই নদীতটে মনোরম কুটীর বাঁধিতাম। নবম দণ্ডের সপ্তম দফে লেখা আছে—মুস্‌রিকিন্‌কে বিবাহ করিতে নাই। তাহা কি সত্য?

শিয়া ও সুন্নি উভয়রাই কি বলে মুস্‌রিকিন্‌কে বিবাহ করিতে নাই? সাহেব কি তবে মোল্লা? নতুবা ঐ সমস্ত কথা কেমন করিয়া জানিলেন? কিন্তু আমি দুই একটা কথা বলিব,— যাহা সাহেব জানেন না। প্রেমের কাছে শিয়া সুন্নি, মুমিন ও মুস্‌রিকিন্‌ নাই। নয় 'দণ্ড' শুধু প্রেমের অগ্নি জ্বালিবার জন্ত দণ্ডমাত্র। সত্য সত্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু আমি কি করিব? লম্বরদারের লোকেরা হয় ত লাঠাইয়া আমার মাথা গুঁড়া করিত। আমি দু' পাঁচ জনের ভয় রাখি না। কিন্তু অর্দ্ধেক গ্রাম আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি করিতে পারি?

প্রত্যহ রাত্রে আমি পাতিরার এক শস্যক্ষেত্রে তাহার সহিত দেখা করিতাম। এ কথা কেহ জানিত না। আমি এইখানে নদী পার হইতাম। তাহার পর জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদীর বাঁকে যেখানে রেলের সাঁকো, সেইখানে যাইতাম। তাহার পর একখানা মাঠ পার হইয়া পাতিরাতে পঁহুছিতাম। রাত্রি ঘনান্ধকার হইলে মন্দিরের আলো দেখিয়া গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইতাম। নদীর নিকটে জঙ্গল সর্পে পরিপূর্ণ। বালির উপর ছোট ছোট কেউটা ঘুমাইত। আর তাহার ভাইরা আমাকে সেখানে দেখিলে হয় ত মারিয়াই ফেলিত। কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া এ কথা কেহই জানিত না। বালি উড়িয়া আমার পায়ের দাগ ঢাকিয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে পারঘাটা হইতে পাতিরাতে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার। বর্ষার প্রথমেও তাই। শরীরের বল দিয়া নদীর বলের সহিত যুঝিতাম। এবং প্রত্যহ রাত্রে কুটীরে আহার করিয়া পাতিরাতে গিয়া পান করিতাম। সে এক দিন বলিল, হিরনাম সিং নামে এক জন বদমাইস্‌ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তাহার বাটী পাতিরার পারে। কিন্তু কিছু দূর উজানে। শিখরা কুকুর; তাহা না হইলে খোদার শ্রেষ্ঠ প্রসাদ তামাক তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? হিরনাম সিংকে শমন-ভবনে পাঠাইবার জন্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম। বিশেষতঃ হিরনাম শাসাইয়াছিল, তাহার কথায় রাজি না হইলে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া লম্বরদারকে ভগিনীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা বলিয়া দিবে।

এই খবর শুনিয়া অবধি একখানা ধারালো ছুরী কোমরে বাঁধিয়া সাঁতার দিতাম। আমাকে কেহ বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয় তাহার দিন ফুরাইত। আমি হিরনাম সিংকে চিনিতাম না। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে কেহ ব্যবধান করিলে কখনই তাহার মঙ্গল হইত না।

বর্ষার প্রারম্ভে এক দিন রাত্রে পাতিরাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু নদী ক্রোধকম্পিতা। সাহেব! বাহির স্বভাব এই—কুড়িবার নিঝরের মধ্যে পাহাড় হইতে বাহির হইয়া সেতু হাত উঁচু দেওয়ালের মত ছুটিয়া আসে। আগুন ধরানো ও চাপাটী বানানোর মধ্যে এক ক্ষুদ্র নালা হইতে বাহি যমুনার [illegible]হির হইয়া দাঁড়ায়। এক পোওয়া ভাঁটিতে একটা চর আছে। প্রথমে সেখানে থামিয়া দম লইতাম। নদী খরস্রোতা। কিন্তু ভালবাসার জন্যে ছোঁড়ারা কি না করিতে পারে? তারার আলো অতি সামান্য, চরের মাঝামাঝি সাঁতার দিবার সময় মুখ ঘসিয়া একটা দেবদারুর ডাল ভাসিয়া গেল। দেবদারু খুব শক্ত গাছ—সহজে পর্ব্বতগাত্র হইতে উৎপাটিত হয় না। দেবদারু-শাখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, পর্ব্বতের পাদদেশে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সাঁতার দিতেছিলাম। স্রোতে আমার বিশেষ সাহায্য হইতেছিল। কিন্তু চরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই চারি দিকে যেন নদীর ধমনীর শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। কোনখানে আর চর নাই—শুধু এ পার ও পার জুড়িয়া একটা বড় ঢেউয়ের মাথার উপর ভাসিতেছিলাম। সাহেব কি কখনও এমন জলের পাল্লায় পড়িয়াছেন?

জলের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হইতেছিল, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত যেন [illegible] ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্রোতের মুখে গাছপালার সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে-ছিলাম। বন্যার গর্জ্জে মানুষ যেন কিছুই নয়। সেই বৎসরের বন্যার কথা লোকে এখনও গল্প করিয়া থাকে। ভয়ে আমার পিত্ত গলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর অপেক্ষায় কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অসাড় হইয়া ভাসিয়া ছিলাম। জলে জীবন্ত জীবেরও অভাব ছিল না।—তাহাদের আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতে-ছিলাম। একবার শুনিলাম, এক জন লোক যেন সাহায্যের জন্য চেঁচাইতেছে। বৃষ্টির জল চাবুকের মতন পড়িয়া নদীকে শুভ্র ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি নীচে পাথরের ও উপরে বৃষ্টির শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতে-ছিলাম না। এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে ভাঁটিতে চলিয়াছিলাম,—নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। অল্প বয়সে মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। সাহেব কি এখানে দাঁড়াইয়া রেলের সাঁকো দেখিতে পাইতেছেন? পেন্সনার-যাত্রী ডাকগাড়ীর ঐ আলো দেখা যাইতেছে। নদী হইতে সাঁকো এখন প্রায় [illegible]তের হাত উঁচুতে। কিন্তু সে রাত্রে তাহার উপর আসিয়া জল গর্জ্জন [illegible]য়া পড়িতেছিল। আমার পা তাহাতে আসিয়া ঠেকিল। সেইখানে ও

থামের উপর অনেক গাছপালা আসিয়া জমিয়াছিল। সেই জন্ত আমাকে বড় একটা বেশী আঘাত লাগিল না। শক্তিশালী লোক যেমন দুর্ব্বলকে চাপিয়া ধরে, বাহি সেই প্রকার আমাকে চাপিতেছিল। কোনও ক্রমে জাফ্রি ধরিয়া উপরে উঠিলাম। সাহেব! রেলের উপরও প্রায় আধ হাত জল। ভাবুন দেখি কি প্রকার বন্যা! আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছিলাম না। শুধু শুইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

কিছু ক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশে দুই একটা বৃষ্টিধৌত তারা দেখা গেল। সেই অস্পষ্ট তারার আলোকে দেখিলাম, যত দূর দৃষ্টি যায়, তত দূর শুধু কালো জল। থামের উপর স্রোতোবিক্ষিপ্ত গাছপালার উপর মৃত জন্তু। কয়েকটার গলা জাফরির মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। যাহারা তখনও ডুবিয়া যায় নাই, তাহারা জাফরি ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল—মহিষ ও গরু, বন্য শূকর, দুই একটা হরিণ। আর সর্প ও শৃগালের গণনা হয় না। সেতুর বামভাগ মৃত জন্তুর দেহে পরিপূর্ণ। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী জাফ্‌রির ভিতর দিয়া গলিয়া স্রোতের মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতেছিল।

তাহার পর তারা ডুবিয়া গেল—পুনর্ব্বার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদী ক্রমশই বাড়িতেছিল। নিদ্রা হইতে জাগিবার পূর্ব্বে মানুষ যেমন গা মোড়া দেয়, সেই প্রকার সাঁকোটা আমার পায়ের নীচে কাঁপিতেছিল। কিন্তু ভয় [illegible] না সাহেব! শরীরে বল না থাকিলেও দিব্য করিয়া বলিতে পারি আমি বিন্দুমাত্রও ভয় হয় নাই। আমি জানিতাম, তাহাকে আর একবার না দেখিয়া মরিব না। আমার খুব শীত করিতেছিল, এবং বোধ হইতেছিল—সাঁকোও বুঝি শীঘ্রই ভাসিয়া যাইবে।

জল কাঁপিতেছিল—বড় একটা তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে যেরূপে কাঁপে। জলের বেগে সেতুর বামভাগ উত্থিত হইল—দক্ষিণ দিকের জাফ্রি জলের ভিতর ডুবিয়া গেল। আমি দাড়ি ছুঁইয়া বলিতে পারি—এ সমস্তই সত্য। মির্জ্জাপুরের পাথরবোঝাই নৌকা বাতাসে যেরূপ ঘুরিতে থাকে, বাহির সাঁকো সেই প্রকার ঘুরিয়া গেল। ঠিক এই রকমে গিয়াছিল সাহেব! অন্য রকমে নহে।

আমি সাঁকোর উপর হইতে গভীর জলে পড়িয়া গেলাম। আমার পশ্চাতে ক্রোধকম্পিতা বাহির বিশাল তরঙ্গ। বাহির গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছিলাম এবং সেই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম, সাঁকোর মধ্যদেশের স্তম্ভ খসিয়া গেল।

জলে পড়িয়া-যাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ! তাহার পর অনন্ত-জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বে আর কিছুই জানি না। সাঁতার দিবার জন্ত হাত বাড়াইতে গিয়া জটাবদ্ধ কেশ হাতে ঠেকিল। লোকটা মরিয়া গিয়াছে। সেই ভীষণ সংগ্রামে 'বাহির জোয়ান' ভিন্ন আর কেহই বাঁচে নাই। বোধ হইল, মড়াটা দুই দিনের। আমার হাসি আসিল। তবে নিশ্চয় তাহাকে দেখিতে পাইব। আঙ্গুল দিয়া তাহার চুল জড়াইয়া ধরিলাম—আমার মোটেই জোর ছিল না; দুই জনে ভাঁটিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিলাম—আমি জীবিত, সে মৃত। এই অবলম্বন না পাইলে আমি ডুবিয়া যাইতাম। আমার মজ্জায় মজ্জায় হিম প্রবেশ করিয়াছিল—হাড়ের উপর মাংস যেন সিদ্ধ হইয়া দাঁড়া-দাঁড়া হইয়াছিল। বাহির প্রবল প্রতাপ যাহার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহার আর ভয় কি? তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা ভাসিয়া যাইতে দিলাম। অবশেষে দক্ষিণতীরাভিমুখ একটা প্রবাহ ধরিয়া তটের দিকে যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মড়াটা একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ক্রমাগত পাক দিতে লাগিল। ভাবিলাম, গাছের ডালে লাগিয়া বুঝি এমন ঘটিতেছে, এবং হয় ত এটাও শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে। হঠাৎ ঝাউ গাছের মাথায় আমার হাঁটুতে ঘেঁস লাগিল। বুঝিলাম, বন্যাজলমগ্ন শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। পা বাড়াইতেই মাটী পাইলাম। বোধ হইল, একটা মাঠের আইল। অশ্বথ গাছের নীচে একটা ঢিপির উপর মড়াটা বাধিয়া রহিল। আমি আনন্দে জল ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম।

বন্যার জলে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম—জানেন? পাতিরা গ্রামের পূর্ব্ব সীমানায় একটা ঢিপির কাছে। উপকার পাইয়াছি ভাবিয়া, বা পুনর্ব্বার দরকার হইতে পারে ভাবিয়াই হউক, ঘাসের উপর মৃতদেহটা টানিয়া আনিলাম। লবরদারের বাটীর নিকট নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শৃগালের ন্যায় তিনবার চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রিয়তমা পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। বাহির প্রবল বন্যায় আমার কুটীর ভাসিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে আকুল হৃদয়ে কাঁদিতেছিল। আমি হাঁটু-জল ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হইলে, ভূত ভাবিয়া সে পলাইবার উপক্রম করিতেছিল—কিন্তু আমি তাহাকে বাহু দিয়া বেষ্টন করিলাম।......সেকালে আমি ভূতের মতন ছিলাম না,—এখন যদিও বুড়া হইয়াছি বটে।

আমি তাহাকে বাহির সাঁকো ভাঙ্গার কথা বলিলাম। সে বলিল,—

আমি দেবতা! ভরা বন্যার ... মানুষের অসাধ্য। তাহার হাত ধরিয়া ঢিপির কাছে গিয়া যাহার সাহায্যে নদী পার হইয়াছিলাম, সেই মৃতদেহ তাহাকে দেখাইলাম। রাত্রের শেষভাগে আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল;—অস্পষ্ট তারার আলোতে সেই শবদেহ দেখিয়া সে মুখ ঢাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'এ যে হিরনাম সিং!' আমি বলিলাম, 'জীবন্ত অপেক্ষা মরা শুকরই বেশী কাজের।' 'নিশ্চয়ই! কারণ পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনকে সে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যাই হোক, মড়াটা সরাইয়া ফেলাই উচিত। নতুবা লোকে আমাকে নিন্দা করিবে।' দেহটা বলিতে গেলে প্রায় তাহার ঘরের দুয়ারের নিকটই পড়িয়াছিল।

দেহটা গড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'খোদার মর্জ্জি,—তোমার রক্তে আমার হস্ত কলঙ্কিত হইবে না। এখন তোমাকে দাহঘাট হইতে ফিরাইয়া অন্যায় করিয়াছি কি না, সে বিষয়ের মীমাংসা তোমার ও বায়সদিগের মধ্যেই হউক।' বন্যার জলে তাহাকে ভাসাইয়া দিলাম। মিষার-বোর্ডে মোল্লার দাড়ীর মত তাহার দাড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছিল।

হিরনাম সিংকে আর দেখি নাই। ভোর হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। জঙ্গলের ভিতর যেখানে জল দাঁড়ায় নাই, সেইখান দিয়া চলিলাম। অন্ধকারে যাহা করিয়াছি, প্রভাতের আলোতে তাহা দেখিয়া অস্থি শিথিল হইয়া আসিল। পাতিয়া গ্রাম ও সুদূর অপর পারের বৃক্ষ-সমূহের মধ্যে দুই-ক্রোশ-ব্যাপী ফেনোচ্ছ্বসিত জলরাশির ব্যবধান হইয়াছিল। মধ্যে বৃক্ষের মাড়ির উপর ভগ্ন দন্তের ন্যায় বাহি-পুলের স্তম্ভ জাগিতেছিল। জলের উপর জীবন্ত প্রাণীর—পাখীর—কি নৌকার চিহ্নমাত্র ছিল না। শুধু দলে দলে মরা জানোয়ার—মরা ঘোড়া, গরু—মানুষ ভাসিয়া যাইতেছিল। পর্ব্বতের নিম্নদেশের রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় সমস্ত জল লাল হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেমন বন্যা আর দেখিলাম না। সে বারে আমি যাহা করিয়াছিলাম, অন্য মানুষে তাহা করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি সে দিন ফিরিতে পারিলাম না। নম্বরদারের সমস্ত জোত দান পাইলেও আমি অন্ধকারে ভিন্ন এমন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। অন্ধকারে বিপদ প্রচ্ছন্ন থাকে। নদীর এক ক্রোশ উজানে এক ... ঘরে আশ্রয় লইলাম। বলিলাম, বন্যার জলে আমাকে কুটীর হইতে ... আনিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে নৌকাযোগে ... ছিলাম।

[illegible] দেওয়াল; [illegible]ষের চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল শুধু—কাদা। সাহেব! বুঝিতে প[illegible] কত বাড়িয়াছিল।

অদৃষ্টে ছিল—গৃহে, বাহি-গর্ভে, বা বাহি-পুলের নীচে মরণ হইবে না। সেই জন্য দুই দিনের বাসী মড়া হিরনাম সিংকে খোদা মিলাইয়া দিয়াছিলেন। আজ কুড়ি বৎসর হিরনাম সিং নরকে পচিতেছে, নিশ্চয় সেই রাত্রের স্মৃতিই তাহার নরকযন্ত্রণার চরম যন্ত্রণা।

শুনুন সাহেব! নদীর স্বর পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রভাতের পূর্বে সে ঘুমাইয়া পড়িবে। ভোর হইতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার তেজ বাড়িবে। এ কথা কেমন করিয়া জানিলাম? আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছি—বাপ যেমন ছেলের আওয়াজ চিনিতে পারে, আমি কি বাহির স্বর তেমনই চিনিতে পারি না? প্রতিমুহূর্তে তাহার রাগ পড়িয়া যাইতেছে। খোদা মালুম, এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু সকালের কথা আমি বলিতে পারি না। সাহেব! জলদি করুন—আমি রামপ্রসাদকে আনিতেছি—এবার সে আর ফিরিয়া আসিবে না। মোটরকারের উপর ভাল করিয়া ত্রিপল বাঁধা হইয়াছে ত? অচ্ছা! বেটা গাধা! সাহেবের জন্যে শীঘ্র হাতী লইয়া আয়! ও পারে বলিস্—সকালে আর পার হওয়া যাইবে না।

টাকা? না সাহেব, আমি সেরকম নই। না না, ছেলেপুলেকে মিঠাই কিনিয়া দিবার জন্যও চাহি না। আমার গৃহ শূন্য—আমি বৃদ্ধ।

চুৎ রামপ্রসাদ! চুৎ! চুৎ! চুৎ! সাহেব তোমার ভালো হোক—বিদায়! *

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

* কিপ[illegible]হইতে অবলম্বিত।

সাহিত্য।

ব্রেটহার্ট।

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রেট হার্টের The Luck of Roaring Camp প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি সাহিত্যজগতে এক জন নূতন প্রতিভাশালী সুলেখকের আবির্ভাব সূচিত করিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রেটহার্টের সমগ্র গ্রন্থাবলী চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর আয়তন প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ গল্প আছে। গল্পগুলির প্রধান ঘটনাস্থল, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরদেশ; কিন্তু নিউ ইংলণ্ড, ওল্ড ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণিও কয়েকটি গল্পের ঘটনাস্থলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মিঃ চার্লস ওয়ারেণ ষ্টডার্ড, "আটলাণ্টিক মন্থলি" নামক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যশিল্পচাতুরী, মনোহারিতা ও লোকরঞ্জকতার হিসাবে তারতম্য আছে, তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, তাঁহার কোনও রচনাই অসার, অলীক ও অপদার্থ মনে করা যায় না।

১৮৫৪ সালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রেটহার্ট কালিফর্ণিয়ায় প্রথম আগমন করেন। সেই সময়ের কয়েকটি ঘটনা আমরা মিঃ ষ্টডার্ডের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।—যখন ব্রেটহার্টের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর, এবং দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, তখন তিনি যৌবনসুলভ উৎসাহে কষ্টসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় শীঘ্রই তাহার প্রতিভার অনুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।

প্রথম জীবন।

তিনি কিছু দিন পল্লীগ্রামে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং শিক্ষকের ব্যবসায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, কতিপয় অতি সুন্দর গল্পে তাহার নিদর্শন দিয়াছেন। তাহার পর কিছু দিন তিনি মুদ্রাকরের ব্যবসায়শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন, পরে পাড়াগেঁয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন ভ্রমণ সংবাদগ্রাহকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে বন্দুকধারী দস্যুসঙ্কুল গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বরং আনন্দ উপভোগ করিতেন; সৌভাগ্যক্রমে কোন বিপদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ যৌবনসুলভ স্বাস্থ্যের কল্যাণে তিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেন। এই সময়ে যদিও তিনি প্রায়ই বিপদে পড়িতেন, তথাপি তাঁহার জীবনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের অভাব ছিল না। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকারের অনুকূল কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি মানবজীবনের যে ছায়ালোকসম্পাত, যে বৈচিত্র্য, যে ভাববাহুল্য দেখিয়াছিলেন, অতি অল্প লেখকই সে সকল লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ইহার পরে ব্রেটহার্ট কিছু দিন সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরীতে "গোল্ডেন ইরা" নামক সংবাদপত্রের যন্ত্রালয়ে কম্পোজিটারের কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার "মিগ্‌স্‌" নামক প্রথম রচনা "[illegible]"র প্রকাশিত হয়। পরে তিনি ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত "দি কালি[illegible] সংবাদপত্রের লেখক হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর [illegible] প্রকৃত[illegible] হইতেই তাঁহার অক্ষয় যশের সূত্রপাত।

১৮৬৮ সালের জুলাই [illegible] "ওভারল্যাণ্ড মন্থলি" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ব্রেটহার্ট এই মাসিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এণ্টন রোমান নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক একখানি মাসিকপত্রপ্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া, সে বিষয়ে নানা লেখকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পরামর্শেই তিনি পত্রপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। ব্রেটহার্ট এই সময়ে "গোল্ডেন ইরা" নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। মিঃ ষ্টডার্ড, ব্রেটহার্টকে "ওভারল্যাণ্ড মন্থলির" সম্পাদক-পদের যোগ্য স্থির করিয়া, মিঃ রোমানকে তাঁহার নিয়োগের জন্য

সাফল্যের সূত্রপাত।

অনুরোধ করেন। এই মাসিকের অগষ্ট-সংখ্যায় তাঁহার "দি লাক্ অফ্ রোরিং ক্যাম্প" প্রকাশিত হয়। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সংশয় ছিল, এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সফলতালাভ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না। এই রচনায় অসাধারণ মৌলিকতা, পুরুষোচিত তেজ ও মানসিক বলের সমন্বয় দর্শন করিয়া, এক জন স্ত্রী-কম্পোজিটার এই রচনার বিরুদ্ধবাদিনী হইয়া উঠে। পত্র-সম্পাদক হইতে কম্পোজিটর, কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ম্মচারী হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যাঁহারা এই রচনা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ব্রেটহার্টকে অনেক ভুগিতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য, সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ও সুরুচি সম্বন্ধেও নানা জনে বিবিধ জল্পনা করিয়াছিল। ব্রেটহার্ট বলিলেন, যদি পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার গল্প প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভয়প্রদর্শনের ফলে, পরিশেষে, তাঁহারই জয় হয়। "দি ওভারল্যাণ্ডের" স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ব্রেটহার্টের কীর্ত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বায়রণ লিখিয়াছেন, 'এক দিন প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম,—আমি যশস্বী হইয়াছি।' ব্রেটহার্টের ভাগ্যেও প্রায় সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এই রচনায় তাঁহার যশ সহসা অপসৃতমেঘাবরণ দীপ্ত প্রভাকরের মত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

রচনা যাহাতে নিখুঁত হয়, ব্রেটহার্টের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি। এমন কি, একটি সামান্য শব্দের জন্যও তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দটির ব্যবহার

ভাষা।

করিতে পারিলে পদের লালিত্য বর্দ্ধিত হয়, রচনা শক্তিশালিনী হয়। "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি"—ইহাই তাঁহার আদর্শ,—রচনার মূলমন্ত্র। ব্রেটহার্টের রচনা তাঁহার অন্তরের কথা। একবার এক জন ব্রেটহার্টের রচনার এক অংশ পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; ব্রেটহার্টের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন উহা লিখিয়াছিলাম, তখন আমিও কাঁদিয়াছিলাম।'

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

নবদ্বীপ।

পৃথিবীর জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। মানবের সুখসমৃদ্ধিবিস্তারে, জ্ঞানের সার্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানে, আমাদিগের যুগ যুগান্তস্থল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির [illegible] কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরসম্মিলন। অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ [illegible] বাহন,—এই [illegible]গমনের সুবিধার দিনে, সুদূর সিন্ধুসলিলবিধৌত [illegible]

জলকল্লোলমুখরিত দ্বীপভাগে ভ্রমণ করিয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রকৃতির [illegible] করিতে কাহার মন না ব্যাকুল হয়? গত বর্ষের পূর্ব্বে দেশভ্রমণ বিলাসের [illegible] গণ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা অন্নবস্ত্রের ন্যায় আবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত [illegible] আমাদের দেশে পূজা ও বড়দিনের অবকাশে "পশ্চিম" যাইবার [illegible] উদাহরণ। যাঁহাদিগের জ্ঞান গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাঁহারাও [illegible] সুদূরপ্রান্তস্থিত গ্রীণল্যাণ্ডের নবাবিষ্কৃত স্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিতে পারেন [illegible] কোনও ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা এখন [illegible] হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ ঘটনাকে গ্রন্থকারের কল্পনায় রঞ্জিত কাচকলায়ের [illegible] দেখাইতে পারিলে, তাহা গুণগ্রাহী পাঠকের নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারে; [illegible] দেশবিশেষ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিয়া পাঠকের প্রসাদলাভ আজকাল সহজ নহে [illegible] হইল, কুমারী অগষ্টা ডি উইট Facts and Fancies about Java নামে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পুরাতন যবদ্বীপ আমাদিগের পরিচিত এবং ঐতিহাসিক স্থান। ইহার সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পর্ব্বতমালাচুম্বিত সুনীল আকাশ ও [illegible] সুষমাময়ী বনদেবী ভ্রমণকারীর হৃদয় ভাবরসে আপ্লুত করিয়া তুলে। অনুবাদে কুমারী ডি উইটের রচনার ভাষামাধুর্য্যের রক্ষা করা কতকটা অসম্ভব হইলেও, তাঁহার পুস্তকের দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিব।

জাহাজ লাগিবার পর আধ ঘণ্টা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক ভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু এই নূতন দেশে এই প্রথম ব্যাপারেও কিছু নূতনত্ব আছে। জাহাজে বিশাল জনতা, কিন্তু

অবতরণ।

গোলমালমাত্র নাই। অনেক লোকের পদশব্দ, হড়াহুড়ি, [illegible]কার, কলহ, কোলাহল নাই; মুটিয়াগণ বৃহৎ বৃহৎ বাক্স [illegible] কাঁধের উপর ফেলিয়া প্রায় নিঃশব্দে যাইতেছে। প্রত্যেক কুলি তাহার পালার প্রতীক্ষায় আফিসে অথবা প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। যখন কোনও য়ুরোপীয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহাদিগের মধ্য দিয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের সরল শান্ত মুখমণ্ডলে যুগপৎ ঘৃণা ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, দিনের ভিতর আরও ত কত সময় রহিয়াছে, আরও ত কত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, তবে ইহারা এত ব্যস্ত কেন? অমঙ্গল হইতেই ব্যস্ততার জন্ম, ইহারা কি তাহা জানে না?

ভারতীয় ইংরাজগণ রেলওয়ে ষ্টেশনে কোলাহলকুতূহলী কুলিদিগের অশিষ্ট ব্যবহারে যেরূপ অভ্যস্ত, তাহাতে কুমারী অগষ্টার অবতরণকাহিনী তাঁহাদের নিকট বিশেষ আমোদজনক বলিয়া বোধ হইবে। ভারতের সহিত যবদ্বীপের অনেক বৈষম্য আছে; তন্মধ্যে ইহার হোটেল একটি। যবদ্বীপের হোটেলগুলি এমনই অসুবিধাজনক যে, গ্রন্থকর্ত্রীর অভিজ্ঞতা এখানে কাহারও অসূয়ার বিষয় হইবে না।

গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতেছেন,—ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছি। সহরের প্রখর রৌদ্র, বিচিত্রবেশসজ্জিত জনতা, নূতন নূতন দৃশ্য ও নানা প্রকার অদ্ভুত শব্দ, এই সকলের মদিরতা যেন

হোটেল।

আমাকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল;—কেবল মদই যে মত্ততার কারণ নহে, এ সম্বন্ধে হোমারের সহিত আমিও সম্পূর্ণ এক[illegible] পশ্চাৎভাগ দিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত প্রবেশ করিলাম। আহারস্থলের [illegible] দেখি,—অন্ন, মৎস্য, মাংস ও ফলের পাত্রে টেবিল পূর্ণ। আমার সম্মুখে [illegible] তৎসমস্তই নিজের পাত্রখানিতে রাশীকৃত করিলাম। আমি আহার করিতে প্রবৃত্ত [illegible] তাহার পর যে কি হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে। এইটুকু লিখিতে বড়

[illegible] পরে দেখিবে, সে হয়ত তোমার বাড়ীতেই ভৃত্যবর্গের [illegible] বিক্রয় করিতেছে। এক বৎসর [illegible]ইতে না যাইতে দেখি[illegible] বোঝা[illegible]কে লইয়া এক জন মুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাতে [illegible] কিছু দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে, সেই চীনাম্যান একখানি ছোটখাট দো[illegible] বসিয়াছে, এবং তখন একখানি বড় কোট ও দেয়ালে একখানি বড় আর্সি [illegible] শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। কয়েক বৎসর পরে দেখিবে, সে অপেক্ষাকৃত সুন্দর [illegible] বড় সুন্দর দোকানে অর্দ্ধশায়িত ও অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া অতি সুরুচির সহিত [illegible] করিতেছে। এবং যদি তোমার ভাগ্যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর দর্শনলাভ ঘটে, তাহা হইলে [illegible] সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপার উজ্জ্বল অলকাবলীতে উজ্জ্বলতর হীরার ফুল দেখিয়া [illegible] হইবে [illegible] বন্ধুবর এখন উন্নতির পথে অগ্রসর! সত্বরই তাঁহার কারুকার্য্যখচিত [illegible] আবাসহর্ম্ম্য রাজবর্ত্মশ্রীর সুষমা-বর্দ্ধন করিবে।

ওলন্দাজ উপনিবেশিকগণের সমাজে নৈতিক বল ও দুর্ব্বলতা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন সমাবেশ প্রচলিত, সেখানে গুজব একটু আধটু থাকিবেই।

দেশবাসিগণ।

যবদ্বাসিগণ বিশেষ শান্ত, মিতাচারী ও সরলপ্রকৃতি; শিকার প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদিগের উৎসাহ ও দক্ষতা থাকিলেও, অলসতা ইহাদিগের মজ্জাগত ব্যাধি। ইহাদিগের ধারণা,—যত অলস হইতেই ভদ্রতার বৃদ্ধি। ইহাদের কতকগুলি গার্হস্থ্য আচারপদ্ধতি পাশ্চাত্য রুচির নিতান্ত বিরোধী।

যবদ্বাসিগণ তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে কিরূপে আহার করাইয়া দেয়, তৎসম্বন্ধে কুমারী অগষ্টার বর্ণনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক।

অন্যান্য অনেক বিষয়ে শিশুসন্তানদিগের স্বাধীনতা থাকিলেও, ইহা[illegible]কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুদিগকে কখনও ইচ্ছামত খাইতে দেওয়া হয় না[illegible]দের

সন্তানগণের আহার।

সংস্কার, তাহারা নিজে খাইতে গেলে কিছুমাত্র খাইবে না[illegible] স্বভাবের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যগ্র। জননী অন্নের [illegible] সম্মুখে রাখিয়া, শিশুসন্তানকে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ের উপর ফেলিয়া, অন্নের গুটি পাকাইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সেই অন্নপিণ্ড শিশুর গলনলীর অভ্যন্তরে চালান দেন।—অবশ্য এইরূপ ব্যাপারে শিশুর আহারস্পৃহা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে চীৎকার করিয়া দম আটকাইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একরকমে যখন সমস্তটা গলাধঃকরণ করে, তখন মার মনে হয় যে, শিশু যথেষ্ট আহার করিয়াছে। অর্থাৎ, যখন তাহার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, আর একটি অন্নকণারও স্থান নাই, তখন বেচারীর নিষ্কৃতি।

জননী

[illegible] তুমি মা জান তা' বড়
[illegible] তুমি মা জননী-পরা—
তোমার যে স্নেহ-রাগিণীর সুধাময়
[illegible]-হিল্লোলে, তপন শশাঙ্ক ধরা
[illegible] সৃষ্টি-স্রোতে—কুসুম নিচোলা
বসন্ত-[illegible]হার প্রথম তান—
পূর্ণ-পূর্ণিমার তার আপন হিল্লোলা
হৃদ [illegible] বিরাজে মায়ের প্রাণ।

আছে কি কোথাও দেখি, এমন কোমল!—
অমঙ্গল ছায়া যথা ব্যথিতা হরিণী—
আছে কি এমন দেখি, সুদৃঢ়—সবল?
প্রিয় [illegible] বুকে ধরে যে অশনি—
[illegible] ডাকে মানব-হৃদয়
তত [illegible] পায় তব স্নেহ-পরিচয়!

২

মা হয়ে মায়ের প্রাণ কোন প্রাণে তুমি
কাঁদাও জননি তবে? জ্বালাও মৃত্যুর
অলঙ্ঘ্য বিরহ দাহে—অসীম মধুর
আনন্দময়ীর হৃদয়-স্বর্গ-ভূমি
নির্ব্বাপিত কর অনির্ব্বাণ হুতাশনে।
শূন্য ক্রোড় অভিশাপ আর, তিরস্কার
নহে কি তোমার? পরদিন মুখ তার
ঊষা আসি কেমনে দেখায়? অশ্রুজলে
না মুছায়ে লয় সন্ধ্যা কেমনে বিদায়?
জ্যোৎস্নাবাস নিশীথিনী পরায় কেমনে
সে শোক-আঁধার-স্পর্শ-অশুচি আসনে
[illegible] রবি-শশী আলো না জুড়ায়?
[illegible] সান্নিধ্য দেখি, তোমার ধরায়—
আর প্রাণে মৃত্যুশোক—অ-শোক ভুবনে।

অপূর্ণা সৃষ্টির মাঝে সম্পূর্ণা জননী,
স্নেহ-কর্ত্তব্যের তার নাহিক স্খলন।
নিঃস্বার্থের এক মূর্ত্তি!—দ্বিতীয় তখনি
জাগায় যে সাধ স্নেহ!—উদার পাবন
নিজের জীবন দিয়া রক্ষিছে জীবনে।
লুপ্ত করি ধূলি মত স্বার্থ জগতের
সে স্নেহ করেছে জয় দুর্জ্জয় আপনে।
এ কি ঘোর উপহাস সে মাতৃস্নেহের!

এ কি ঘোর উপহাস!—সে অসীম স্নেহ
পায়নি ক্ষমতা হায়, সৃষ্টির নীতিতে,
মৃত্যু যবে আসে নিতে, অঙ্ক করি গেহ,
প্রাণ দিয়া প্রাণাধিকে বুকেতে রাখিতে
মরত জননী—তুমি দরিদ্রা আমার!—
জগত-জননী হতে শ্রেষ্ঠ শতবার।

৪

এ কি রে প্রলাপ মূঢ়—পাপ অভিমান—
অন্ধ, করিতেছ সূর্য্যে তিমির আরোপ!
স্নেহের আকরে দেখ স্নেহের বিলোপ!
যা' হতে মায়ের প্রাণ তার নাই প্রাণ!—
ভাবিলি না হায় মূঢ়, নিজে কি জননী
গড়িয়াছে সঙ্গোপনে সে স্নেহ অচল
যাহার অমৃত-স্রোতে জীয়ে ধরাতল?
শিশু কি গড়িল নিজে সে স্নেহের খনি?

কত দূর দৃষ্টি চলে অন্ধ মানবের!
কে দেখেছে জীবনের পরিণাম হায়!
যখন আসিলে অন্ধ—রিক্ত—অসহায়,
মা দাঁড়া'ল অযাচিত স্নেহ-দানের
অপেক্ষায়! আছে পুনঃ পারে মরণের
মাতা হতে মাতৃতমা তব প্রতীক্ষায়।

প্রিয়নাথ সেন

মাধবী দেবী।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"শ্যামানন্দ পুরী নিজকে দুঃখিনী ও শিবানন্দ আপনাকে 'শিবাসহচরী' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। পাঠক মেয়েলী নাম পাইয়া স্ত্রীকবির খোঁজ করিতে করিতে দেখিবেন, ভক্তির ইন্দ্রজালে পুরুষগণ স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছেন।"—১৬৯পৃঃ।

আমরা দেখিতেছি, দীনেশ বাবু স্ত্রীকবির সন্ধান বিষয়ে তাঁহার পাঠকগণকে এইরূপ সতর্ক করিয়া দিলেও, তিনি নিজেই জনৈক পুরুষ কবির কীর্ত্তিহার একটি স্ত্রীলোককে অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত বৈষ্ণবগ্রন্থরহস্যাভিজ্ঞ তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাধবী দেবীকে পদকর্ত্তা মাধবীদাসের কীর্ত্তিবাস পরাইয়া, অপ্রতিভাতস্ত্রীপ্রতিকৃতি পুরুষনামধারী পুরুষ কবির বনবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতরত্নাবলী, প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রভৃতি পদাবলী-সংগ্রহের মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি পদকর্ত্তৃগণের ও তাঁহাদের রচিত পদাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তালিকায় কোনও স্ত্রীকবির নাম নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহার ১৭৪ ও ৩২১ পৃষ্ঠায় শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীকে অনেকগুলি পদের রচয়িত্রী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই, এবং সম্প্রতি "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় (৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা) "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাধবী দেবীর বিবরণ ও তাঁহার পদাবলীর সমালোচনা সহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়, মাধবী দেবীর যে পরিচয় ও তৎকৃত পদাবলীর যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সংগৃহীত বিবরণের তুলনা করিয়া, সেই সকল পদ মাধবী দেবী বা অন্য কোনও স্ত্রী কবির রচিত কি না, তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সন্দেহ কত দূর সমূলক, তাহার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দীনেশ বাবু পদকল্পতরুগ্রন্থেই মাধবীর পদ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন, এবং তিনি পদকল্পতরুর ৭৮৮। ৭৮৯। ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদগুলিকে শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলেন। * বটতলায় মুদ্রিত কয়েকখানি পদকল্পতরুতে দেখিলাম যে, ২১৯৩ সংখ্যক পদটিতে "মাধবী," এবং অপর তিনটি পদে "মাধবী দাস" এই ভণিতা আছে। সমগ্র পদকল্পতরুগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, "মাধবীদাস" এই ভণিতাযুক্ত আরও দুইটি পদ পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয়ও পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে এই দুইটি ও দীনেশ বাবুর উক্ত চারিটি, সর্ব্বসমেত এই ছয়টি পদ, মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য পদকল্পতরুর সংখ্যা সহ উক্ত ছয়টি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

১

রাধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ রস পিবই
কমলিনী মধুকর রাজ॥
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদগদ কহয়ে রাই ভেল অপরূপ
কবে হোয়ব তুহুঁ সঙ্গ॥
সো ধনি চাঁদবয়নি কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়ে তাপ কিয়ে মিটব
সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐ ছলে কতহুঁ মিলনয়ে মাধব
সহচরী দূরতহিঁ হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহত হিঁ মাধবী দাস॥

প. ক. ৭৮৮।

২

পরশিতে রাই-তনু আপহিঁ ভুলল কানু
মুরছি পড়িল ধনী-কোর।
শ্যামক হেরইতে ধনি ভেল গদগদ,
চরকি চরকি বহে লোর॥
শ্যাম মুরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফিরি
রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাইতনু
হেরি সখী চমকিত ভেল।
চিত্রপুতলী হেন বেড়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম-মুখচন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশখা আলী
সব জনে লাগল ধন্দ॥
শ্যামর সুন্দর বদন সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উলাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে॥

প. ক. ৭৮৯।

৩

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায়॥
লতা তরু যত দেখি শত শত
অকালে ধরিছে পাকা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুরণ
মেঘগণে ঢেকে রাখা॥
ডাকে বসি পাখী ঝুরি দুটি আঁখি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩২১ পৃষ্ঠা।

কল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচান্দ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা॥

প. ক. ১৮০৪।

৪

কলহ করিয়া ছলা আগে পঁহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচলে রায়।
যতেক ভকতগণ হৈয়া সকরুণ-মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহ আনলে ভেল বন্দ।
আঠার নালাতে হৈতে নাচিতে নাচিতে পথে
যায় নিতাই অবধোত চন্দ্র॥
সিংহদুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বূনদ হেম জিনি গৌরাঙ্গ বরণখানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
এবে ভ্রমে সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভটগৃহে করযে প্রবেশ॥

প. ক. ২০৯২।

৫

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে॥
প্রতপ্তকাঞ্চনকান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা উর্দ্ধে তিলক শোভিত॥
গোপীনাথ, বাণীনাথ, সার্ব্বভৌম কাশী।
গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর॥
যেই দেখে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥

প. ক. ২১৯৩।

৬

আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌর কিশোর-রাজ।
ফাগু উঝালি করে ফেলাফেলি
নীলাচল পুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরী
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌর পড়িলা ফাঁপরে
বদন চাহিয়া থাকে॥
দু' বাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচলবাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ॥
বাজে করতাল বোলে তালি তাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস মনেতে উল্লাস
সদা বোলে হরিবোল॥

প. ক. ২২৪২।

এই পদগুলির মধ্যে, পদকল্পতরুর একমাত্র ২১৯৩ সংখ্যক পদে "মাধবী", ও অপরগুলিতে "মাধবীদাস" এই ভণিতা আছে। পদগুলির মিলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ৭৮৯, এবং ২২৪২ সংখ্যক পদত্রয়ের ভণিতায় সকারান্ত পঞ্চাক্ষরযুক্ত নাম (যথা মাধবীদাস) ভিন্ন স্ত্রীবাচিকাপদবীযুক্ত

কোনও নাম (যথা মাধবীদাসী) থাকিতে পারে না, এবং পদকল্পতরুতেও নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধেও উদ্ধৃত পদত্রয়ে "মাধবী দাস" আছে। কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ পদকল্পতরুর ১৮০৪ ও ২১৯২ সংখ্যক পদের ভণিতায় "মাধবী দাস" ভণিতা আছে, এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত পদে সেই স্থলে "মাধবী দাসী" ভণিতা আছে। এই পাঠান্তর কোন্ গ্রন্থে আছে, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

এ স্থলে আমার মনে এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হইতেছে,—

১ম,—দীনেশ বাবু পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদচতুষ্টয়কে যে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়াছেন, তাহা সমূলক কি না?

২য়,—উক্ত পদগুলির "মাধবী দাস" এবং "মাধবী" এক ব্যক্তি, অর্থাৎ শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী কি না?

৩য়,—উদ্ধৃত দুয়টি পদের রচয়িতা কে? এবং তিনি পুরুষ কি নারী?

পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ যে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে দীনেশ বাবু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহার কোন অনুকূল প্রমাণের প্রয়োগ করেন নাই। মাধবী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিতা ছিলেন, কিন্তু তিনি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদির পরিচয়স্বরূপ তাঁহাদের পদাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, রামানন্দ স্বরচিত পদ দ্বারা চৈতন্যদেবের আনন্দবিধান করিতেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; গুণরাজ, সনাতন, গোপালভট্ট, স্বরূপ, দামোদরাদির গ্রন্থপ্রণয়নের কথা তাঁহাদের পরিচয়স্বরূপ বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হন নাই, অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের, তাঁহারই বর্ণিত "সাড়ে তিন জন" পাত্রের অন্তর্গত "এক জন" পাত্র শিখিমাহিতির ভগিনী, এবং স্বয়ং "অর্দ্ধ জন" পাত্র মাধবী দেবীর পদাবলীর উল্লেখ করিবেন না, ইহা কিয়ৎপরিমাণে বিস্ময়জনক। মাধবী দেবীর রচিত পদ থাকিলে, সেই পদ কোন না কোনরূপে চৈতন্যদেবের শ্রবণপ্রীতি সম্পাদন করিত, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা ব্যাসাবতার বৃন্দাবন

দাস তাহার উল্লেখ করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্যে গোবিন্দ দাসাদির পদাবলীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মাধবী দেবীর পদাবলীরচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত আমার বিশ্বাস,—মাধবী দেবী কোনও পদাবলীর রচনা করেন নাই।

মাধবী দেবী যে শিক্ষিতা ছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মাধবীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার স্বর্ণাক্ষরগ্রথিত রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, মাধবীকে এই সম্মানিত পদে (লিখনাধিকারীর পদে) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" (১)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় কোন্ গ্রন্থে মাধবী দেবীর রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, ও বুদ্ধিগৌরবের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থে মাধবী দেবীর এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। অপর দিকে চৈতন্যচরিতামৃতকারের—

"শিখিমাহিতি নাম এই লিখনাধিকারী।" (২)

এই বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে, শিখিমাহিতিই প্রতাপরুদ্রের সময় লিখনাধিকারী ছিলেন। শিখিমাহিতির ভগিনী লিখনাধিকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রবীণ লেখক নিশ্চিত তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে,

"শিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধব
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহ পরমা বৈষ্ণবী।
প্রভু লেখাকার যাঁরে রাধিকার গণ"

এইরূপ বর্ণনা আছে। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]গুপ্ত, ভূধর চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত ও বটতলার প্রকাশিত সকল সংস্করণের চরিতামৃতেই উক্ত পংক্তিত্রয়ের শেষ চরণের "যাঁরে" স্থলে পাঠান্তর নাই। কিন্তু তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে ঐ "যাঁর" স্থলে "যে[illegible]" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃতে এই জন্যই (মাধবী দেবী লিখনাধিকারীর পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া) মাধবী 'প্রভুলেখাকার' বলিয়া লিখিত আছে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় সম্ভবতঃ মাধবীর লিখনাধিকারী পদপ্রাপ্তির প্রমাণ জন্য উক্ত পংক্তিত্রয় স্বপ্রণীত প্রবন্ধে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত রূপ উক্তি করিয়া-

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১৬০ পৃঃ। (২) দশম পরিচ্ছেদ।

পদ অবশ্যই প্রচলিত থাকিত, এবং রাধামোহন ঠাকুর তাহার অন্ততঃ একটিও স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, মাধবীদাস-ভণিতাযুক্ত পদাবলী পদামৃত-সমুদ্র ও পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার মধ্যসময়ে রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদকল্পতরু এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃতসমুদ্র সংগৃহীত হয়। সুতরাং মাধবী বা মাধবীদাসের ভণিতাযুক্ত পদাবলীর বয়স ২৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই। মাধবীদেবী, চৈতন্যের সময়, অর্থাৎ উক্ত পদাবলীর রচনার অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান ছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত দূর আলোচিত হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯১ এবং ২১৯২ সংখ্যক পদ মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

পদকল্পতরুর ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদের বর্ণিতব্য বিষয় এক, এবং ভাব বা রচনারও বিশেষ পার্থক্য নাই। দুইটি পদে একই [illegible] বিভিন্নাংশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই দুইটি পদ একই কবির রচিত বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং মাধবী ও মাধবীদাস এক ব্যক্তি হইতেছেন। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও 'মাধবী' ও 'মাধবীদাস' ভণিতাযুক্ত [illegible] লিকে একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রব[illegible] কি[illegible]

মাধবীদাস ব্যবহারিক ভাবে পুরুষবাচ[illegible] উনবিংশ শতাব্দীতে দাসোপাধি 'মাধবী'-গণের নামান্তে ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবপ্রাধান্যের যুগেও, স্ত্রীলোকে আপনার নামের পর পুরুষের দাসোপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর [illegible]বী দেবীকে বিনা-প্রমাণে মাধবীদাস বলিয়া "সনাক্ত" করা সঙ্গত নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরি-উদ্ধৃত পদাবলীর রচয়িতা, মাধবীদাস বা মাধবী, শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবীদেবী বা কোনও স্ত্রী-কবি নহেন।

সত্যনির্ণয় আমার উদ্দেশ্য, দীনেশ বাবু বা তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভ্রমপ্রতিপাদন নহে। যদি এ স্থলে আমারই ভ্রম হইয়া থাকে, তাঁহারা বা [illegible] পর কেহ সেই ভ্রমের অপনোদন করিলে, সত্য সুপ্রকটিত হইবে।

কবিতাকুঞ্জ।

বসন্ত।

আসো নিশি-অবসানে ঊষা-হাসি সম
হিম ঋতু-অবসানে ;
মধু যৌবন নব জাগায়ে তুলিতে
ধরার বিবশ প্রাণে।
তুমি অঞ্চল ভরি আন সাথে করি
আধফোটা ফুল কলি ;
তাই গমনের পথে গুঞ্জরে তব
অযুত মত্ত অলি।
তব কুন্তলজালে খেলা করে সদা
লুব্ধ মলয় বায় ;
তব চরণ-আলোকে ঝলকে পুলকে
প্রজাপতি পায় পায়।
আন জলদ-মুক্ত নীল গগন,
জ্যোৎস্না-উজল রাতি,
তাজ ধরার অঙ্গে নন্দন-জাত
মধুর মাধুরীভাতি।
তুমি ধরার মলিন অধর-প্রান্তে
ফুটাও মধুর হাসি
তুমি বিমল সরসী-আরসী
হের নিজ রূপ
তুমি বিহগকণ্ঠে তুল জাগাইয়া
সুপ্ত মধুর স্বর ;
ওই ঐন্দ্রজালিক পরশে তোমার
পুলকিত চরাচর।
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটাও হরষে
আকুল প্রণয়মালা ;
তুমি চরাচর সব কর আলোকিত
ঢালি নিজ রূপ-আলা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সাধ।

সে উঠেছে ফুটি' স্বর্ণকমল
আমার মানস-সরসে ;
সাধ যায় তাই, হয়ে মধুব্রত
সৌরভে তার ভাসি' অবিরত
তা'রি চারিধারে উড়িয়া নিত্য
গুঞ্জন করি হরষে।

সে আমার বনে কুসুম গুচ্ছ
ফুল্ল যূথিকা কামিনী,
তাই চাহি, হয়ে বালরবিকর
ফুটাই তাহার শোভা মনোহর,
শিশিরবিন্দু হয়ে করি তারে
সিক্ত সারাটি যামিনী।

সে শোভিছে একা পূর্ণ ইন্দু
নির্ম্মল নীল আকাশে ;
সাধ যায়, হয়ে সিন্ধু অতল
বক্ষে রাখিতে সে ছবি অমল,
চকোরের মত উড়িতে ঊর্দ্ধে
তাহার অমিয় সকাশে।

সে যে বসন্তশোভার প্রতিমা—
মাধুরী অতুল ভুবনে ;
সাধ তাই, হ'য়ে কোকিল সুস্বর
গাহিতে তাহার গুণগৌরব,
অশোকের মত চরণ-পরশে
শোভিতে কুসুম-ভূষণে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নিশীথে।

আমি অনাথিনী, চির একাকিনী,
তোমায় ডাকি,
করুণা পাথার! এক বিন্দু তার
দিবে হে না কি?
কবে প্রকাশিবে হৃদয়-আকাশে,
শ্রীমুখ-ইন্দু?
করুণা-কিরণে, কবে উছলিবে
পরাণ-সিন্ধু?
ধূলিকণা লয়ে, গড়েছি হৃদয়ে—
যে ছবি, আমি ;

কনক বরণে কবে সাজাইবে
তাহারে তুমি ?
গভীর আঁধারে সংসার-পাথারে
পড়ে একেলা,
ওহে কর্ণধার ! পাব না তোমার
চরণ-ভেলা ?

শ্রীসরলাবালা সরকার।

কাল আঁখি।

কাল আঁখি তব সখি, সরসীর জল
অতল, অপরিমেয়, প্রশান্ত, নির্ম্মল,
শোভা তার ;—তটশোভা, শ্যাম-কুঞ্জবন
উদার আকাশ নীল বিম্বিত যেমন
সরসীর স্বচ্ছ বারি মাঝে, ওগো প্রিয়ে
তেমনি সুন্দর শোভা রয়েছে ফুটিয়ে
তোমার নয়ন মাঝে, স্নেহ, ভালবাসা,
মৌন লজ্জা, প্রীতি, দয়া, হৃদয়ের ভাষা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাকচী।

সংসারের পথে।

এসেছি দু' জনে হেথা
সুদূর হ'তে,
হারায়ে ফেলেছি তারে
এ কূট পথে;
জানি নাক কোথা যাব
এ দূর বনে,
এসেছি যে কোথা হ'তে—
নাই তা' মনে।
খুঁজিতেছি কত তারে,
পাই না দেখা;
র'ব আর কত কাল
এখানে একা !

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ ও মাঘ। "ষ্টুডেণ্ট মেস্" প্রবন্ধ [illegible] চিত্তাকর্ষক [illegible] জনক" হইয়াছে বটে। লেখক ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল [illegible] উজ্জ্বলতম [illegible] উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, কলিকাতার ছাত্রজীবনে কি কেবলই রৌদ্র ? তাহাদের জীবন কি মেঘসম্পর্কশূন্য ? বর্ত্তমান লেখক এক অংশের ছবি সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু আর এক অংশের চিত্রাঙ্কন এখনও অবশিষ্ট। "দৃষ্টিদান" গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। গল্পটির প্রত্যগ্র সৌন্দর্য্য ও কোমল করুণতার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর মত করুণরসের স্নিগ্ধ পূতধারা বহিয়া যাইতেছে। সুদক্ষ কবি, কঠোর দার্শনিকের মত কঠিনভাবে নায়িকার চিত্তবৃত্তির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আবার করুণাকোমল কবির ন্যায় সমবেদনাপূর্ণহৃদয়ে সেই ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় ভক্তিপ্রেমের [illegible] কমলদলে আবৃত করিয়া দিয়াছেন। "বীমসের বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। "ছবি-জন্ম" একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা,—কবিতা নহে, ছড়া। "গৃহকোণ" [illegible] সকলেরই পঠনীয়। লেখক বঙ্গলক্ষ্মীর অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্যশ্রীর চিত্র আঁকিয়া [illegible] আক্ষেপ করিয়াছেন,—"সেই জন্য এই বাহুল্যবিবর্জ্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট্‌কণ্টকিত আধুনিক কোনও [illegible] ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণী স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই এক জন ভ্রমপ্রমাদযুক্ত

ভানুমতী।

বিদায়।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমেষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপন [illegible] জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর, শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তিনি [illegible] এক শান্তিচ্ছায়া পাইয়াছেন, কি যেন [illegible] মনে মনে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মুখে [illegible] চিহ্ন কেহ দেখিল না; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় [illegible] পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চির অভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুষ্পোদ্যানে [illegible] করিয়া গ্রাম [illegible] দর্শন করেন। সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ [illegible] ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের [illegible] উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য [illegible] করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার [illegible] প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে [illegible] বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখদুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে [illegible] আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ [illegible] সকলের মুখে সেই একই কথা,—"মা! তুই কোন দেবকন্যা?" [illegible] নির্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে [illegible] বলিয়া ডাকিত, এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করি[illegible] দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইত।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনা[illegible] বয়স্ক[illegible]

তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন, পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই। কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া সেরেস্তার কাগজ ... গোছাইয়া লইতেছেন; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কিংবা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোন বৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে, উপলখণ্ডে কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে; সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাহিতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা!
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন;
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে; শুভ্র জ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যামপ্রেমে পুলকিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধ ... আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য

দেখিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল ; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি ? তিনি উঠিয়া উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই ! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে ; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজায়ার তীরে উহা আরও কত সুন্দর। অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি প্রতিকৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্তসলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম পরশমণির' দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল ; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথনাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা ! ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই [illegible]ভিথিতে আমার পূর্ব্বপুরুষের এই পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত

শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রুনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, যে কর্ম্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবারপ্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতেই বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।" কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি 'তুলট' কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালি গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিনী যে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছে একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি উহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। [illegible] পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শি[illegible] দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জী[illegible]রেন।

আমার বৈরাগিনী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াছে, এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিনীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৺পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা। কোনও মহৎ কার্য্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমিও মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজ-কিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিনী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রী হরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস
শ্রীগৌরদাস [illegible]

পত্রপাঠ শেষ করিয়া অনাথনাথ "ভানুমতী আমার অমিয়া! [illegible] মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে [illegible] মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল[illegible] তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই! সমস্ত বাড়ী, সমস্ত [illegible] উদ্যান ও উপবন, সমস্ত [illegible]দীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে [illegible]না। পুরাতে মহা আনন্দের [illegible]ব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, [illegible]আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি-

দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলেরই মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" শৈলসমীরণ [illegible] সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কলরবে, বলিতে লাগিল, [illegible]তী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে [illegible] যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ [illegible] অমিয়া।" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় ভানু- [illegible] কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদীতীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানু- মতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতায়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবন- সদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন [illegible]পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানু- [illegible] হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুৎবেগে পত্রের [illegible] ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"বা[illegible]জ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত [illegible]ছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা ও বৈরাগিনী মাতার বড় স্নেহ- ভাগিনী ছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে নানা [illegible] গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার [illegible]হপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিনী মাতা আমাকে কোলে লইয়া [illegible]ইতে গাইতে বৈরা[illegible]

চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়—কাঁদিতাম, পিতার সমুদয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি দোকানে তাঁর জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া বলিয়াছি,—'মা! তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাপী, তোর মত দেবকন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের [illegible] আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিলি; আমরা মহাপাপী, মায়াতে [illegible] হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ [illegible]বান। বৈরাগিনী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম [illegible] গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে [illegible] বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদে[illegible] করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোনও গৃ[illegible]ান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থা[illegible]মার জাতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ [illegible]কার দেখিলাম। আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি [illegible]রূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা হইলাম। [illegible]তা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। সর্ব্বশেষ তাঁহাদের শিশু পুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহায়

আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শন লাভ করি। দর্শন-মাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা।' হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণ-তলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি; কত লোক কতরূপ স্নেহ মমতা দেখাইয়াছে; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্রআশ্রয় বাজী দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুলটিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্যে কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সম্বাদ শুনিলাম, তোমার স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম! সর্ব্বশেষে আজি আমি পথের ভিখারিণী রাজ-নন্দিনী,—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।

কিন্তু বাবা! বৈরাগিনী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার এই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে ওই তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বল-পূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? যে জীবনলতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানা-ন্তরিত করিয়া সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা! এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-দুর্ল্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই

করে [illegible] তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি [illegible] ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূ[illegible] স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য সুখ স্থান পায় না।

> "হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
> কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
> নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
> বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেব-দেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি। বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন। আমি উঁহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বালগোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উঁহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। উহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব [illegible] গোস্বামী আমাকে [illegible]চাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহারই কাছে আদিনাথে গিয়া-

[illegible]। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, [illegible]কে বাঁচাইয়াছিলেন আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার'। উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি দিয়া পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সদ্গুণশালী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়েত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তি-বিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, বালকবালিকাগণের জন্য সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অনাথনাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি, সন্ন্যাসী ও আতুর নিরন্নের সেবা হইবে।

৫। আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশমতে সেই পবিত্র স্থানে মহামহীরুহ অশ্বত্থের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসি-য়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল' নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক তারকের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে; যেন সাধু বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলা-শ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা হইবে। সমুদ্র-প্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়-

ভাণ্ডার' হইতে [illegible] পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্র[illegible]

বাবা! তোমা[illegible] জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমাদের পিতা-পুত্রীর, মাতাপুত্রের,—আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রয়ে চলিলাম। তুমিও আসিও, বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। তপস্যা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাহার দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা
ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠসমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি; তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়াশ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল' মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

কক্ষে আলনার উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

মৌর্য্যসম্রাট অ...

চতুর্থ প্রস্তাব।

অশোক...রাজত্বের চতুর্থাংশ, ষড়বিংশতি বৎসর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। এই শেষভাগের ইতিহাস প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্তম্ভলিপি (Pillar Edicts) হইতে সংগৃহীত :—

১। দিল্লী সিভালিক বা ফিরোজ সাহার লাট ;

২। দিল্লী মিরাট ;

৩। এলাহাবাদ ;

৪। রাধিয় বা গৌড়িয় অররাজ, জেলা চম্পারণ ;

৫। মথিয় বা লৌড়িয় নবগুণ্ড, জেলা চম্পারণ ;

৬। রামপুরওআ, জেলা চম্পারণ।

সব স্তম্ভলিপিগুলিই প্রায় এক রকম। রামপুরওআর কতকটা প্রোথিত থাকার দরুণ চারিটি লিপিমাত্র পাওয়া গিয়াছে ; দিল্লী সিভালিকে সাতটি, এবং বাকি কয়টিতে ছয়টি লিপি আছে। এই সব লিপির শেষ পাঠ ডাক্তার বুলার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১) তাঁহার পাঠ সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে ; সুতরাং তাহাই এ রচনায় গৃহীত হইবে। সপ্তম লিপি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ সপ্তবিংশতি বৎসরে) আজ্ঞাপিত। সপ্তম লিপিটি এক বৎসর পরে, অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি বৎসরে লিখিত।

স্তম্ভলিপির সময়ে অশোক সম্পূর্ণ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা দেখাইয়াছি। তবে স্বাভাবিক সমদর্শিতাবশতঃ জনসাধারণের উদ্দেশে খোদিত অনুশাসনগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির সারাংশমাত্র নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ মতগুলির (dogmas) উল্লেখ করেন নাই। অতএব স্তম্ভস্থ অনুশাসনসমূহ গিরিলিপিমালার...বিবৃতিমাত্র, সারাংশে অতি সামান্য প্রভেদ।

স্তম্ভস্থ অনুশাসনগুলির মর্ম্ম দুই চারিটি উদাহরণ হইতে পাঠক কতকটা উপলব্ধি করিবেন। ধর্ম্মপালন করা উচিত ; কিন্তু ধর্ম্ম কি ? তাই দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে অশোক বলিলেন ;—

(১) Ep. Ind. vol. II, pp. 245 274.

"আসিনব কি? চণ্ডত্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, ঈর্ষ্যা।"

এই ত অশোকের নৈতিক ব্যাখ্যা; তদনুযায়ী উপদেশ। কর্তব্যকার্য্যের তালিকা গিরিলিপির তালিকা হইতে পৃথক নহে। তবে এখন অশোক কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সাধ্যমতে নিজ কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিচারকার্য্যে অনবরত হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে ব্যাঘাত হইবে; সুতরাং চতুর্থলিপিতে অশোক আজ্ঞা করেন যে, উচ্চপদস্থ "লাজুক"গণকে মান্য-করণ ও শাস্তিদানবিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত; সুতরাং পঞ্চম লিপিতে অশোক অনুজ্ঞা করেন যে, সেই সকল কয়েদীকে হুকুমের পর তিন দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে যে, তৎকালে তাহারা ও তাহাদিগের জ্ঞাতি বন্ধুরা দান বা ধর্ম্মচিন্তা দ্বারা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। সামান্য সামান্য দোষে দণ্ডিত বন্দিগণকে দয়া করিয়া খালাস দেওয়া রাজধর্ম্মের উচিত; তাই অশোক প্রতি বৎসর একবার করিয়া কতক কয়েদীকে খালাস দিতেন, এবং পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে লিখাইয়াছেন,—"ষড়বিংশতি অভিষেক পর্য্যন্ত পঞ্চ-বিংশতি বার আমা কর্ত্তৃক বন্দিগণ মুক্ত হইয়াছে।"

অশোকের দয়া কেবল মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না; পশুদের জন্যও তাঁহার হৃদয় করুণাপূর্ণ থাকিত। ইহার নমুনা প্রথম গিরিলিপির "জীবহিংসা অকর্ত্তব্য" এই উপদেশে ও দ্বিতীয় গিরিলিপির পশুচিকিৎসাশালাস্থাপনে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে তাহা বিস্তারিত করিয়া, কোন কোন জীব কোন কোন সময়ে অবধ্য, ইহার তালিকা দিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই তালিকাটির অবিকল নকল দিয়ে [illegible]। পাঠক দেখিবেন, অশোকের দয়া ও সহানুভূতি কত দূর বিশ্বব্যাপিনী।

"দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ আমা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে—শুক, সারিকা, অরুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গেলাট, জাতুকা, অম্বাকপীলিকা,

নদী, অনস্থিকা মৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুপুটক, [illegible] শল্যক, পর্ণশশ, সৃমর, ষণ্ডক, ওকপিণ্ড, পলসত, শ্বেত[illegible]লাক [illegible] চতুষ্পদ সকল যাহা প্রতিভোগে আসে না বা খাদ্যও হয় না, [illegible] (মাদী ছাগলী) এড়কা (মাদী ভেড়ী) ও শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী [illegible] এবং তাহাদের ছয় মাসের ন্যূনবয়স্ক পোতকেরাও তদ্রূপ। বধি-কুক্কুট কাটা হইবে না; জীব সহিত তুষ দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থে বা হিংসার্থে বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না; জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চাতুর্মাস্যায়, পৌষপূর্ণিমাতে, (মাসের) তিন দিবসে চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে, এবং প্রত্যেক উপবাসদিনে মৎস্য অবধ্য ও বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিবসে নাগবনে এবং কেউট-ভোগে যে সমুদায় অন্য জীব থাকিবে, তাহারাও হন্তব্য নয়। অষ্টমীপক্ষে, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তদিনে, তিন চাতুর্মাস্যায়, ও (অন্য) সুদিবসে ষাঁড় খাসি করা হইবে না; এবং অজ, মেষ, শূকর বা অন্যান্য জীব, যাহাদিগকে লিঙ্গরহিত করা হয়, তাহা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসু দিনে, চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায়, চাতুর্মাস্য পক্ষে, অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত হইবে না।" (২)

ফিরোজশাহের সপ্তম স্তম্ভলিপি সুপ্রসিদ্ধ। ইহার প্রথমাংশ সোজা লেখা; দ্বিতীয়াংশ বাঁকা করিয়া দুই পার্শ্বে লেখা; এই জন্য পূর্ব্বে ইহা দুইটি স্বতন্ত্র লিপিরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। এই লিপিতে প্রিয়দর্শিন্ কি কি ধর্ম্মকার্য্য কি কি উদ্দেশে করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অতএব সব ধর্ম্মলিপির মধ্যে এইটি সুদীর্ঘ। ইহা স্থানে স্থানে অস্পষ্টভাবে পঠিত; এবং ইহাতে অন্যূনকাল কোন কবিত্ব বা লিপিকুশলতা নাই। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপ্রচার ও তদনুযায়ী ধর্ম্মকার্য্যাবলীতে যদি কোন যশ থাকে, তবে সে এই লিপি-জ্ঞাপক প্রিয়দর্শিনের। যাঁহারা লেখকের জড়িত, পুনরুক্তিপূর্ণ বাক্যে বিরক্ত না হন, তাঁহাদের জন্য সমস্ত সপ্তমলিপিটি পরিশিষ্টে নকল করিয়া দিলাম।

অশোক কবে রাজা হন, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহা দেখা যায় যে, লিপিমালায় বৎসর সর্ব্বত্র অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, রাজা হওয়ার বৎসর অভিষেকের বৎসর হইতে পৃথক। কত পৃথক, তাহা জানিবার কোন বিশ্বসনীয় উপায় নাই; অন্ততঃ এখনও পাওয়া

(২) Bühler, Ep. Ind. vol. II, pp. 257-8.

নাই। সিংহলদেশীয় বিবরণ গ্রহণ করিলে অশোক পঞ্চম বৎসরে রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েন। ইহাতে কোন অসম্ভবতা দেখিতেছি না। অভিষেক কখন হয়? গিরিলিপি হইতে দেখা যায় যে, অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) বিদেশীয় রাজগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবার অনুজ্ঞা হয়। সেই সময় কিরিনি-রাজ মগ ও ইপায়রস-রাজ আলিকসুদরো জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যু অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৮ বৎসরে হয়। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫৯ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে অশোকের ত্রয়োদশ বৎসর (অভিষেকের) পড়িয়াছিল, ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। সেই হিসাবে তাঁহার অভিষেকের প্রথম বৎসর ২৭১ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে পড়িতেছে। যদি পালি ইতিহাস ঠিক হয়, তবে অশোক ২৭৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে রাজা হইয়াছিলেন।

অশোকের প্রকৃত মৃত্যুকাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। সপ্তম স্তম্ভলিপি হইতে দেখা যায় যে, তিনি অভিষেকের অষ্টাবিংশতি বৎসরে জীবিত ছিলেন। সপ্তম স্তম্ভলিপির সময় ২৭১---২৭=২৪৪ খৃঃ পূঃ। তাহার পর তারিখবিশিষ্ট কোনও লিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৌরাণিকমতে তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ২৩৯ (২৭৫-৩৬) খৃঃ পূঃ বৎসরে পড়িতেছে। সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব অসঙ্গত বোধ হয় না।

অশোকের বংশাবলীর বিবরণ অতি অস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী এই যে, ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রায় সকলকে তিনি বিনাশ করেন; ইহা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। পঞ্চম গিরিলিপিতে ভ্রাতৃবর্গকে সাধারণতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ধউলী ও জউগড়ের প্রথম নম্বর বিশেষ লিপিতে "কুমার"-গণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার অবরোধে বহু মহিষী ছিল, সন্দেহ নাই। পঞ্চম গিরিলিপি ও সপ্তম স্তম্ভলিপিতে তাঁহারা "দেবীগণ" ইতি শব্দে উল্লিখিত। কিম্বদন্তীমতে অসন্ধিমিত্রা তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পরে নববিবাহিতা তিষ্যরক্ষিতা প্রধানা মহিষী হয়েন। সন্তান অনেকগুলি ছিল। সপ্তম স্তম্ভলিপিতে অশোক নিজে লেখাইয়াছেন,—"দালকানাম্ পি চ মে" (এবং আমার পুত্রগণেরও)। কোনও পুত্রের নাম লিপিমালায় পাওয়া যায় না। হিন্দু পুরাণ মতে সুযশা নামক পুত্র তাঁহার অন্তে সম্রাট হয়েন। হাওনথসাঙ শুনেন যে, অশোকের ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক পুত্র গান্ধারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দীপবংশ ও মহাবংশমতে অশোকের পুত্র মহিন্দ ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রেরিত

হন। ... বলেন, মহেন্দ্র অশোকের বৈমাত্রের ভ্রাতা। ... অবল... কুণাল নামে অশোকের একটি পুত্র ছিল। তাঁহার গল্পটি ... উদ্ধৃত করিলাম।

অশোকরাজের এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার লোচনযুগল অতি সুন্দর, কুণাল পক্ষীর ন্যায়। এই জন্য লোকে তাঁহাকে কুণাল বলিয়া ডাকিত। যৌবনাগমে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত মৃদু থাকায় তিনি রাজবাটীর গোলমালে মিশিতে চাহিতেন না; দূরে থাকিয়া সংসার অনিত্য বুঝিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন। ঘটনাক্রমে অশোকমহিষী ঋষ্য-রক্ষিতা তাঁহাকে দেখিতে পায় ও দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়ে। তখন মহিষী তাঁহাকে অবৈধ প্রণয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্থিরচিত্ত টলাইতে পারে না। ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় রাণীর প্রেম ক্রোধে পরিণত হয়। তাহার ষড়যন্ত্রে কুণাল রাজধানী হইতে অতিদূরে তক্ষশিলায় শাসনকর্ত্তৃস্বরূপে প্রেরিত হন। কিয়ৎকাল পরে রাণী কৌশলক্রমে সম্রাটের হস্তিদন্তনির্ম্মিত মোহর যোগাড় করে ও সেই মোহরা-ঙ্কিত এক হুকুমনামা সম্রাটের নামে তক্ষশিলাস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট পাঠায়। তাহাতে আজ্ঞা ছিল যে, কুণালের দুই চক্ষু উপড়াইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে কুণাল সুশাসনের দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং রাজাজ্ঞা পাইয়াও কেহই এমন নির্দ্দয় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল না। কুণাল কিন্তু রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তাহাদের অনেক বোঝান ও অবশেষে ... পুরস্কারের ঘোষণা দেন। পুরস্কারলোভে অবশেষে এক জন কদাকার কুষ্ঠরোগী স্বীকৃত হয়। রোরুদ্য-মান প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সেই চণ্ডাল প্রথমে এক চক্ষু উপড়ায়; উৎ-পাটিত চক্ষু হস্তে করিয়া কুণাল বলিলেন,—

"হতভাগ্য মাংসপিণ্ড, কেন এই সকল মূর্ত্তি, যাহা কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দেখিতে-ছিলে, আর দেখিতে পাইতেছ না? যাহারা তোমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে 'আমি', তাহারা নিজেকে কতই না প্রবঞ্চিত করে, তাহারা কতই না নির্ব্বোধ।"

দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটিত হইলে তিনি বলেন যে,—"এই মাংসচক্ষু যাহা কষ্টে পাওয়া যায়, আজ আমা হইতে উৎপাটিত হইল; কিন্তু বোধ-

(...) Beal's ... Yu Ki. vol. II. pp. 91-3, 246-7.

পুত্র সর্বগুণান্বিত জ্ঞান-চক্ষু পাইলাম। রাজা আমাকে [illegible] আমি মহৎ ধর্ম্মরাজের পুত্র হইলাম। সকলে আমাকে [illegible] যদিও আমি উচ্চ পদ হইতে চ্যুত হইলাম, যাহাতে এত কষ্ট ও শোক নিহিত আছে, তবু আমি ধর্ম্মরাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, যাহাতে কষ্ট ও শোক বিলুপ্ত হয়।”

কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি জ্ঞাত হন যে, সম্রাট নিজে কোন আজ্ঞা দেন নাই, মহিষী তিষ্যরক্ষিতার প্রবঞ্চনায় সেই জাল আজ্ঞাপত্র আসিয়াছিল। তখন কুণাল উত্তর দেন:—“তিনি বহু দিন সুখ, আয়ু ও ক্ষমতা ভোগ করুন, যাঁহা হইতে আমার এই উপকার হইল।”

তৎপরে অন্ধ রাজপুত্র সস্ত্রীক পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা করেন ও ভিক্ষা দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। কালক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ও বীণাবাদন করিতে করিতে পিতার প্রাসাদের নিকট আইসেন। সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া অশোক তাঁহাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে ডাকান, কিন্তু প্রথমতঃ চিনিতে পারেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অবশেষে সর্ব্ব ঘটনা শুনিতে পান। ক্রোধে রাণী তিষ্যরক্ষিতাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। আজ্ঞাশ্রবণে রাজপুত্র বারণ করেন ও বলেন, “রাজন্, তাহাকে বধ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। নিজ পদ ও মন অনুযায়ী কার্য্য করুন; নারীহত্যা করিবেন না। দয়ার অপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার নাই। তথাগত ধৈর্য্য আজ্ঞা করিয়াছেন।” পুনশ্চ অশোকের পদতলে নিপতিত হইয়া বলেন, “পিতঃ, আমি কোন যাতনা ভোগ করিতেছি না, ও রাণীর নির্দ্দয় ব্যবহারে কোন ক্রোধাগ্নি অনুভব করিতেছি না। আমিই আমার দুঃখের জন্য দায়ী; বোধ হয়, কোন প্রাক্তন পাপকর্ম্মের জন্য এ জন্মে এই শাস্তি ভোগ করিতেছি। আমার বাক্য সত্য; যদি বিশ্বাস না করেন, তবে, হে চক্ষু, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হও।” ইহা বলিতে বলিতে চক্ষুতে পুনরায় দর্শন-শক্তি ও পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্য আসিয়া পড়িল। (১৭)

(১৭) Burnouf's Introd, p. 403 etseq. L. C. Oldenberg's Buddha (Eng. trans.) pp. 296-8 and B. st Hilaire's Buddha (Eng. trans.) 110-2. "Buddhist poetry has nowhere glorified in more beautiful fashion forgiveness and the love of enemies than in the narrative of Kunala." (Oldenberg, p. 298.)

পঞ্চম প্রস্তাব ।

পাঠকের সুবিধার্থে অশোকের জীবনচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ হইল। তদীয় জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিবার নিমিত্ত এই কয়টি দলীল ব্যবহৃত হইয়াছে :—

গুহালিপি	তিনটি	ফাহিয়েনের ফো-কো-কি (৩৯৯-৪১৪ খৃষ্টাব্দ)
শিলালিপি	পনেরটি	হিউএন্‌সাঙের সি-উ-কি (৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)
স্তম্ভলিপি	দশটি	
দীপবংশ	(সিংহলদেশীয় পালি ইতিহাস)	বায়ুপুরাণ
মহাবংশ	ঐ	মৎস্যপুরাণ
অট্টকথা	ঐ	বিষ্ণুপুরাণ
		ভাগবতপুরাণ
		দিব্যাবদান
		অশোকাবদান

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

খৃষ্ট পূর্ব্ব বৎসর		বিবরণ
২৭৪	...	সিংহলবৃত্তান্তমতে সিংহাসনে আরোহণ।
২৭০	..	অভিষেক।
২৬৩	...	কলিঙ্গ-বিজয়।
২৬২	...	অশোকের অনুশোচনা। বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক হওয়া।
২৬১	...	ধর্ম্মযাত্রায় আজ্ঞাপ্রদান।
২৫৯	...	"সংঘকে উপগত" হওয়া। অধিকাংশ ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ। স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারক প্রেরণ। বরাবরকে দুই গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৫৮	..	ধর্ম্মমহামাত্য নিয়োগ।
২৫৭	...	কোণাকমণের স্তূপের পুনঃসংস্কার।
২৫৩	...	সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের লিপিদ্বারা প্রকাশিত। মগধসংঘকে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুজ্ঞা। পালি বিবরণ মতে তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির সমবেত।
২৫২	...	নাগার্জ্জুনীর তৃতীয় গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৪৯	...	ধর্ম্মযাত্রায় শাক্যমুনির জন্মস্থান লুম্বিনি গ্রামে পূজা।
২৪৫		সপ্তমলিপি ব্যতীত অন্যান্য স্তম্ভলিপি আজ্ঞাপিত।
২৪৩	...	সপ্তম স্তম্ভলিপির প্রকাশ।
২৩২	...	পৌরাণিক মতে অশোকের মৃত্যু।

মৃত্যুকালে অশোকের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সুবিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার গিরিলিপি সিদ্ধাপুরে উৎকীর্ণ হওয়ায় দেখা যায় যে, মহীশূরের উত্তরাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। পড়েরিয়া ও নিগ্লীবস্থ স্তম্ভলিপি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, নেপালের দক্ষিণাংশ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; অনুমান, ব্রহ্মপুত্র নদী পর্য্যন্ত। পশ্চিমে গান্ধার ও কাম্বোজ তাঁহার অধীনস্থ ছিল; সুতরাং বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অধিকাংশ তাঁহার শাসকের বশবর্ত্তী ছিল, এমন সম্ভব। অতএব মোটামুটি চতুঃসীমা এই :—

উত্তরে হিমালয় ও হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালা; পশ্চিমে হেলমন্দ নদী, বেলুচিস্থান ও আরব্য মহাসাগর; দক্ষিণে মহীশূর, ১৪° অক্ষাংশ; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদী।

ইহার অতি দীর্ঘতা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় পঞ্চদশ শত মাইল; অতিপ্রস্থতা উত্তর-দক্ষিণে অনুমান চতুর্দ্দশ শত মাইল। এই বিশাল সাম্রাজ্য আয়তনে সার্দ্ধ বার লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না; এবং ইহাতে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা বিংশতি কোটীর ঊর্দ্ধ। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এত বড় প্রকাণ্ড জনপদ ভারতে কখনও একচ্ছত্রীকৃত হয় নাই। ইহা অশোক প্রিয়দর্শিনের যুদ্ধকৌশল ও সুশাসনের জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেক্সপীয়রের সহিত আমরাও বলিতে পারি,—

"His life was gentle, and the elements
So mixed in him that Nature might stand up
And say to all the world 'This was a man'."

আর দুই চারিটি কথায় এই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, কিম্বদন্তীময় অশোকচরিত্র শেষ করিব। কি বীর্য্যবত্তা, কি কার্য্যকুশলতা, কি ধর্ম্মবিষয়িণী সমদর্শিতা, সর্ব্ব বিষয়ে অশোক বনাম প্রিয়দর্শিন্ ভারতীয় রাজগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার একমাত্র সমতুল মোগল সম্রাট জেলালুদ্দিন্ আকবর। উভয়েই তেজস্বী পিতামহের পৌত্র; এক জন চন্দ্রগুপ্তের,—আর এক জন বাবরের। উভয়েই স্বীয় ভুজবলে পিতৃ-রাজ্য অধিকার করেন; উভয়েই নিজ যুদ্ধনিপুণতায় সুবৃহৎ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংগঠিত করেন; উভয়েই মনুষ্য চিনিতে বিচক্ষণ ছিলেন; সুদক্ষ কর্ম্মচারী রাখিয়া ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর সময়োচিত পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজ নিজ বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসিত করেন; উভয়েই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও

সমুজ্জ্বল বুদ্ধি বলে স্বরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বহিঃস্থ রাজ্যমালা ও তত্রত্য ধর্ম্মাবলির সংবাদ রাখিতেন; অশোক গ্রীক রাজগণের সম্বন্ধ রাখিতেন, আকবর পোর্টুগিজ ও ইটালিয়ানগণের সংস্পর্শ রাখিতেন। উভয়েরই নিকট বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ যথেষ্ট মান্য পাইতেন; তাহার চিহ্ন অশোকের লিপিমালায় ও ত্রিপিটকসমূহে, এবং আকবরের সভাস্থ আবুল-ফজল, বদাওনি ও ফৈজির পুস্তকাবলীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্নতভাবে সমদর্শী ছিলেন। অশোক বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতে বলিতেন; আকবর মুসলমান হইয়াও হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি ইত্যাদি ধর্ম্মকে মান্য করিতেন, এবং সাদরে তাহাদের যুক্তি শুনিতেন।

অবশ্য, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও দেখা যায়। অশোক অপেক্ষা আকবরকে পিতৃরাজ্য-অধিকার ও বিস্তৃতির জন্য অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিয়া অশোক অপেক্ষা অধিক বর্ষ রাজত্ব করিয়াও অশোক-সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার করিতে পারেন নাই। তথাপি রাজকার্য্যজ্ঞান, ক্ষিপ্রকারিতা, যুদ্ধকুশলতা, ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে, আমার ধারণা, তিনি অশোকের অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। সেই কারণে, পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য, পাঠান ও মোগল কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু মুসলমানের ঘোরতর শত্রুতা সত্ত্বেও, এত বড় বৃহৎ সাম্রাজ্য রাখিয়া যান; এবং সেই সাম্রাজ্য পুত্রপৌত্রাদিগণের অক্ষমতা ও গৃহবিবাদ সত্ত্বেও এক শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী ছিল, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, অশোকের বংশধরেরা পঞ্চাশ বর্ষের অধিককাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, এবং অনুমান হয়, অল্প দিনে তাঁহার সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায়। পরন্তু ইহাও আমার বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আকবর অপেক্ষা অশোক উচ্চস্থানীয়। অনবরত যুদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের কঠোরতাবশতঃ আকবর অশোকের সপ্তদশ শত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াও তাঁহার ন্যায় নৈতিক উদারতা, ধর্ম্মবিষয়িণী সমদর্শিতা ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবলসজীবতাপূর্ণ চেষ্টা দেখাইতে পারেন নাই। নিজের অনবরত চেষ্টা, স্বরাজ্যে প্রতিবেদক, ধর্ম্মমহামাত্য প্রভৃতি বিশেষ ধরণের কর্ম্মচারীর নিয়োগ, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ, অন্য ধর্ম্মে সহানুভূতি [illegible] দ্বারা [illegible]োক বৌদ্ধ ধর্ম্ম[illegible]ত [illegible]য়াছেন

যে, অন্য কোন রাজা কোন-ধর্ম্মবিশেষের জন্য এত করেন নাই। সেই কারণে, অশোকের নাম, স্বদেশে বা বিদেশে, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্ন আছে, সেখানে এখনও ভক্তির সহিত উল্লিখিত হয়।

স্থূল কথায়, উভয়েই শ্রেষ্ঠ নরপতিশ্রেণীতে গণনীয়। এক জন সাম্রাজ্য-সংগঠক যোদ্ধা নরপতি; অপর জন ধর্ম্মপ্রচারক ধার্ম্মিক ভূপতি। আকবর, পার্শী কায়রস্ (Cyrus) মাকিডনাধিপতি এলেক্জাণ্ডার, রোমক কাইজর (Caesar), জর্ম্মান্ সার্লেমেন্ (Charlemagne) ফরাসিস্ চতুর্থ হেনরি, রুসিয়ান্ পিটার, প্রুসিয়ান্ ফ্রেডরিক্ প্রভৃতির সমকক্ষ; অশোক য়িহুদি সলোমন্, রোমক মার্কস অরিলিয়স্ ও কন্‌ষ্টাণ্টাইন, ফরাসীস্ লুই দি পায়স্ (Louis the Pious), প্রভৃতির সমকক্ষ। উভয়েই জগৎপূজ্য, মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ।

অশোকচরিত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক মসিয়র সেনার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া রচনা শেষ করিলাম। (১৮)

"It cannot, I think, be denied, wthout injustice, that he (Piyadasi) exhibits, in his edicts, a spirit of moderation, a moral elevation, a care for the public good, which merits every praise. He possessed from his birth a taste for enterprise and energetic qualities, borne witness [illegible] by the conquest of Kalinga.. . That intellect (of his) was not perhaps very vast or very decided, but it was certainly animated with excellent intentions and full of the idea of moral duty and of the sentiment of humanity. By the various efforts with which he was inspired in his religious zeal, by his relations with nations not subject to his empire, nay with peoples the most distant from the Peninsula, and finely by the monuments epigraphic or otherwise of which he was the creator, Piyadasi certainly rendered services to the general civilisation of India, and the credit of these merits we are in justice bound to render to him."

পরিশিষ্ট।

সপ্তম স্তম্ভলিপির অনুবাদ; ডাক্তার বুলারের পাঠ।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই বলিয়াছেন,—

(১৮) Ind. Ant. [illegible]), pp. 266-7.

অতিক্রান্ত অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া জনগণ-মধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় নাই।

এই (বিষয়ে) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

এই (চিন্তা) আমার হইল "অতিক্রান্ত ও অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন—কেমনে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারা যায়—কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় নাই।" কি প্রকারে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে; কি প্রকারে ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য (অন্ততঃ) কতকটা অভ্যুন্নতি হইতে পারিবে। এই (সম্বন্ধে) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই (ভাব) আমাতে আসিল,—ধর্ম্মশ্রবণ সকল ব্যাপ্ত করিব; ধর্ম্মানুশাসন সকল জ্ঞাত করাইব; জনেরা ইহা শ্রবণ করিয়া অনুপ্রতিপন্ন হইবে ও অভ্যুন্নত হইবে। ধর্ম্মবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি হইবে। এতদর্থে আমি ধর্ম্মশ্রবণসমূহ ব্যাপ্ত করিয়াছি; বিবিধ ধর্ম্মানুশাসনগুলি আজ্ঞাপিত করিয়াছি; যে আমার পুরুষেরা বহুজন মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে প্রতিবর্দ্ধিত ও পরিবোধিত করিবে। রাজুকেরাও আমা কর্ত্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, বহুপ্রাণী শত-সহস্রে যাইয়া ধর্ম্মযুক্ত জনগণকে এই প্রকার এই প্রকার প্রতিবোধ কর।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই সকল অনুবেক্ষণ করিয়া আমি ধর্ম্মস্তম্ভাবলী করিয়াছি, ধর্ম্মমহামাত্র-গণ (নিযুক্ত) করিয়াছি, ধর্ম্মশ্রবণসমূহ (ব্যাপ্ত) করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মার্গসমূহে ন্যগ্রোধাবলি রোপিত করিয়াছি যে, তাহারা পশু মনুষ্য সকলকে ছায়ার উপভোগ দিবে; আম্রবাটিকাসমূহ রোপিত করিয়াছি; প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশে বাপী খনন করিয়াছি; ধর্ম্মশালা সকল করাইয়াছি; বহু বহু আপণাবলী করাইয়াছি—মনুষ্য ও পশুগণের প্রতিভোগ জন্য। এই প্রতিভোগে নাম (কিন্তু "লঘু")। পূর্ব্ব রাজগণও আমার ন্যায় বিবিধ সুখদ্বারা জগৎ সুখায়িত করিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মানুপ্রতিপত্তি অনুপ্রতিপন্ন হউক—এতদর্থে আমি [illegible] করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা [illegible]

ধর্ম্মমহামাত্যেরা প্রব্রজিত ও গৃহস্থগণের মধ্যে বিবিধ অনুগ্রহিক বিষয়ে তৎপর আছে। পাষণ্ডগণের মধ্যেও তৎপর আছে। আমি (বন্দোবস্ত) করিয়াছি—তাহারা (বৌদ্ধ) সংঘ মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে (হিন্দু) আজীবিকগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা (জৈন) নিগ্রন্থগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা নানা পাষণ্ডদলের মধ্যে তৎপর থাকিবে—যে সেই সেই মহামাত্যগণ যথাযথ প্রতিবিষ্ট থাকিবে। সেই ধর্ম্মমহামাত্যগণ আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) যে এই সকল দলে তৎপর থাকিবে, এবং অন্য পাষণ্ড দলেও তৎপর থাকিবে।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

ইহারা এবং অন্য বহুমুখ্য (কর্ম্মচারীরা) আমার ও দেবীগণের (মহিষীগণের) দানবিষয়েও তৎপর আছে। সকল (কর্ম্মচারীরা) আমার অবরোধীগণের (অন্দর মহলের) মধ্যে বিবিধ প্রকারে সন্তোষের উপায় (দেখাইতেছে), এখানে (পাটলীপুত্রে) এবং সর্ব্ব দিকেতে। আমি (এখন ইহা) করিয়াছি যে, (তাহারা) আমার পুত্রগণের ও অন্যান্য দেবীকুমারগণের দানবিষয়ে তৎপর থাকিবে—ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি নিমিত্ত। ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি এই যে দয়া, দান, সত্যতা, শুচিতা, মৃদুতা, সাধুত্ব, এই সব লোকে বৃদ্ধি পাইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ রাজা ইহা বলিয়াছেন,—

(নিম্নলিখিত) যে কিছু সাধুকার্য্য আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) হইয়াছে, লোকে তাহাকে অনুপ্রতিপন্ন করিয়া অনুবিধান করিয়াছে, তাহাতে বাড়িয়াছে ও বাড়িবে—মাতা পিতার প্রতি শুশ্রূষা, গুরুর প্রতি শুশ্রূষা, ব্রাহ্মণ শ্রমণ দরিদ্র ও দুঃখী, এমন কি, দাস ভৃত্যের প্রতি সম্প্রতিপত্তি।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মনুষ্যগণের মধ্যে এই ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে বিবিধ প্রকারে, ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা ও নিধ্যানম্ দ্বারা। তাহার মধ্যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা লঘু, নিধ্যানম্ দ্বারা বহু। ধর্ম্মনিয়মে আমা দ্বারা ইহা কৃত হইয়াছে—এই এই জাতি অবধ্য; অন্যান্য বহু নিয়মও আমি করিয়াছি। নিধ্যা[illegible]চিন্তা) কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে ভূয়সী ধর্ম্মবৃদ্ধি করিয়া[illegible]অবিহিংসায় ও প্রাণিগণের অনালম্ভায়। এতদর্থে ইহা [illegible], পুত্রপৌত্রাদিকাল

পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য (স্থিতি) পর্য্যন্ত ইহা থাকুক, ও তদনুযায়ী (সকলে) অনুপ্রতিগমন করুক। এবংবিধ অনুপ্রতিগমন করিলে ইহতঃ ও পরতঃ আনন্দ হইবে। সপ্তবিংশতিবর্ষাভিষিক্ত আমা দ্বারা এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইল।

দেবপ্রিয় এই বলিয়াছেন,—

যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে, সেখানে এই ধর্ম্মলিপি লেখাইবে, যে তদ্দ্বারা ইহা চিরস্থায়ী হইবে।

সম্পূর্ণ।

ভারত-যুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি।

গত দুই মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় যুধিষ্ঠিরের কালনিরূপণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত কালনিরূপণের পক্ষে জ্যোতিষিক উপজীব্য-গুলি আলোচনা করিয়া ১৩০১ সালের পৌষ মাসের 'নব্যভারতে' আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই। তদবধি সময়ে সময়ে ঐ বিষয়টি মনে হইয়াছে। নিখিল বাবুর দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আবার দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হইল। এই প্রবন্ধে তাঁহার কোন কোন অনুমানের প্রতিবাদ আবশ্যক হইবে, এবং কোন কোন প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে।

ভূমিকায় একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রাচীন কালের ইতিহাস-প্রকটন-সময়ে পদে পদে প্রমাণ আশ্রয় করিতে হয়। ইতিহাসে আপনার আমার জল্পনা কল্পনার মূল্য কিছুই নাই। আমাদের জ্যোতিষ-[illegible] নিখিল বাবু এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহার প্রত্যেক উক্তিরই প্র[illegible] পাইতে ইচ্ছা হয়। তর্ক করিবার উদ্দেশে এ কথা বলি না; নিরর্থক তর্ক করিবার সময়ও নাই, রুচিও নাই। এইরূপ দুই একটা উক্তির উল্লেখ করিতেছি।

(১) সপ্তর্ষিকে [illegible] মনে করা নিতান্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির কার্য্য। সংহি-তায়, সিদ্ধান্তে [illegible] বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৺বাপুদেব শাস্ত্রী কৃত্তিকাকে সপ্তর্ষি মনে করিতেন [illegible] সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

(২) কোন কোন প্রাচীন সংহিতাকার সপ্তর্ষির একটা গতির উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তর্ষি না কি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। কোন সিদ্ধান্তে এই গতি অঙ্গীকৃত হইতে দেখি নাই। সংহিতা ও ব্যবহার-গ্রন্থে এবং পুরাণেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, কোন নিরপেক্ষ গণিতবিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিচার করেন নাই। কথাটা ঠিক নহে। নিরপেক্ষ জ্যোতিষী অর্থে যুরোপীয় পণ্ডিত মনে করিলে, বেণ্টলী ব্যতীত কোলব্রুক এবং সম্প্রতি ত্রেনাও সাহেব যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। আমাদের জ্যোতিষী মনে করিলেও দুই এক জন করিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তী করেন নাই; বোধ করি, কেহই এই গতি বিশ্বাস করিতেন না। সংহিতা ও পুরাণে যাহাই হউক, প্রত্যক্ষাসিদ্ধ বিষয় সিদ্ধান্তকারগণ বিশ্বাস করিতেন না। সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌমে মুনীশ্বর, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেকে কমলাকর, এবং সম্প্রতি সিদ্ধান্তদর্পণে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির উক্ত গতি বিচার করিয়া, কেহ বা কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কেহ বা অর্থান্তর ঘটাইয়া সংহিতাকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন। বিদেশীয় জ্যোতিষী অপেক্ষা স্বদেশীয় জ্যোতিষীর ব্যাখ্যার আমরা অধিক সমাদর করি। এ জন্য সিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিবেকে ইহার যে বিচার আছে, তাহার সারার্থ দেওয়া যাইতেছে।

কমলাকর লিখিয়াছেন, শাকল্যমুনি সপ্তর্ষি তারকার বিক্ষেপ ও ধ্রুবক চল বলিয়াছেন। এই সকল তারা এক রবিবর্ষে ৮ লিপ্তা করিয়া গমন করে। যুগাদিতে ক্রতু তারা শ্রবণায় ব্যবস্থিত ছিল। * * * কিন্তু

ইত্থং ভগোলে বসতির্মুনীনাং নৈব সঙ্গতা। অন্যথানুপপত্ত্যাতঃ সার্ব্ব[illegible]তা॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

মুনির্ব্বর্ষশতেনৈকং প্রাগ্‌গত্যা ভং ভুনক্তি বৈ। তদ্বৃত্তস্যানুরোধেন কল্পনেয়ং বুধৈঃ স্মৃতা॥

শেষে বলিতেছেন, এই সকল মুনি লোকপ্রসিদ্ধ মুনি নহেন, অন্য [illegible] নহেন। তবে, কাহাদের গতি লিখিত আছে? না অঙ্গীকৃত দেবাংশের।

স্থূল কথা, কমলাকর সপ্তর্ষির পূর্ব্বগতি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অথ[illegible] সংহিতার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্যও নহে। তাই এক কল্পিত ব্যাখ্যা [illegible] বিষয়টি ঢাকিতে চাহিয়াছেন।

ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ইদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির গতি আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাই সিদ্ধান্তদর্পণে লিখিতেছেন,—

...প্রোক্তা পুরাণেরষ্টলিপ্তিকা। তথারনাংশসংস্কারো বামত্বেবাং বর্জ্জীরিতঃ।
তেবাং যো লিপ্তিকা পূর্ব্বানুজবাদর্শনাদয়া। তৎসর্ব্বং কবিভির্জ্ঞেয়ো বোজ্যং তৎকালিকস্থিতেঃ॥

অর্থাৎ, পুরাণে সপ্তর্ষির ৮ কলা করিয়া যে পূর্ব্বগতি লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বে অনুভব-অদর্শন হেতু আমি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যদি কোন গতি থাকে, তবে আমার সময়ে সপ্তর্ষির স্থিতি দেখিয়া ভবিষ্যেরা স্থির করিবেন।

এই গতি সম্বন্ধে আমরা যেমন বুঝিয়াছি, তাহা 'নব্যভারতে' দৃষ্ট হইবে। পরেও কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের গতি যে কাল্পনিক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ গতির আরম্ভ মঘা নক্ষত্রে বৎসরে ৮ কলা, এবং পূর্ব্বাভিমুখে। ঐ গতি এমন অস্বাভাবিক যে, পূর্ব্বকালে বিদেশীয় আলবেরুনী উহাকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের প্রাচীনদিগকে উপহাস করিতে ছাড়েন নাই। নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, গর্গ, পরাশর, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ এই সপ্তর্ষির গতির বিষয় নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" সংহিতাকার বৃদ্ধগর্গ এই গতির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বোধ করি, তিনিই এই কথা রটাইবার মূল। বরাহ তাঁহার সংহিতায় (সিদ্ধান্তে নহে) গর্গের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। পরাশর সংহিতাকার ছিলেন, তিনিও ঐ গতি উল্লেখ করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু পরাশরসংহিতা আজকাল দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন, আর্য্যভট্ট বা অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক সিদ্ধান্তী সপ্তর্ষির গতির বিষয় স্ব স্ব গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া [illegible]নি[illegible]। এমন গুরুতর বিষয়ে প্রমাণ জন্য শ্লোক উদ্ধার করা আব[illegible] করিবেন, সিদ্ধান্ত ও সংহিতার মধ্যে আকাশ পাতাল [illegible]ভেদ।

(৩) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "রাশিচক্রের নক্ষত্র বলিয়া হিন্দু জ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারেই স্থির তারা বলিয়া বুঝেন, [illegible] নহে। সচক্র (?) রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগকে তাঁহারা এক [illegible] নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যায়, তাহারাও [illegible]মে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে স্থির তারা বলিয়া যে তাঁহারা স্বীকার করেন, এরূপ বলা যায় না।" বোধ করি, নিখিল বাবু নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থ [illegible] দেখিয়া, তারা শব্দেরও দুইটি অর্থ করিয়া থাকিবেন।

মঘা তারা চিরকালই স্থির নক্ষত্র, এবং মঘা নক্ষত্রও বহুকাল পর্য্যন্ত বা চিরকালই স্থির নক্ষত্র। সপ্তর্ষির গতি বলিয়া প্রাচীনেরা বর্ষ সংখ্যা করিতেন। এতদ্‌বিষয় পরে বক্তব্য।

(৪) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন (৫৪০পৃঃ) সুতরাং সে সময়ে [পূর্ব্বকালে] যে দিন সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন হইত, সেই দিনকেই তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা] উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি বলিতেন।" প্রমাণ? "পূর্ব্বকালে দৃগ্‌গণিত প্রচলিত ছিল, এবং অয়নচলনও যে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঠিক।" 'পূর্ব্বকালে' বলিতে অবশ্য মহাভারতাদি গ্রন্থের রচনাসময়ে। সে সময়ে অয়নচলন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাই না। এমন কি, বরাহের সময়েও ৪২৭ শকে অয়নচলন এ দেশে অজ্ঞাত ছিল। তাই তিনি অয়নচলন প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। "নিরয়নের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা?] উত্তরায়ণকে ৬০ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপ পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়নচলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না।" দুইটি উক্তিরই প্রমাণ আবশ্যক। শেষের উক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অয়নচলন দেখিয়া ঠিক সময় অবগত হইতে পারা যায় না বটে, কিন্তু নির্ণেয় সময়ের পূর্ব্বাপর সীমা পাওয়া যাইতে পারে। তাহাও অন্য কারণে। সায়ন গণনা চলিত ছিল না বলিয়াই পাওয়া যায়, নিরয়ণ গণনা চলিত থাকিলে পাওয়া দুর্ঘট হইত।

নিখিল বাবু আরও অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাদের সম্বন্ধে প্রমাণ দিলে সুখী হইতাম। যথা, আর্য্যভট্ট ও পরাশরের [illegible] ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হয় (৯১৮ পৃঃ) কল্যব্দই যুধিষ্ঠির[illegible]ক (?) (৯২০ পৃঃ); রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয় (৬২১ পৃঃ) ইত্যাদি। অন্য দুই একটি সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। প্রথমে [illegible] মহাভারত-বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি আদৌ ছিলেন কি না, তাহাতেই মতভেদ [illegible] যদি বা ছিলেন, মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের যে ইতিহাস মহা[illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে বহু বিঘ্ন আ[illegible]বন্ধে মহা-

ভারতকে ভারত যুদ্ধের ইতিহাস বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইবে, এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ত্যাগ করিয়া কেবল তথাকথিত জ্যোতিষিক প্রমাণ বিচার করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, মহাভারতরচনার কালনিরূপণ এক কথা, এবং ভারতযুদ্ধের কালনিরূপণ আর এক কথা। এটুকু স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ কেহ মহাভারতরচনার কাল এবং ভারতযুদ্ধকাল এক মনে করিয়া থাকেন। কোন্ অতীত কালে বেদব্যাস মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। পরে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তবে, মহাভারতের যে আকার আমরা দেখিতেছি, তাহার উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাভারতে লিখিত জৈন ম্লেচ্ছাদির নাম দেখিলেই এ কথা প্রমাণিত হইবে।

মহাভারতগ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও, ঐতিহাসিক যুধিষ্ঠিরাদি আধুনিক নহেন। এই উক্তির পক্ষে অনেকগুলি প্রমাণ আছে। তাহাদের আলোচনায় দেখা যাইবে, ভারতযুদ্ধের দুই প্রকার কাল পাওয়া যায় (১) খৃঃ পূঃ ১২।১৩শ শতাব্দী, এবং (২) ২২।২৩শ শতাব্দী। এই দুই সময়ের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। শেষোক্ত সময়ই কতকটা ঠিক বলিয়া বোধ হয়। * (১) মহাভারতে লিখিত প্রমাণ। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম বলিতেছেন,

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥

এই শ্লোকের 'সৌম্য' পদটি বর্দ্ধমান মহারাজার মহাভারতে আছে, এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে তৎপরিবর্ত্তে 'পুণ্যঃ' পাঠ আছে। যে পাঠই হউক, শ্লোকটির অর্থ সম্বন্ধে কোন গোল নাই। যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা নীলকণ্ঠের টীকায় তিরোহিত হইয়াছে। রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু না হইয়া যাহাতে উত্তরায়ণে হয়, এই নিমিত্ত ভীষ্ম কিছু দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে দেখিলেন, চান্দ্র (বা পবিত্র) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে, এবং সেই মাসের প্রথম ভাগও গত হইয়াছে। অর্থাৎ দেখিলেন, মাঘ শুক্লাষ্টমী আগত, এবং রবির উত্তরায়ণও আরম্ভ হইয়াছে।

* 'নব্যভারতে' ঐ দুই সময়ের মধ্য লইয়া যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ১৬শ শতাব্দী ব[illegible]

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম দেহ ত্যাগ করেন। এই নিমিত্ত উক্ত অষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। যথা রাজমার্ত্তণ্ডে,

শুক্লাষ্টম্যাং তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে॥

রঘুনন্দনধৃত ভবিষ্যোত্তরে,

শুক্লাষ্টম্যাস্তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

বঙ্কিমবাবু চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস কল্পনা করিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। পরন্তু পূর্ব্বকালে দৈনিক কালগণনায় চান্দ্রমাসই প্রচলিত ছিল। আমাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তে চান্দ্রকাল হইতে সৌরকাল গণনার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি তিথি দ্বারা দিন গণিত হইয়া থাকে। মহাভারতরচনার সময়ে চান্দ্রমাসগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এখানে এ বিষয়ের একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দেখা যায়, কৌরবেরা অর্জ্জুনকে দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, হয় ত প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তখন ভীষ্ম এইরূপে ত্রয়োদশবর্ষ গণনা করিলেন,

পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তঃ॥
এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ॥

অর্থাৎ, প্রতি পাঁচ বর্ষে দুই মাস অধিক হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বর্ষে পাঁচ মাস বার রাত্রি (বা দিন) অধিক হইয়াছে।

উক্ত গণনাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে। পাঁচ বৎসরে (সৌর) ১২×৫=৬০ সৌরমাস, এবং ২ অধিমাস হয়। ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিন অধিক হয়। তবেই, ১৩ সৌর বৎসর গণনা করিতে ১৫৬×৫=১৬১ চান্দ্রমাস ও ১২ দিন (তিথি) গণিতে হইয়াছিল।

অবান্তর হইলেও, এই গণনার সহিত আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। দেখা যায়, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ও পৈতামহ সিদ্ধান্তে বর্ষগণনায় ঠিক ঐ প্রকার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। পৌষ অমাবস্যার দিন রবি দক্ষিণায়ন ত্যাগ করিয়া উত্তরাগতি আরম্ভ করিতেন। এই নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে মাঘ শুক্লপক্ষ চিরদিন প্রশস্ত ছিল। শুক্লপক্ষের মধ্যে উত্তরার্দ্ধ প্রশস্ত, তখনই চন্দ্রের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপরঞ্চ, কৃষ্ণাষ্টমীর পর শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং অন্যত্র পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দেখা যায়,

মাঘশুক্লপ্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ। যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

অতএব উক্ত বেদাঙ্গের সময়ে পৌষ অমাবস্যায় (মাঘী শুক্ল প্রতিপৎ) হইতে বর্ষ গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণারম্ভসময়ই বর্ষের আদি ছিল।

যাহা হউক, পৌষ অমাবস্যার ১৪ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমার দিন চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে থাকেন, এবং তথা হইতে চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে—শতভিষায়—রবি থাকেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন রবি শতভিষায়, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় ধনিষ্ঠায় থাকেন। ধনিষ্ঠায় রবির উত্তরায়ণ হওয়াতে ভরণীর শেষ পদে বিষুবস্ এবং অশ্লেষার অর্দ্ধে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত।

এই সমস্তই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুযায়ী। বস্তুতঃ, মহাভারতে ভীষ্মের দেহ-ত্যাগের যে কাল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে বেদাঙ্গজ্যোতিষ পঞ্জিকার মত। অতএব বোধ হইতেছে, মহাভারত-রচনার সময়ে উক্ত প্রাচীন পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল, এবং তদনুসারে কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। উক্ত জ্যোতিষ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বহুকাল পরেও তাহার গণনাক্রম চলিত ছিল। এ নিমিত্ত উহার সময় হইতে মহাভারত-রচনার সময় অবগত হইতে পারা যায় না। তবে বলিতে পারা যায়, অত বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত ছিল না। অয়ন চলন অবলম্বন করিয়া এই কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। অয়নের বেগ নিশ্চিতরূপে জানা নাই। কাজেই এই সময় খৃঃ পূঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পারে।

(২) পুরাণ ও ইতিহাসের প্রমাণ। যে যাহা হউক, এই সময়ের সহিত পুরাণোক্ত যুধিষ্ঠির-কালের ঐক্য আছে।

বিষ্ণুপুরাণমতে পরিক্ষিতের সময় হইতে নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর; নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল; তার পর মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে রাজা হন। অতএব ১০১৫ + ১০০ + ৩১৫ = ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ের সহিত পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ-নির্দ্ধারিত কালেরও সমতা আছে। অন্য প্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা খৃঃ পূঃ ১২শ হইতে ১৪শ শতাব্দী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হইতে নিখিল বাবু পৌষের 'সাহিত্যে' এই সকল প্রমাণ বলিয়াছেন। এখানে পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

(৩) সংহিতার প্রমাণ। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে সপ্তর্ষিচার লিখিয়াছেন। যথা,

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥ *
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুদয়তোঽপ্যবিবরাদৃজূন্নয়তি তত্র সংযুক্তাঃ॥

অর্থাৎ, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বীশাসনকালে মঘানক্ষত্রে ছিলেন। শকারম্ভের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যকাল। সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ বিচরণ করেন। পূর্ব্বদিকে সমুদয় নক্ষত্রের নিরন্তর উদয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নক্ষত্রের উদয় হইলে সপ্তর্ষিপংক্তির স্পষ্ট প্রকাশ হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, পরিক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে দুইটি (পুলহ ও ক্রতু) প্রথমে উদিত হন, তাঁহাদের সমদক্ষিণোত্তর রেখায় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের যেটি দৃশ্য হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়। * ইঁহারা এক এক নক্ষত্রে শত মানুষ বর্ষ থাকেন।

বৃদ্ধ গর্গ লিখিয়াছেন, (উৎপল)

কলিদ্বাপরসন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্। মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ॥

অর্থাৎ, কলি ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমুনি থাকিতেন।

কশ্যপ লিখিয়াছেন, (উৎপল)

শতং শতং তু বর্ষাণামেকৈকস্মিন্ মহর্ষয়ঃ। নক্ষত্রে নিবসন্ত্যেতে সসাধ্বীকা মহাতপাঃ॥

অর্থাৎ, সারুন্ধতীক মহর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শত বৎসর নিবসতি করেন।

এইরূপ আরও অনেক বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল বচনে দেখা যায়, (১) দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি ছিলেন, (২) মঘানক্ষত্রে থাকিবার সময় যুধিষ্ঠির ও পরিক্ষিৎ ছিলেন, (৩) শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ছিলেন, (৪) সপ্তর্ষির একটি পূর্ব্ব গতি আছে,* বৎসরে ৮ কলা। কিম্বদন্তী আছে, এবং কিম্বদন্তীর মূলে লিখিত প্রমাণ আছে যে, দ্বাপরের শেষে এবং কলির প্রারম্ভে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। শকের ৩১৭৯ বৎসর, এবং খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কলির আরম্ভ। সুতরাং সেই সময়ে ভারত যুদ্ধ হয়। বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে বরাহ বলেন, শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে। গর্গসংহিতার অভাবে বলা যায় না, এই গণনা গর্গ নিজে করিয়াছিলেন, কি

---

* পুরাণকারের বাস ২৭। ৪২ অক্ষাংশাদির দক্ষিণে না হইলে তিনি ক্রতুর উদয়াস্ত দেখিতে পাইতেন না। মথুরায় অক্ষাংশ ২৭। ৩০; সম্ভবতঃ তাঁহার বাস মগধদেশে ছিল।

বরাহ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে, গর্গ শকারম্ভের অনেক পূর্ব্বে ছিলেন; সুতরাং বোধ হয়, তিনি ২৫২৬ বৎসর বলেন নাই। উৎপলোদ্ধৃত গর্গ-বচন হইতেও জানা যায়, গর্গ মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতি মাত্র বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতে বরাহ স্বয়ং বৎসরগণনা করিয়া যুধিষ্ঠির নৃপতির কাল শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৎসর-সংখ্যার নির্দ্দেশ দেখিলেই বোধ হয় যে, উহার মধ্যে জ্যোতিষগণনা ছিল। এতদ্বিষয় পরে বক্তব্য।

কাশ্মীর দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে ভারত-যুদ্ধকাল বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতযুদ্ধ ঠিক দ্বাপরান্তে হয় নাই, কলির ৭৫৩ বৎসর পরে হইয়াছিল। কলির যে সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন, সেই সময়ে কাশ্মীরে গোনন্দ রাজা ছিলেন। এই গোনন্দ (তৃতীয়) আরম্ভ করিয়া ২৩৩০ বৎসর গিয়াছে, এবং ১২৬৬ বৎসরে ৫২ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শকের ১০৭০ অব্দে কহ্লণ এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন। তবেই ঐ অব্দের পূর্ব্বে ২৩৩০ × ১২৬৬ = ৩৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের গোনন্দ ভারত-যুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। শক ১০৭০ অব্দ = কলির ৪২৪৯ বৎসর। ৪২৪৯ হইতে ৩৫৯৬ হীন করিলে ৭৫৩ বৎসর থাকে। কাজেই কহ্লণের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির ছিলেন।

এই প্রকার বর্ষ সংখ্যা করিতে দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যেন, কহ্লণ কাশ্মীরের কোন প্রাচীন ইতিহাস দেখিয়া গত রাজগণের আধিপত্যকাল গণনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন শকের একাদশ শতাব্দীতে, অথচ তাঁহার পূর্ব্বের তিন চারি সহস্র বৎসরের রাজগণের আধিপত্যকাল নিঃসন্দেহে বলিতেছেন! এমন কি, বলিতেছেন, কলির ঠিক ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন!

এই সকল স্মরণ করিলেই মনে হয়, তাঁহার প্রমাণ গত রাজগণের আনু-পূর্ব্বিক আধিপত্যকাল সংখ্যা নহে। তাঁহার কি প্রমাণ ছিল, তাহাও তিনি পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

> লৌকিকাব্দং শতেনাব্দৈর্ব্বাৎস্য চিত্রশিখণ্ডিষু।
> তচ্চারে সংহিতাকারৈরেবং দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ। ৫৫
> আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
> ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য। ৫৬

তাঁহার প্রমাণ [illegible] সংহিতা। শেষের শ্লোকটি অবিকল বারাহী সংহিতার। বলা বাহুল্য, তাঁহার পূর্ব্বে সংহিতার উৎপত্তি হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে, সংহিতার উক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। অবশ্য যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কল্যব্দ এক নহে, কিংবা যুধিষ্ঠিরাব্দ অপ্রচলিত হইলেই শকাব্দ প্রচলিত হয় নাই। আর্য্যভটের সময়ে শকাব্দ তত প্রচলিত হয় নাই, তাই তিনি নিজ সময় কল্যব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকের দশম শতাব্দীতে—কহ্লণের পূর্ব্বে আল্‌বেরুণী কাশ্মীরের [illegible] পঞ্জিকায় তৎকালের যুধিষ্ঠিরাব্দ লিখিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাশ্মীরে এই অব্দ গণিত হয় কি না, বলিতে পারি না। মনে হইতেছে যেন, দাক্ষিণাত্যের কোন পঞ্জিকায় এই অব্দানুসারে গত বর্ষ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি। *

বোধ করি, এই প্রসিদ্ধিবশতঃ রত্নমালায় শ্রীপতি নক্ষত্রবিশেষে সপ্তর্ষির স্থিতি অনুসারে দেবতাবিশেষের প্রতিষ্ঠার বিধি দিয়াছেন। রত্নমালায় দেখা যায়, শকারম্ভে সপ্তর্ষি পুষ্যানক্ষত্রে ছিলেন। কেন না, ২৫২৬ বৎসরে সপ্তর্ষি মঘা হইতে পুনর্ব্বসু শেষ করিয়া পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, মঘা নক্ষত্র এই গণনার আদি; এবং যখন সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন, তদবধি কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তাহা সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া, কোন্ নক্ষত্রে সপ্তর্ষি আছেন, তদ্বারা প্রাচীনেরা গত কাল জ্ঞাপন করিতেন। পুরাণেও এই গণনাক্রম লিখিত আছে। কোন প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব বোধ হইতেছে, জ্যোতিষ-সংহিতা ও পুরাণের রচনাসময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দগণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রকৃত-সিদ্ধান্ত-রচনার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল।

---

* এই অব্দগণনক্রম বুঝা সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ বৎসরের (শক ১৮২০) যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা করা যাউক। শকাব্দ সংখ্যার সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়। অতএব ১৮২০ শক = ৪৩৪৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর থাকেন, এবং যুধিষ্ঠিরাব্দের প্রথমে তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অতএব তদবধি সপ্তর্ষি ৪৩ নক্ষত্র পার হইয়া ৪৪শ নক্ষত্রের ভোগ্য ১০০ বৎসরের মধ্যে ৪৬ বৎসর গত হইয়াছে। মঘা হইতে আরম্ভ অনুলোমক্রমে ২৭ নক্ষত্র উক্ত অঙ্ক ৪৩ হইতে হীন করিলে ১৬ অবশেষ থাকে। মঘা হইতে গণিয়া গেলে ১৭শ নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুনী হয়। অতএব, এ বৎসর উত্তরফল্গুনীতে সপ্তর্ষির ৪৬ বর্ষ স্থিতি [illegible] হইয়াছে।

তারতযুদ্ধকাল-নিরূপণ পক্ষে প্রায় সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করা গেল। দেখা গেল, উহার দুইটি সময় পাওয়া যায়, এবং সেই দুইটি সময়ের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসর অন্তর আছে। অবশ্য দুই সময়ই কদাপি সত্য হইতে পারে না। অন্ততঃ একটিতে নিশ্চয়ই ভুল আছে। এই ভুলের উৎপত্তি কি, সপ্তর্ষির গতির অর্থ কি, এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

অবশ্য বিষয়টি গুরুতর। প্রাচীনকালের গণনার দোষ ধরাও যেমন কঠিন,বলাও তেমনই কঠিন। এ স্থলে আমাদের অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যাইবে না। সপ্তর্ষির গতি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল। শত বৎসরে এক নক্ষত্র গতি; সুতরাং শকারম্ভের পূর্ব্বে সপ্তর্ষি ২৫.২৬ নক্ষত্র পার হইয়াছিলেন। মঘা হইতে অনুলোমক্রমে গণিয়া আসিলে শকমুখে সপ্তর্ষি পুষ্যাতে ছিলেন। শ্রীপতিও তাহাই বলিয়াছেন।

এ দিকে দেখা যায়, মঘা হইতে অয়ন ২৭—২৫.২৬=১.৭৪ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বকালের জ্যোতিষীরা অয়নচল জানিতেন না। কিন্তু অয়নবেগ তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় অজ্ঞাত ছিল না। বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, পূর্ব্বকালে মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। শকারম্ভসময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ মঘা হইতে ১.৭৩ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা অয়নের বিলোমগতি দেখিয়া নিশ্চিত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বিস্ময়প্রকাশের নিদর্শন আছে। এই বিলোমগতি না জানাতেই, বোধ করি, তাঁহারা ভাবিলেন, মঘা নক্ষত্র হইতে অনুলোম গতিতে উত্তরায়ণ পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে অয়নের চলন বলা গেল। কিন্তু অয়নের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ কি? পরে বলা গিয়াছে, কোন অতীত কালে মঘাতে উত্তরায়ণ শেষ হইত, এবং মঘা নক্ষত্রের সহিত সপ্তর্ষির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল ও এখনও আছে। সপ্তর্ষি, মঘা ও রবির উত্তরায়ণনিবৃত্তি,—তিনটিই পরস্পর সংযুক্ত ছিল। যে ধ্রুবসূত্র সপ্তর্ষি ও মঘাকে ভেদ করে, সেই ধ্রুবসূত্রই অয়নান্ত (solstitial colure) ছিল। অয়নান্ত সূত্রের চলন অজ্ঞাত, কিন্তু সপ্তর্ষি ও মঘা-গত সূত্র ঠিক একই থাকে না। অক্ষাংশভেদে সপ্তর্ষি ও মঘার উদয়াস্তের তারতম্য হয়, মঘা নামক তারা থাকিলেও মঘা নামক নক্ষত্র আছে। সপ্তর্ষির

[illegible] দ্বারা এক্ষুই ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত রহে। পরন্তু মরীচি হইতে [illegible] পর্য্যন্ত প্রত্যেকই মঘা নক্ষত্রের অংশাদেবের সহিত যুক্ত বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, সপ্তর্ষি মঘাতে অবস্থিত, উত্তরায়ণও মঘাতে অবস্থিত। ইহা হইতে সপ্তর্ষিরেখা ও অয়নান্ত সূত্র কালক্রমে একার্থবাচক হইবার সম্ভাবনা ছিল। অন্ততঃ একভিন্ন অন্য কোন অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না। শাস্ত্রেও কোন অনুমান বা বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই।

অয়নান্ত সূত্র অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বা সপ্তর্ষিমণ্ডল * অঙ্গীকার করিয়া দুই একটি বিষয়ের উপপত্তি দেখা যাউক। উপরে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে মঘাতে উত্তরায়ণ হইত, শকমুখে ১.৩৩ নক্ষত্র পশ্চিমে হইত। প্রতি নক্ষত্র অয়ন পিছাইতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। সুতরাং ১.৩৩ নক্ষত্র পিছাইতে ১২৬৭ বৎসর লাগিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের সময়ে উত্তরায়ণ বা সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে ছিল। তবেই যুধিষ্ঠির শকের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ছিলেন।

আমাদের উক্ত অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বরাহ স্বসময়ে—৪২৭ শকে—উত্তরায়ণনিবৃত্তি পুনর্ব্বসুর তৃতীয় পদে দেখিয়াছিলেন। শকমুখে পুষ্যার ০.২৫ নক্ষত্র বাকি ছিল, এবং ৪২৭ শকে পুনর্ব্বসুর ০.২৫ গত হইয়াছিল। উভয়ে মিলিয়া অর্দ্ধ নক্ষত্রের অন্তর ঘটিয়াছিল। অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছাইতে ৪২৭ বৎসর অপেক্ষা কিছু অধিক হইলেও আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীয় গণনানুসারে প্রায় ঠিক। কেন না, এতদনুসারে প্রতি নক্ষত্র পিছাইতে ৮৫২ বৎসর, এবং বার্ষিক অয়নবেগ ৫৬৩ বিকলা পড়িতেছে। এই বেগ আমাদের প্রাচীন জ্যোতিবিগণের প্রদত্ত বেগের তুল্য। †

কিন্তু আরও কথা আছে। এতদ্দ্বারা ২৫২৬ বৎসরের উপপত্তি পাওয়া গেল না। এক্ষণে এই গণনার মূল অনুসন্ধান করা যাউক। ইহার মূল নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থের মধ্যে একটির পরিবর্ত্তে অন্যটি গ্রহণ। উপরে মঘা নক্ষত্র অর্থে ক্রান্তিবৃত্তের দশম ৮০০ কলা পরিমিত প্রদেশ লওয়া গিয়াছে। কিন্তু মঘা নক্ষত্র বলিলে মঘা তারাও বুঝায়। মঘা তারা মঘা নক্ষত্রের আদিতে

---

* মণ্ডল শব্দটি জ্যোতিষে বৃত্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল বুঝিতে সপ্তর্ষি সমূহ হইতে পারে। কিন্তু রবিমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি জ্যোতিষসম্বন্ধে জ্যোতিষে [illegible] বুঝিয়া থাকি। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পরিবর্ত্তে কেবল সপ্তর্ষির প্রয়োগ হওয়া বিচিত্র নহে।

† এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। বৎসম্পাদিত [illegible] ইত্যাদি পুস্তকে যথেষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

অনস্থির নহে। আমাদের অনুমানে যে সময়ে মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন হইত, সেই অতীতকালে, নক্ষত্র শব্দের ক্রান্তি অর্থ প্রচলিত ছিল না। নক্ষত্র শব্দ দ্বারা নক্ষত্রচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা, জ্যোতিষচর্চ্চার প্রথমাবস্থায় সম্ভাব্য ছিল না। তৎকালে মঘা তারা ও মঘা নক্ষত্র একার্থ-বাচক ছিল। বেদেও ব্রাহ্মণের ঋষিগণ মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণের মধ্যে কেহ বা উহাতে মঘা তারা বুঝিলেন, কেহ বা মঘা নক্ষত্র বুঝিলেন।

মঘা নক্ষত্র বুঝিলে যে সময় পাওয়া যায়, তাহা উপরে বলা গিয়াছে। মঘা তারার অয়ননিবৃত্তি ধরিলে কোন সময়ে আসা যায়, এখন তাহাই বিবেচ্য। দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ২৩০০ বৎসরে মঘা তারার অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। শকাব্দ ধরিলে ঐ সময় ৭৮ বৎসর অধিক হয়। বর্ত্তমান জ্ঞাত অয়নবেগ-সাহায্যে অত দীর্ঘকাল নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা দুরূহ। এতদ্ভিন্ন, উক্ত কালগণনা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের অয়নবেগ অনুসারে করা গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা সেই বেগ গ্রহণ করেন নাই। কত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে দুই এক শত বৎসরের প্রভেদ ধর্ত্তব্য নহে।

আর দুই একটি কথা বলিয়া এই নীরস তত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে। জ্যোতিষসংহিতা মতে ২৫২৬ শকপূর্ব্বে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অর্থাৎ, খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। মঘা তারায় রবির অয়ন পরিবর্ত্তন হইলে আধুনিক গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দ পাওয়া যায়। আমাদের জ্যোতিষানুসারে এই গণনা করিতে হইলে মঘা তারার ধ্রুবক আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদির ধ্রুবক লইলে চলিবে না। প্রাচীনকালে প্রদত্ত ধ্রুবকের মধ্যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার বরাহ কয়েকটি তারার ধ্রুবক দিয়াছেন। তন্মধ্যে মঘার ধ্রুবক ১২৬ অংশ দেখা যায়। মঘা তারাটি উজ্জ্বল এবং ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। সুতরাং ১২৬ অংশই মঘার তাৎকালিক ভগাংশ (True longitude) ছিল। উহা হইতে ৯০ অংশ হীন করিলে ৩৬ অংশ থাকে, এবং ইহাই পূর্ব্ব-কথিত সময়াবধি অয়নাংশ। ৭০ বৎসরে অয়ন ১ অংশ সরিয়া থাকে। এতদনুসারে আমরা শকের ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িতেছি। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মঘার উক্ত ধ্রুবক শকের প্রথম শতাব্দীতে পরিমিত হইয়াছিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গর্গ বলেন, কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, এবং খৃঃ পূঃ ৩১৭৯ অব্দে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ইহার সহিত উপরের লিখিত সময়ের ঐক্য হইতেছে না। এই প্রভেদের কারণ নিশ্চয় করা দুরূহ। তবে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপ্তর্ষি একটি তারা নহে; উহার সাতটি তারা এক ধ্রুবসূত্রেও অবস্থিত নহে। এখন এই বিষয় আলোচনা করা যাউক।

কেহ (শাকল্য) বলেন, ক্রতু দিয়া ধ্রুবসূত্র টানিতে হইবে। ক্রতু তারাটি সপ্তর্ষির সাতটি তারার পশ্চিম। গণনা করিলে দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অয়নান্ত সূত্র ক্রতু দিয়া গমন করিত। এই সময় ইতঃপূর্বে আমরা অন্য উপায়েও পাইয়াছি।

বরাহ বলেন, মরীচি দিয়া ঐ সূত্র টানিতে হইবে। তিনি বা গর্গ এ কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই বটে, কিন্তু মরীচির উদয় না হইলে অন্য ছয়টি তারার প্রকাশ হয় না, কেন না, মরীচি সপ্তর্ষির সর্ব্বপূর্ব্ব ভাগে। যাহা হউক, দেখা যায়, খৃঃ পূঃ চত্বারিংশৎ শতাব্দীতে অয়নান্তসূত্র মরীচি দিয়া গমন করিত।

অধিকাংশের মতে, পুলহ ও ক্রতু দিয়া উক্ত রেখা টানিতে হইবে। পুলহ ও ক্রতু ঠিক এক ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত নহে। সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া টানিতে হইবে। এরূপ করিলে খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ সূত্রটি অয়নান্ত সূত্র ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহের মতও এই। [ত]িনি লিখিয়াছেন,

ধ্রুবসূত্রেণ যন্মধ্যৌ তদূর্ধ্বঞ্চ মঘাদ্যয়। কথ্যন্তে সাম্প্রতং সিংহে ভুক্তাংশৈ[ঃ] শাস্ত্র[ি]ণো [দ]ি[ত]ৌ।

[ই]হাঁর মতে সিংহ রাশির ২১ অংশে পুলহ ক্রতুর মধ্য ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত। [ই]হার সময়ে ৪২৭ শকে কর্কটের আদিতে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। সিংহ [২]১ অংশ হইতে কর্কটের আদিতে অয়ন পিছাইতে ৫১ অংশে ৫১ × [৭০ =] ৩৫৭০ বৎসর গিয়াছিল। উহা হইতে ৪২৭ হীন করিলে ৩১৫৩ থাকে। [প্রা]য় এই সময়ে কলির আরম্ভ হইয়াছিল। * যাঁহারা বলেন, দ্বাপর কলির সন্ধিসময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তাঁহাদের গণনার মূল এই। কিন্তু শাকল্য লিখিয়াছেন,

যুগাদৌ বিষ্ণুতারায়াং [ক্রতু]র্ভাদৌ ব্যবস্থিতঃ।

---

* এখানে সূক্ষ্মকর্ম্মসংস্কার করা আবশ্যক। স্থূলগণনার প্রয়োজন বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

যুগাদিতে শ্রবণার আদিতে ক্রতু ছিলেন। মঘা হইতে শ্রবণার অন্তর ১২ নক্ষত্র। শাকল্যমতেও সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক নক্ষত্র। এইরূপে ১২০০ বর্ষ মাত্র পাওয়া যায়। তার পর, যুগাদি অর্থে কলিযুগাদি ধরিতে হইবে। শ্রবণাদি-গত সূত্র মঘা দিয়া যায় না, পুষ্যার অর্দ্ধাংশ দিয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, শকারম্ভে পুষ্যার প্রথম পাদে সপ্তর্ষি ছিলেন। সুতরাং যুগাদিতেও সেইখানে সপ্তর্ষিরেখা থাকিতে পারে না। অতএব মনে করিতে হইবে, শকারম্ভের পূর্ব্বেই সপ্তর্ষিরেখা ২৭ নক্ষত্র একবার ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে ২৭০০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহার সহিত যুগারম্ভকালের কতকটা ঐক্য আছে। অন্য পক্ষে, যুগাদিতে শ্রবণায় শকারম্ভে পুষ্যায় সপ্তর্ষি-রেখা থাকিলে উভয় সময়ের মধ্যে প্রায় ১৩০০ বৎসরের অন্তর ঘটে।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন-রূপে সপ্তর্ষির অবস্থিতি গণনা করিতেন; সুতরাং কোন্ মত গ্রাহ্য, কোন্ মত অগ্রাহ্য, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে সপ্তর্ষিগত সূত্র দ্বারা গণিত সাহায্যে সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনাবিশেষ। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সপ্তর্ষিগত সূত্র অর্থে অয়নান্ত সূত্র ধরিলে অনেক উক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে আমাদের বিশ্বাস যে, সপ্তর্ষির গতি দ্বারা প্রাচীনেরা অয়নের গতি স্থূলতঃ ব্যক্ত করিতেন। কালক্রমে ঐ অর্থ পরিবর্ত্তী কে[illegible] জ্যোতিষী ও পুরাণকার বিস্মৃত হইয়া অর্থান্তর ঘটাইয়াছিলেন। স[illegible] চিরদিনই সত্য; অর্থান্তরবশতই সত্য অনেক স্থলে কাল্পনিক[illegible]

তবে, সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারার সহিত নক্ষত্রবিশেষে[illegible] এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির শত বৎসর স্থিতি দ্বারা কেবল শত[illegible] এই কৃত্রিম অর্থের মূলে অয়নান্ত কালের পরিবর্ত্তন ছিল। কা[illegible] অর্থও কেহ কেহ অন্যরূপ ভাবিয়া বিষয়টি অতিশয় [illegible] তুলিয়াছেন।

কিন্তু সমুদয় অর্থের সঙ্গতির চেষ্টা করিলেও ভারতযুদ্ধকাল [illegible] যায়। খৃঃ পূঃ ১২শ শতাব্দী এবং ২২শ কি ২৩শ শতাব্দী। ইহার [illegible] ঠিক? আমাদের অনুমানে, যদি ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, [illegible] সময়েই হইয়াছিল। সেই সময়ে, যে সময়ে বেদের কতি[illegible] হইয়াছিল, বেদের না হইলেও যে সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল;

যে সময়ে মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত এবং কৃত্তিকায় বিষুব থাকিত। মঘা নক্ষত্রের কৃত্রিম অর্থ ধরিলে ভারতযুদ্ধকাল ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ-রচনার কাল খৃঃ পূঃ ১২শ বা ১৩শ শতাব্দী হয়, স্বাভাবিক অর্থ ধরিলে খৃঃ পূঃ ২২শ বা ২৩শ শতাব্দী হয়।

আমাদের বিবেচনায় অত পুরাকালে নক্ষত্র শব্দের কৃত্রিম অর্থ ছিল না। তাই শেষোক্ত সময় সত্য বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ গণনায় দুই এক শত বর্ষের তারতম্য ধর্ত্তব্য নহে।

বস্তুতঃ মহাভারতের আদি বৃত্তান্ত বহুপূর্ব্বকালের। এই আদি, শতপথ-ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। রমেশবাবু এ বিষয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া-[illegible]। উক্ত ব্রাহ্মণে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের কেবল উল্লেখ আছে, এমন নহে। উক্ত ব্রাহ্মণরচনার পূর্ব্বে পরিক্ষিৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ ব্রাহ্মণরচনার কালনিরূপণ করিতে পারিলে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতের যাবতীয় প্রাচীন কাল অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা নক্ষত্র শব্দের কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া অতীত কাল সংখ্যা অল্প করিয়া ফেলেন। তথাপি বেবর সাহেবকে বলিতে হইয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতা খৃঃ পূঃ ১৭৮০—১৮[illegible] [illegible]দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ঐ তৈত্তিরীয় সংহিতা-[illegible] প্রথমে নক্ষত্রগণের নাম দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতেই কৃত্তিকা আদি [illegible] উক্ত হইয়াছে।

উক্ত আদি কুরুপাঞ্চালযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের [illegible] বর্ণনা করিয়া[illegible]বন। যেমন বর্ত্তমান কোন কোন বঙ্গ কবির কাব্য হইতে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অন্য আকার দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] [illegible]র কতখানি রাখিয়াছিলেন, কবিকল্পনায় কতখানি সৃষ্টি [illegible] [illegible]া নিশ্চয় করা অতীব দুরূহ। তবে, যে সময়ে মহাভারত [illegible] হইয়াছিল, সে সময়ে নক্ষত্র শব্দের কাল্পনিক অর্থ প্রচলিত [illegible] জানিতেছি যে, বর্ত্তমান মহাভারতোক্ত যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ [illegible] হয় নাই। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই প্রবন্ধের অনেক যুক্তি মৎপ্রণীত এবং সম্প্রতি যন্ত্রস্থ "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। বস্তুতঃ প্রবন্ধটি ঐ পুস্তকের অংশবিশেষ। [illegible] সমুদয় উক্তির প্রমাণ আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে অধিক দিলাম না।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য।

শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ।

বিগত জানুয়ারি মাসের "সুবিচারসমাগম" পত্রে শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোবিন্দ আপ্টে মহাশয় "শিক্ষণপদ্ধতির আদর্শ" ইতি নামধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। লেখক ইতঃপূর্ব্বে আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তিনি প্রাচীন গ্রীকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে প্রাচীন গ্রীকপদ্ধতির পরিণামফল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। আমরা এ স্থলে উহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে বালকদিগের শিক্ষার জন্য পাঠশালাদি ছিল না। পিতাই বালকের পালক, শিক্ষক ও পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। বক্তৃতা ও শৌর্য্য সেকালের গ্রীক-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। যুদ্ধকালে যিনি বক্তৃতা করিয়া সৈনিকদিগকে উৎসাহিত, উত্তেজিত ও বাহুযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহারই প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি হইত। এই কারণে ঐ কালকে আমরা সাধারণতঃ "বীরত্বশিক্ষার যুগ (Heroic age) নামে অভিহিত করিতে পারি। সেই যুগে রাজপুত্রগণ ও সামন্ত সর্দ্দারের পুত্রগণ ভিন্ন অপর সাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইত না। সেনাপতি, বিচারপতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য দেশের শাসনকর্ত্তাকেই করিতে হইত। এই কারণে যাহাতে সদসৎবিচারশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, বুদ্ধিবৈভব, বল, সাহস, তেজস্বিতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিতে পারা যায়, রাজকুমারগণকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। সেকালে রাজাদিগের শক্তি অপরিমিত ছিল, তথাপি তাঁহাদের ব্যবহারে বিলাসাড়ম্বরের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। স্বহস্তে হলচালনা করিতে রাজারা লজ্জা বোধ করিতেন না। রাজপ্রাসাদনির্ম্মাণকালে রাজা মিস্ত্রীর নিকট কর্ম্মনৈপুণ্যজ্ঞাপক হস্তে লইয়া থাকিতেন। রাণীরা ও রাজকুমারীগণ স্বয়ং পাকনিষ্পত্তি, সূত্রকাতন ও বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য করিতেন। হাতুড়ে বৈদ্য, দৈবজ্ঞ ও ভাটগণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইতেন। হোমারের রচিত ইলিয়ড কাব্য হইতে গ্রীসদেশের তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

পরকীয়দিগের সংস্রবে ও পারসীকদিগের সহিত সংঘর্ষকালে গ্রীসদেশে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পারসীকদিগের নিকট গ্রীসীয়েরা উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও বিলাসিতার প্রতি আসক্তি লাভ করে। সুতরাং অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তৎস্থলে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাহিত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার প্রথা গ্রীক সমাজে প্রচলিত হয়। এই সময়ে শিক্ষাপ্রথা সাধারণতঃ যেরূপ ছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

জন্মাবধি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালক পিতা মাতার অধীন থাকিয়া গার্হস্থ্যশিক্ষা লাভ করিত। ৮ম হইতে ১৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যালয়ে থাকিয়া শিখিতে হইত। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসর (কেবল স্পার্টায় ৫ বৎসর) নাগরিকতা-শিক্ষার কাল। ব্যবহারশিক্ষা বা বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে আচরণ করা গ্রীক শিক্ষার শেষ ও এক প্রধান অঙ্গ। স্ত্রীলোকের শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই নামমাত্রসার ছিল। কেবল স্পার্টায় ও ক্রিয়াকাণ্ড স্ত্রীশিক্ষা

বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। এই কারণে উক্ত দুই জাতির মধ্যে অনেক বিদুষী ও কর্মিষ্ঠা রমণী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

স্পার্টাবাসীর শিক্ষাপদ্ধতি এথেনিয়ানদিগের অনুরূপ [illegible] না। স্পার্টানেরা পুরাতন মতবাদী বা রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর [illegible] পরিবর্তন অতি অল্পমাত্র সাধিত হইয়াছিল। শারীরিক বলবৃদ্ধি ও আজ্ঞাবহতা শিক্ষার প্রতি স্পার্টাবাসীর অধিক দৃষ্টি ছিল [illegible] বশ্যতা স্বীকার ও দেশীয় বিধি ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করা তাহাদিগের নিকট ভয়ঙ্কর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। থার্মাপলির পবিত্রক্ষেত্রে লিওনিডাসের সমাধিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ

স্পার্টার শিক্ষানীতি।

"Go, tell Sparta, thou that passest by,
That here, obedient to her laws, we lie"

ইত্যাদি শ্লোকেই স্পার্টানদিগের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্পার্টার শিক্ষাবিভাগের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইত, এবং রাজাই উক্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ ছিলেন। বালক জন্মগ্রহণ করিবামাত্র গৃহস্বামীকে সেই সংবাদ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। রাজপুরুষেরা সূতিকাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সদ্যোজাত শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিতেন। শিশু ক্ষীণ বা বিকলাঙ্গ হইলে তাঁহারা ভৃগুপাতনপ্রণালীক্রমে তাহার বিনাশসাধন করিতেন। যে সকল সুস্থকায় বালক এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইত, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। রাজপুরুষগণের তত্ত্বাবধানতায় ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণ পিত্রালয়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইত। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র বালক মাতৃক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষানিবাসে নীত হইত। শিক্ষানিবাসে প্রত্যেক বালকের শিক্ষার জন্য এক এক জন স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন। যে বালকের প্রতি যাঁহার ভালবাসা জন্মিত, তিনি সেই বালকের শিক্ষা ও [illegible]র ভার প্রাপ্ত হইতেন। যে কোনও সম্ভ্রান্ত বয়ীয়ান্ ব্যক্তি শিক্ষানিবাসে গমন পূর্ব্বক [illegible] ছাত্রগণের আচরণের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন। এবং তাহাদিগের আচরণে [illegible] ও বাধ্যতায় কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলে তাঁহারা শিক্ষকের কৈফি[illegible] করিতে পারিতেন। ব্যায়াম, সঙ্গীত, নৃত্য, সামান্য লিখনপঠন ও মৌখিক মানসাঙ্ক আয়ত্ত করিতে পারিলেই সেকালের বাল্যশিক্ষার চরম হইত। ইহার অধিক আর কিছু শিক্ষা করা রাজবিধিমতে নিষিদ্ধ ছিল। বালকগণ উন্মুক্ত প্রান্তরে, বায়ুবহুল স্থানে সহস্রাধিক দর্শকের সম্মুখে শিক্ষাভ্যাস করিতে বাধ্য হইত। নাগরিকগণ বালকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ গুণ লাভ করিতে উৎসাহিত করিতেন। কখনও কখনও সর্ব্বসমক্ষে প্রতিযোগিতায় পরাজিত বালক লজ্জায় ও মনঃক্ষোভে জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিত। স্পার্টানদিগের শিক্ষানিবাসে ছাত্রগণকে চৌর্য্যবিষয়েও শিক্ষা প্রদত্ত হইত। বালকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহাতে সহজে চুরি ধরিতে পারে, অপরাধিগণ যাহাতে তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপে আত্ম গোপন ক[illegible], সেই উদ্দেশ্যেই চৌর্য্যবিদ্যা স্পার্টান বালকদিগের শিক্ষার বিষয়ের [illegible]ত হইয়াছিল। চৌর্য্যবিদ্যার পরীক্ষায় যে বালক অনুত্তীর্ণ [illegible] তাহাকে ক[illegible] দণ্ড ভোগ করিতে হইত। কথিত আছে, একবার এক বালক এক শৃগালের বাচ্চা চুরি করিয়া উহাকে নিজ বাসস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শিশু বালকের উদরের একাংশ নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করিয়া তাহার [illegible]

বাল্যশিক্ষা।

চৌর্য্য-শিক্ষা।

[illegible] তথাপি ধূর্ত, দণ্ডিত ও সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত হইবার ভয়ে বালক সমস্ত ক্লেশ ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিয়াছিল। বালিকাদিগের [illegible] শিক্ষার জন্যও স্পার্টায় [illegible] বিস্তৃত প্রাঙ্গণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে গিয়া বালিকাগণ দৌড়াদৌড়ি, লম্ফ ঝম্প,

বালিকাবিদ্যালয়।

তাণ্ডব নৃত্য ও মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীতাদি করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। বাল্যকালে উন্মুক্ত স্থানে এইরূপ স্বচ্ছন্দভাবে ব্যায়ামক্রীড়াদি করায় স্পার্টান রমণীগণ দৃঢ়কায়া ও নীরোগপ্রকৃতি হইতেন। বালিকাগণের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ই রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইত।

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে সামরিক বিভাগে প্রেরণ করিতেন। [illegible]মরিক বিভাগ স্পার্টান বালকদিগের "কালেজ" বলিয়া বিবেচিত হইত। তথায় ১২ বৎসর উমেদারী করিয়া ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসঞ্চালন, যুদ্ধ-কৌশল ও শৌর্য্য সাহসের কার্য্য শিক্ষা করিত। তথায় তাহাদিগকে

যৌবনে উচ্চশিক্ষা।

রুক্ষ অন্ন ভোজন, সৈনিকনিবাসে (বারাকে) অবস্থান, তৃণশয্যায় শয়ন ও অঙ্গে লৌহবর্ম্ম [illegible] করিতে হইত। অশ্বারোহণ, অস্ত্রক্রীড়া, সন্তরণ ও মল্লযুদ্ধ তাহাদিগের প্রমোদক্রীড়ার [illegible]নি অঙ্গ ছিল। তাহাদিগের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের এক স্থানে বহুসংখ্যক উলঙ্গ অসি ঊর্দ্ধমুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্থাপিত হইত। ছাত্রগণ তাহার মধ্য দিয়া তাললয় অনুসারে নৃত্য ও লম্ফ [illegible]পূর্ব্বক গমন করিতে শিক্ষা করিত।

[illegible] বর্ষ বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে স্পার্টান যুবকেরা "নাগরিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইত। [illegible]রিক আখ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের বিবাহ করিবার ও কোনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অধিকার থাকিত না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক

প্রৌঢ় দশা।

নাগরিককে দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিবারও কোনও বিধান ছিল [illegible]। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষেরাও সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেন। পতিপত্নীর সাক্ষাৎকার ক্বচিৎ কখনও গোপনে স[illegible]ত। স্পার্টান নাগরিকদিগের জীবনের অধিকাংশ যুদ্ধযাত্রা, মৃগয়া ও সাম্বৎসরিক [illegible] দর্শনার্থ নানা স্থানে পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্যে অতিবাহিত হইত। গৃহে থা[illegible] [illegible]পালনের অবসর তাঁহারা প্রায়ই পাইতেন না। এবং সে বিষয়ে তাঁহাদিগের [illegible]সক্তি বা অনুরাগও লক্ষিত হইত না। বাল্যকাল হইতে [illegible] শিক্ষা লাভ করায় তাঁহারা বাহুবলগর্ব্বে [illegible] হইয়া অপরাপর জাগতিক ব্যাপারসমূহকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন। এই কারণে স্পার্টা প্রদেশে শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি ও উচ্চশিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা প্রায় কখনও হয় নাই।

শিক্ষার পরিণাম।

বলা বাহুল্য, এইরূপ একদেশীয় শিক্ষার দোষেই অল্প দিবসের মধ্যে স্পার্টানদিগের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদিগের বিশ্বাস, [illegible]র রাজপুত জাতির অবনতির কারণও কিয়ৎপরিমাণে স্পার্টানদিগের অনুরূপ ছিল। [illegible]পুতদিগের যেরূপ বাহুবল ছিল, তাঁহারা যদি সেইরূপ শিল্পবাণিজ্য ও রাজনীতিক কৌশলজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহারা ভারতীয় জাতিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতে[illegible]তঃ, কেবল [illegible], বুদ্ধিবল, বা ধর্ম্মবলে, কখনও কোনও জাতির রাষ্ট্রীয় উন্নতি [illegible]। সমাজের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ ও তাহাদিগের [illegible] ঘটিলে, কোনও জাতি প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা লাভ কর[illegible] পারে না। মহারাষ্ট্র সমাজে [illegible] ত্রিবেণী-সঙ্গমের সূত্রপাত হইয়াছিল [illegible] মারাঠাগণ শতাব্দীকালমধ্যে রাষ্ট্রীয় গুণে সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া [illegible]য়াছিলেন।

[illegible]ানদিগের শিক্ষাপ্রণালী শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণলাভের পক্ষে যেরূপ অনুকূল [illegible] রিকোচিত গু[illegible]র লাভের পক্ষে তাহা সেরূপ ছিল না। শিক্ষাপ্রণালীর এই অভাব দূর করিবার জন্য মহাত্মা পিথাগোরস অশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রাজার সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নীতিশিক্ষাকে তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান লক্ষ্য বিষয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মঠে থাকিয়া ছাত্রগণ মৌন, চিত্তশুদ্ধি, বিনয় ও বিবেকের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে, স্পার্টানদিগের ঔদ্ধত্য, শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা ও নীতিশিক্ষার অভাব বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল।

পিথাগোরস।

গ্রীসদেশের দ্বিতীয় বিদ্যাপীঠ এথেন্স নগরে অবস্থিত ছিল। এথেন্সবাসীরা স্পার্টানদের ন্যায় স্থিতিশীল ছিলেন না। তাঁহারা পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং এই উন্নতিশীল লোকদিগের শিক্ষাপ্রণালীও যে স্পার্টানদিগের শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা উন্নত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এথেন্স নগরে বে-সরকারী পাঠশালার অভাব ছিল না। বল[illegible]লাভের সহিত উৎকৃষ্ট নাগরিক গুণসমূহ শিক্ষা করা এথেনীয় শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এথেনীয়েরা কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে সদুপদেশের সাহায্যে বালকগণকে অসৎ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। সপ্তম [illegible] বয়সে বালকগণ সাধারণতঃ পাঠশালায় প্রেরিত হইত। তৎপূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া তাহারা যুদ্ধকাহিনী ও বীররসপ্রধান সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিত। এথেনীয় বিদ্যালয় সমূহ, "সঙ্গীতশালা" ও "ব্যায়ামশালা", এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সপ্তম বর্ষ হইতেই বালকদিগকে উভয় বিভাগে ভর্ত্তি করা হইত। প্রত্যেক পল্লীর বালকেরা প্রাতঃকালে কোনও প্রশস্ত স্থানে সমবেত এবং তথা হইতে সৈনিকদিগের ন্যায় তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া সকলে এক সঙ্গে পাঠশালায় উপস্থিত হইত। তাহাদিগের পুস্তকাদি ও তন্ত্রবাদ্য লইয়া [illegible] এক জন শিক্ষার্থী তাহাদিগের সহিত পাঠশালা পর্য্যন্ত গমন করিত। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বালকগণ বিদ্যালয়ে থাকিত। সেকালেও কোনও কোনও পাঠশালায় একালের মত বালকদিগের বসিবার জন্য [illegible] নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিদ্যালয়ে বালকগণের ব্যবহারের প্রতি শিক্ষকদিগের বিশেষ দৃষ্টি [illegible]। দিবসের প্রথমার্দ্ধ সঙ্গীতশিক্ষায় ও অপরার্দ্ধ ব্যায়ামচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কাব্যাদি সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। হোমার ও হিসীয়ড্ প্রভৃতি বীররসপ্রচুর ও নীতিপূর্ণ কাব্যাদি পাঠ করিয়া বালকগণের চিত্ত সুসংস্কৃত হইত। লক্ষ্মী (সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) সরস্বতী ও ভগবানে এপোলোর সুগঠিত মূর্ত্তি প্রত্যেক পাঠশালায় স্থাপিত ছিল। উন্মুক্ত স্থানে বালকদিগের জন্য ব্যায়ামশালা নির্ম্মিত হইত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দর্শকগণ সুখা[illegible] উপবিষ্ট হইয়া যাহাতে ব্যায়ামক্রীড়া দেখিতে পারেন, প্রত্যেক ব্যায়ামশালায় তাহার ব্য[illegible] ছিল। পণসহকারে ধাবন, উল্লম্ফন, লক্ষ্যবেধ, ভল্লসঞ্চালন ও মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিদ্যায় বালকগণ পারদর্শিতা লাভ করিত। সংবৎসরের মধ্যে তিন মাস (৯০ দিন) বালকদিগের ছুটী থাক[illegible]।

এথেনীয় শিক্ষাপ্রণালী।

বিদ্যালয়ে।

এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কালেজে [illegible] হইত। স্পার্টানদিগের উচ্চশিক্ষা সামরিক শিক্ষামাত্রে পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু এথেনীয়েরা যুবকগণকে যে শিক্ষা প্র[illegible]তেন, সমরকৌশলশিক্ষায় [illegible] রাজনীতিবিষয়ক [illegible]হার একটি প্রধান উদ্দেশ্য [illegible]। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে অশ্বারোহণ, [illegible] নৌবিদ্যা, প্রকাশ্য সভায়

উচ্চশিক্ষা।

বক্তৃতা ব্যায়ামাদি প্রধান, প্রচলিত রাজনীতিক আলোচনায় যোগদান এবং [illegible] গীত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার [illegible]সিক শিক্ষা সেকালে যুবকগণকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এথেন্স নগরে [illegible] ছাত্রগণ শিক্ষানিবাসে বাস করিতে বাধ্য হইত না। শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা "নাগরিক" আখ্যা-লাভের যোগ্য হইত। ঐ আখ্যালাভের জন্য শিক্ষিত এথেন্সীয় যুবককে মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ও কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রথমতঃ সমবেত নাগরিকগণের সভার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। সেই সার্ব্বজনিক সভা হইতে তাহাকে অসিচর্ম্ম প্রদত্ত হইলে, যুবক উহা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবমন্দিরে গিয়া দেবতার সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিত,—"আমি বিশ্বস্ততার সহিত ও ধর্ম্মতঃ নাগরিক কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিব; কখনও কর্ত্তব্যপালনে বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার পর ২। ৩ বৎসর সৈনিকবিভাগে চাকরী করিয়া যুবকগণ সমরকৌশলে অভিজ্ঞতালাভ করিত; তাহার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

নাগরিকতা।

[illegible]ন্সের শিক্ষাপদ্ধতিও বহুদিন অবিকৃত ছিল না। নাগরিকগণের মধ্যে ক্রমে দলাদলি উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষাবিভাগের প্রতি সাধারণের অবধান অল্প হইতে লাগিল। বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত বৈদেশিকদিগের সংসর্গে এথেন্সের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। দেশীয় ও বৈদেশিক প্রণালীর সংমিশ্রণফলে [illegible] সোফিষ্ট নামক এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাহাদিগের আমূল-পরিবর্ত্তনপ্রিয়তায় এথেন্সের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতির উন্মূলন, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বেতনবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যলাভ সোফিষ্টদিগের মূলমন্ত্র ছিল। এই নূতন সংস্কারকদিগের কার্য্যফলে এথেন্সীয়ানদিগের রাষ্ট্রৈক্য (Nationality) বিলুপ্ত হইয়া সমাজে ব্যক্তিবিশিষ্টতা বৃদ্ধি পাইল, সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিতে লাগিল। সোফিষ্টদিগের শিক্ষায় ছাত্রগণের মধ্যে নাস্তিকতার বিস্তার হইল, রাষ্ট্রীয় হিতাকাঙ্ক্ষার স্থলে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইল, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্থান পল্লবগ্রাহিতা দ্বারা অধিকৃত হইল। সোফিষ্টদিগের দ্বারা কেবল এক বিষয়ে গ্রীসদেশ, এমন কি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ উপকৃত হইয়াছে। সোফিষ্টদিগের সময়েই গ্রীসদেশে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানকালের মিশনরিদিগের ন্যায় সেকালের সোফিষ্টেরা পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও সুগ্রথিত ভাষায় যখন দেবদেবীর ও প্রাচীন রীতিনীতির নিন্দা করিত, তখন শত শত গ্রীক যুবক মুগ্ধচিত্তে তাহাদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিত, এবং তাহাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত।

সোফিষ্ট দল।

এই পরিবর্ত্তনের স্রোত ফিরাইবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্‌চিলিস পৌরাণিক নাটকাদি ও অ্যারিষ্টফেনিস বহুসংখ্যক হাস্যরসোৎপাদক নাটক রচনা করিয়া প্রাচীন রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেরিক্লিস প্রাচীন আদর্শে ব্যায়ামবিদ্যালয় ও সঙ্গীতশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এথেন্সীয়ানদিগকে পুনর্ব্বার একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না; সোফিষ্টদিগের বাক্‌জালে মুগ্ধ যুবকেরা প্রাচীনতার প্রতি আর আস্থাবান্ হইল না। কিন্তু [illegible] দেশের সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এই বিপ্লব-কারীদিগের শক্তিহ্রাস হইল। [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়া এথেন্সের অধঃপতন নিবারণ করিলেন। তাঁহার উপদেশে [illegible] সুপথে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সক্রেটিসের [illegible]

প্রতিক্রিয়া।

তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফনও সমাজোন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এরিষ্টটলের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীই পরিশেষে গ্রীক জাতির আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। এই কারণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব।

এরিষ্টটল প্লেটোর নিকট বিংশতি বর্ষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিশাল, তর্কপদ্ধতি অভ্রান্ত ও অবলোকনশক্তি (Observation) অতীব সূক্ষ্ম ছিল। তিনি বলিয়াছেন, বালকের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তাহার জন্মের বহু পূর্ব্বে, এমন কি, তাহার পিতামাতার বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ হয়।

এরিষ্টটলের উপদেশ।

এই কারণে হৃষ্টপুষ্ট ও নীরোগ যুবক যুবতী ভিন্ন অন্য কাহারও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে ক্ষীণকায় ব্যক্তিগণ ও মল্লগণ যাহাতে বিবাহ করিতে না পারে, রাজার সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। সপ্তত্রিংশৎবর্ষীয় পুরুষের সহিত অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যহ দেবদেবীর দর্শনের জন্য মন্দিরে গমন করা কর্ত্তব্য। অপূর্ণ-অবয়ব-বিশিষ্ট বালকগণকে বিনষ্ট করিতে অথবা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। বাল্যকালে বালকদিগকে সুরাপান করাইবার যে প্রথা ছিল, তাহা তিনি রহিত করেন। তিনি অল্প বয়সে বালকগণের শিক্ষারম্ভ করিবার বিরোধী ছিলেন। বালকগণকে চীৎকার করিতে তিনি কখনও নিষেধ করিতেন না। ধাবন উল্লম্ফনাদির ন্যায় চীৎকার করাও তাঁহার মতে বালকগণের পক্ষে পথ্যকর। নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার অভ্যাস, নাটকাদি-দর্শন ও অশ্লীলশব্দোচ্চারণ, বালকগণের পক্ষে অতীব অনিষ্টজনক। সপ্তম বর্ষ হইতে একবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে কাব্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে হাস্যরসোৎপাদক ও দুর্নীতিপূর্ণ নাটকাদি পাঠ করা নিষেধ। শোকরসপ্রধান নাটক অধিক পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। চিত্রলেখনকলা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় ছাত্রগণের অধিক আসক্তি যাহাতে না জন্মে, তৎপ্রতি শিক্ষকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সঙ্গীতের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে আরিষ্টটল সুদীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল ছাত্রেরই সঙ্গীতশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। ব্যায়াম সম্বন্ধেও তিনি মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যুবকগণ যাহাতে প্রাচীন স্পার্টানদিগের ন্যায় দুর্দ্দান্ত না হয়, অথচ তাহারা যাহাতে নীরোগ ও দৃঢকায় নাগরিক হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যাহাতে এক সময়েই বালকদিগকে করিতে না হয়, তাঁহার মতে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন ছন্দঃ, ব্যাকরণ, গণিত, ভূমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত ছিল। তিনি বৃদ্ধগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে ও যুবকগণকে তাঁহাদিগের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই শেষোক্ত উপদেশের প্রতি আমাদিগের দেশের নবীন সন্ন্যাসী ও তরুণ ধর্ম্মোপদেশকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে, গ্রীসীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এরিষ্টটলের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মানসিক উৎকর্ষসাধনের দিকেই তখন শিক্ষাবিভাগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সোফিষ্টদিগের প্রাদুর্ভাবই যে এইরূপ অবস্থান্তরের প্রধান কারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহারা গ্রীসীয়দিগের রাষ্ট্রীয়তা বিনষ্ট করিয়া দেশে যে ব্যক্তিবিশিষ্টতার যুগ আনয়ন করিয়াছিল, সক্রেটীস, প্লেটো ও এরিষ্টটল প্রভৃতির বহু চেষ্টাতেও তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তথাপি এরিষ্টটলের শিক্ষাপদ্ধতি যে সোফিষ্টদিগের উচ্ছৃঙ্খলতায় নিবারণে সম্পূর্ণ

উপসংহার।

হইয়াছিল, ...হ নাই। ইউরোপের আধুনিক শিক্ষাদানপদ্ধতি, এরিষ্টটলের ...তের উপ... ...বে প্রতিষ্ঠিত। রোমকেরা শিক্ষাবিষয়ে গ্রীকপদ্ধতিরই অনুকরণ করিয়াছিলেন... ...র ও রোম রাজ্য বিলুপ্ত হইলে ইউরোপে বাইবেলের আদর্শে শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিও এরিষ্টটলের প্রচারিত তত্ত্বসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সাক্ষিগোপাল।

দক্ষিণ সাগরতীরে উৎকল দেশে ঋষিকুল্য ও বৈতরণী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পুরুষোত্তম একটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া, এই স্থানের নাম পুরুষোত্তম হইয়াছে। জনশ্রুতি আছে, এবং কোন কোন পুস্তকে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার সেই পবিত্র দেহ বৃক্ষমূলে পতিত থাকে; পরে কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক ভগবানের সেই দেহ-অস্থি সংগৃহীত হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অস্থিতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। তৎকালে বিশ্বকর্ম্মার সহিত তাঁহার এইরূপ নিয়ম হয়, যদি কেহ এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণসময়ে দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা নিরস্ত হইবেন। এই নিয়মানুসারে বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিমাদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া যেমন ...াটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। এই সময়ে ...দেবের হস্ত পদ বিনির্ম্মিত না হওয়ায়, সেই মূর্ত্তি তদবস্থায় রহিল। পরে ব্রহ্মার বরে ঐ মূর্ত্তিই জগন্নাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারই উত্তর পশ্চিমে সত্যবাদী গ্রামে সাক্ষিগোপাল অবস্থান করেন। সত্যবাদী ষ্টেশনের পরেই পুরী ষ্টেশন। বেলা ৭ টার সময় সত্যবাদীতে রওনা হইলে বেলা ৪ টার সময় পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া আসা যায়।

প্রশস্ত ইষ্টকমন্দিরে হস্তপদাদিবিশিষ্ট পাষাণমূর্ত্তিকেই সাক্ষিগোপাল কহে। এই সাক্ষিগোপাল সম্বন্ধে ৺কৃষ্ণদাস প্রণীত ভক্তমাল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সংগৃহীত অদ্ভুত ও ভক্তিরসউদ্দীপক একটি গল্প প্রকটিত করাই ... রচনার ...ম উদ্দেশ্য।

বিদ্যানগরে রাধানাথ ও কৃষ্ণদাস নামে ... জন ... বাস করিতেন। ইহারা দুই জনেই শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ... রাধানাথের গৃহে সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন অভাব ছিল না। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পৌত্র কন্যা সমস্তই বর্ত্তমান ছিল।

কৃষ্ণদাসের সংসার ছিল না। একদা রাধানাথ কৃষ্ণদাসের সমভিব্যাহারে শুভ যাত্রা করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই তীর্থ-পর্য্যটনকালে কৃষ্ণদাস আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রাণপণে বয়োজ্যেষ্ঠ রাধানাথের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের ভক্তিসন্দর্শনে এবং সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া এক দিন রাধানাথ বৃন্দাবনে দেবালয়ে গোপালের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাসকে কহিলেন, "কৃষ্ণদাস! আমি তোমার গুণে মুগ্ধ ও সেবায় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার যেরূপ উপকার করিতেছ, তাহাতে আমি যদি তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার না করি, তবে আমার পাপের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আমি স্থির করিয়াছি যে, তোমার হস্তে আমার 'বেলমালা' নাম্নী কন্যারত্নকে সমর্পণ করিয়া তোমার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিব।"

রাধানাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুটে রাধানাথকে কহিলেন, "আপনি এরূপ অসম্ভব কথা কহিতেছেন কেন? আপনি কুলবন্ত হইয়া কি প্রকারে আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিবেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।" রাধানাথ কহিলেন, "আমি কুলাকুল কিছু বুঝি না; যে কর্ম্মে ... হয়, সেই কর্ম্মই উত্তম কর্ম্ম। অকুলীন ব্যক্তিও যদি ধার্ম্মিক হয়, তবে ... পূজনীয়; আর কৃষ্ণভক্তিহীন কুলবন্তও অধমাধম। অতএব তুমি অকুলীন হইলেও কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র। কৃষ্ণদাস, আমি তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আপনি এরূপ কহিতেছেন, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ অন্যরূপ কহিবেন।" তদুত্তরে রাধানাথ কহিলেন, "এরূপ বাক্য আমি কখনো কর্ণে স্থান দিব না, কেন না আমার কন্যা আমি দান করিলে আমার পরিবারস্থ লোকেরা কি করিতে পারে?"

কৃষ্ণদাস কহিলেন, "যদি এই মন্দিরস্থ গোপালের সাক্ষাতে আমাকে ...

[illegible] করিতে আপনি প্রতিশ্রুত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি।"

তখন রাধানাথ বৃন্দাবনধামে মন্দিরস্থ গোপালকে সাক্ষী করিয়া কৃষ্ণদাসকে আপন কন্যাসম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই রাধানাথ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং আপন পরিবারে কৃষ্ণদাসকে কন্যাদানের কথা ও গোপাল সমক্ষে আপন প্রতিজ্ঞার বিষয় সমস্ত বিবৃত করিলেন।

রাধানাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধানাথের স্ত্রী পুত্র ক্রোধে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; এবং অপাত্রে কন্যাদান করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। তাহাদের এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্ত রাধানাথ বড় ব্যথিত হইলেন, এবং সদর্পে কহিলেন, "তোমরা যাহাই বল না কেন, কৃষ্ণদাসের হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবেই হইবে। নচেৎ আমাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে, কারণ আমি তাহার গুণে বশীভূত হইয়া তাহার হস্তেই কন্যা দান করিব বলিয়া বৃন্দাবনে গোপালকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

রাধানাথের স্ত্রী পুত্রও সদর্পে কহিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না, কারণ হীন বংশে কন্যা দান করিলে আমরাও হীন হইব। অতএব আমাদের অপমানের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তুমি এরূপ কাজ করিলে আমরা সকলে বিষপান করিয়া অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাধানাথ বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; শেষে কহিলেন, "তোমরা এরূপ কহিলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তোমরা বিবেচনা করিয়া কথা কহিতেছ না। আমি গোপাল দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার কি হইবে?"

রাধানাথের পুত্র কহিল, "অবশ্য কৃষ্ণদাস কোন নেশায় তোমাকে বশ করিয়াছিল, নচেৎ ঈদৃশ অন্যায় বাক্য তোমার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইল? এখন আমরা বুঝিলাম, কৃষ্ণদাস মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। এবার কৃষ্ণদাস আসিলে বিষম প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিব।"

রাধানাথ কহিল, "আচ্ছা কৃষ্ণদাস যেন প্রবঞ্চক, আমি যে গোপাল দেবতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার কি হইবে? রাধানাথের পুত্র কহিল, তুমি বারবার গোপালের কথা উত্থাপন করিতেছ কেন?

গোপাল ত এক পাষাণমূর্ত্তি বই আর কিছুই নয়। গোপাল কি আসিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিবে? আচ্ছা, তাই যদি হয়, তোমার গোপাল যদি আসিয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই আমরা কৃষ্ণদাসের হস্তে বেলমালাকে সমর্পণ করিব।

তখন রাধানাথ একান্তমনে কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইলেন।

ইহার অল্প দিন পরে কৃষ্ণদাস রাধানাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া রাধানাথের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাসের কথা শ্রবণ করিয়া রাধানাথ মৌনী হইয়া রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাধানাথের পুত্র আসিয়া কৃষ্ণদাসকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

কৃষ্ণদাস সে সময় রাধানাথের মনোভাব উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, এবং প্রতিবেশীদিগের নিকট রাধানাথের পুত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাধানাথ আমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া আমাকেই কন্যা সমর্পণ করিবেন বলিয়া বৃন্দাবনে গোপালকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মূঢ় পুত্র তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিয়া নরকগামী করিতেছে।

কৃষ্ণদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবেশিগণ রাধানাথের পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তোমার পিতা কৃষ্ণদাসকে কন্যাদান করিবে—বৃন্দাবনধামে গোপালের মন্দিরে গোপাল সাক্ষাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাতে অন্তরায় হইতেছ। তোমার কি ধর্ম্মভয় নাই? ধর্ম্মকর্ম্মে যে ব্যাঘাত জন্মায়, তাহার যে কি দারুণ দুর্গতি হয় তাহা কি তোমার জানা নাই?

রাধানাথের পুত্র ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে এবং রোষারুণলোচনে সর্ব্বসমক্ষে গর্জ্জন করিয়া কহিল, আমার পিতা এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী কে?

কৃষ্ণদাস কহিলেন, গোপাল,—এ কথার সাক্ষী সেই বৃন্দাবনস্থ গোপাল দেবতা।

রাধানাথের পুত্র দ্বিগুণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, যদি সেই গোপাল আসিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে, তবে কৃষ্ণদাস! অবশ্য তোমাকে আমার ভগ্নী দান করিব, সন্দেহ করিও না।

কৃষ্ণদাস স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, তবে তাহাই হইবে। দেখিও, তখন আবার কলহ করিও না।

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণদাস অনন্যমনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলেন। এবং গোপালের মন্দিরে সমুপস্থিত হইয়া গোপালের চরণবন্দনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে সমস্ত জানাইলেন, এবং সাক্ষ্য দিবার জন্য যাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গোপাল ভক্ত কৃষ্ণদাসের সাতিশয় ভক্তি সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং প্রসন্ন হইয়া সাক্ষ্য দিব বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কৃষ্ণদাস গোপালের পদবন্দনা করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রভু! তোমায় আমার সঙ্গে বিদ্যা নগরে যাইতে হইবে। শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া গোপাল কহিলেন, আমি প্রতিমা হইয়া কিরূপে চলিয়া যাইব? গোপালের পদধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণদাস কহিলেন, প্রভু! তবে তুমি প্রতিমা হইয়া কিরূপে কথা কহিতেছ? তখন ভক্তবৎসল গোপাল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সংকল্প করিয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, আচ্ছা, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যাইব। কিন্তু তুমি কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতে পারিবে না; যদি কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাও, তবে আমি সেই স্থলেই রহিব।

কৃষ্ণদাস কহিলেন, প্রভু! আমি কিরূপে জানিতে পারিব যে, তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?

গোপাল কহিলেন, তুমি আমার চরণস্থিত স্বর্ণনূপুরধ্বনি শুনিতে পাইবে, এবং তাহাতেই আমার আগমন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণদাস প্রীতমনে যাত্রা করিলেন। আর ৺বৃন্দাবনধামের গোপাল তাঁহার অনুগমন করিলেন। কৃষ্ণদাসের গ্রামে পঁহুছিবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়ে নদীতটস্থ বালুকণা গোপালপদস্থিত নূপুরের ভিতর প্রবেশ করায় নূপুরের সে মধুর ধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ নূপুরধ্বনি বন্ধ হওয়ায় গোপালের আগমন সম্বন্ধে সন্দেহাকুলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। কৃষ্ণদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলে, গোপাল হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়াছ, অতএব আমি এই স্থলেই থাকিব। তোমার গৃহে আর আমার যাওয়া হইল না।

তখন ভক্ত কৃষ্ণদাস কাঁদিতে কাঁদিতে আপন গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং রাধানাথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। রাধানাথ তৎশ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া স্ত্রী পুত্র পৌত্র কন্যাগণ সহ কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তথায়

উপস্থিত হইলেন, এবং সেই বৃন্দাবনধামের স্বনামখ্যাত গোপালকে সেই স্থলে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

তাঁহাদের সকলের মনেই একবারে ভক্তিসমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

রাধানাথ আপন পরিবারগণ সহ দন্তে তৃণ লইয়া গোপালের চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

অচিরকালমধ্যেই সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা গ্রামের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইয়া পড়িল। এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আসিয়া সেই স্থলে সমুপস্থিত হইল।

অস্তগামী সূর্য্য যখন সাগরজলে অবগাহন করিতেছিলেন, এবং সাগর যখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, লহরের উপর লহর ঢালিয়া, ফেনরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে সূর্য্যদেবের অভ্যর্থনা করিতেছিল, সেই সময় সর্ব্বসমক্ষে গোপাল আকাশ-বাণী করিলেন, "রাধানাথ তুমি কৃষ্ণদাসকে কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এ কথা সত্য; আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি। অতএব তুমি কৃষ্ণদাসকে কন্যা সমর্পণ করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর।"

তখন রাধানাথ মনের আনন্দে কৃষ্ণদাসের হস্তে কন্যা দান করিলেন। এবং গোপালকে লইয়া মহা মহোৎসব করিলেন। এই ঘটনার পর কিছু দিন গোপাল সেই বিদ্যা নগরেই ছিলেন। তাহার পর পুরুষোত্তমে জগন্নাথের মন্দিরে রহিলেন।

গোপালকে আপন মন্দিরে দেখিয়া জগন্নাথ এক দিন আপন সেবকদিগের প্রতি স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, গোপাল আমার সমুদয় আহার্য্য আহার করিয়া ফেলে, অতএব আমি কিছুই আহার করিতে পাই না।

জগন্নাথদেবের এইরূপ আদেশ হওয়ার পর গোপালের স্বতন্ত্র পুরী নির্ম্মিত হইল। গোপাল সত্য কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "সত্য-বাদী", এবং সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "সাক্ষিগোপাল" হইয়াছে। তাঁহার নামেই তাঁহার গ্রামের নাম হইয়াছে—সত্যবাদী।

অগ্রে সত্যবাদীতে সাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়া, তাহার পর যাত্রিগণ জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

কবি শেলি ও তাঁহার মৃত্যু।

বর্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রতিভা-গগনের তিনটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অকালে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কিট্‌স্ যৌবনারম্ভেই পরলোকে গমন করিলেন; পর বৎসর শেলি স্পিজিয়া উপসাগরে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বায়রণও পূর্ণ যৌবনে বন্ধুদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন। যে প্রতিভার বিকাশ হইতে না হইতেই পৃথিবী এমন অমূল্য রত্নের অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, সমগ্র পৃথিবীর গৌরবের আর সীমা থাকিত না। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের মাত্রা এইখানেই শেষ হইল না, আট বৎসর গত হইতে না হইতে সার ওয়াল্টার স্কটও অমর কীর্ত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

কবিমাত্রেই স্বভাবের উপাসক, কেহ মানবচরিত্রের পরিচিন্তনে, কেহ বাহ্যপ্রকৃতির ধ্যানে, কেহ বা উভয়ের সাধনায়, আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কিটস্, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ইঁহারা প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া একই অনন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার প্রকৃতির পবিত্র শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিট্‌স্ প্রকৃতির বাহ্য শোভায় বিভোর হইয়াছিলেন; যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু কমনীয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই সত্য, তাহাই মহৎ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বভাবের নৈতিক আধ্যাত্মিক প্রভাবে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার কবিতার স্বাস্থ্যদায়িনী বা সঞ্জীবনী শক্তি পাঠকের প্রবৃত্তি চরিত্র উন্নত করিয়া দেয়। কিন্তু স্বভাবের নৈসর্গিক চিত্র শেলির চিত্রফলকে যেমন সুন্দর, যেমন অবিকল ও যেমন বিশদভাবে উঠিয়াছিল, বোধ হয়, কবিত্বের ইতিহাসে সেরূপ নিতান্ত দুর্লভ। শেলির প্রতিভা স্বভাবতঃই কল্পনাময়ী। তাঁহার কল্পনার কমনীয় সূত্রে সমস্ত প্রকৃতি যেন আপনি গ্রথিত। সুন্দর সুন্দর উপমা, শ্রুতিমধুর ছন্দোবিন্যাস ও বর্ণনার গাম্ভীর্য্য শেলির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শেলির জীবন সমগ্র প্রকৃতির একটি নিরবচ্ছিন্ন অংশ। স্বভাবেই শেলি আপনাকে হারাইতেন, এবং আপনাকে পাইতেন। স্বভাব ও শেলির জীবনের মধ্যে এমন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, এবং এমন সহানুভূতি ছিল, যেন উভয়ে উভয়ের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। শেলির কবিতার সুধানিঃস্যন্দী উৎস কোন সুদূর স্বপ্নরাজ্যের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া, হৃদয়ের নিভৃত-তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া, প্রাণের কোন বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া, অলসভাবে বহিয়া যায়। সেই কুহকে, সেই মদিরায়, অনেক সময় শেলির কবিতা অর্থশূন্য ও ভাবশূন্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি 'Prometheus Unbound' এর পৃথিবী, সমস্তের রূপ কল্পনা, এবং চাঁদের গান এত সুন্দর যে, শেলির সমস্ত ত্রুটী ভুলিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা হয়।

প্রকৃতি-পূজা।

আমাদিগের পক্ষে, শেলির উপাসকগণের ন্যায়, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমর্থন করিতে চেষ্টা করা নিতান্তই বিফল। শেলির চরিত্রের বিচার করিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ একটি বিষয় বিস্মৃত হই। কবি যৌবনোদ্গমেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবনের পূর্ণকাল বাঁচিয়া উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করিবার [illegible] সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। সমাজের [illegible]স্রোত প্রবল প্রতিভার বিকাশের স্থান

[illegible]হিতা।

নহে। হ্যাম্‌লেটের সেক্‌স্‌পিয়র, ফষ্টের গেটে, লর্ড বায়রণ, শেলি, প্রত্যেকেই [illegible] প্রতি তীব্র ভ্রূকুটী করিয়াছিলেন। উদ্দামপ্রকৃতি শেলি এবং লর্ড বায়রণ স[illegible] হইতে [illegible] দূরে গিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের চরিত্রবিচার সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক এইরূপ লিখিয়াছেন, "বায়রণের মৃত্যুর পর লর্ড মালমস্‌বেরি তাঁহার এক বাক্স চিঠি পাইয়াছিলেন। অনেকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না ভদ্রমহিলা বায়রণের প্রেমের বিনিময়ে আত্মীয়, স্বজন, গৃহ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, জাতিকুলমান সমস্ত উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, এই সকল প্রেমলিপি লিখিয়াছিলেন; বায়রণ ও শেলির দোষগুণের বিচার করিতে হইলে, অগ্রে আমাদিগেরও ঐরূপ এক এক বাক্স প্রেমলিপি দর্শন আবশ্যক।' ফলতঃ, শেলির সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ড সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ বলিয়া মনে হয়,—"Shelley, beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain."

শেলির মৃত্যু যেমন শোচনীয় তেমনই রহস্যপূর্ণ। মেরি শেলি, লে হান্ট, ট্রিলনি কবির শেষ জীবনের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে।

নূতন জীবনচরিত।

সম্প্রতি ইটালির অন্তঃপাতী ভায়ারেগিও নিবাসী ডাক্তার বয়জি শেলির জীবনের শেষভাগ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন কথা জানা যায়। এই পুস্তকে যে সমস্ত প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ফ্লোরেন্স, লিউকা ও লেগহরণের গবমেণ্ট সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত।

শেলির প্রথমা পত্নী হেরিয়েট—যাঁহাকে যৌবনে শেলি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই অবধি শেলির নিকট এইরূপ মৃত্যু এত সুন্দর বোধ হইয়াছিল যে, তিনি জাহাজ মগ্ন হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন।

স্যান টেরেন্সো নামক স্থানে এক দিন তিনি ও জেন উইলিয়মস্‌ একখানি জীর্ণ তরণীতে পাল উড়াইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে চলিল। শেলিকে যেন স্বপ্নাবেশ-বিমুগ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জেন্‌ নৌকা ফিরাইবার জন্য কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সহসা প্রভাদীপ্তমুখে শেলি বলিয়া উঠিলেন, "চল, আজ আমরা দু'জনে মিলিয়া জীবনসমস্যার নির্ণয় করি।" জেন্‌ বলিলেন, "না, তার চেয়ে বাড়ী গিয়া আমার সন্তানগুলির সহিত আহার করিতে আমি বেশী ভালবাসি।"

আর একবার শেলি, লেগহর্ণ হইতে পিজায় গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হয়। নাবিক সন্তরণপটু ছিল। সে অগ্রে ক্যাপ্তেন উইলিয়মস্‌কে তীরে রাখিয়া শেলিকে লইতে আসিল কিন্তু তখনও শেলি সেই মগ্নপ্রায় পোত পরিত্যাগ করেন নাই। সেই জন্য তিরস্কৃত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "বেশ, তোমাদের যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু আমার সে সময় যেমন ভাল লাগিয়াছিল, বোধ হয়, জীবনে কখনও তেমন লাগে নাই।"

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে, শেলি ও এডওয়ার্ড উইলিয়মস্‌, উভয়েই সস্ত্রীক পিজায় অবস্থান করিতেছিলেন। শেলি ও উইলিয়মস্‌ পরিবারের মধ্যে আদর্শ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। রূপগুণসম্পন্না সঙ্গীতাভিজ্ঞা জেন্‌, শেলির জীবনে যেন নব জ্যোতিষ্কের মত উদিতা হইয়াছিলেন। রাত্রে ট্রিলনি ইঁহাদের গৃহে আসিয়াছিলেন। ট্রিলনি শেলিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সে দিন শেলির মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া ট্রিলনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শেলি ও উইলিয়ম্‌ স্পিজিয়ার নিকট গ্রীষ্মাতিবাহন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বায়রণ এই সময় পিজা নগরীতে বাস করিতেছিলেন। শেলির ইচ্ছা ছিল, বায়রণও এই গ্রীষ্মাবাসে [illegible]

আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু Claire Clairmontএর প্রতি বায়রণের নির্দ্দয়াচরণে কবিদ্বয়ের বন্ধুতা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়। স্পিজিয়া উপসাগরের উপকূলে ক্যাসামগ্নি নামক স্থানে শেলি ও উইলিয়মস্-পরিবার গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তথায় গমন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে জেনোয়া হইতে একখানি নৌকা প্রস্তুত হইয়া আসিল।

বায়রণের প্রতি ট্রিলনির অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি বোটের নাম 'ডনজুয়ান' রাখিবার প্রস্তাব করিলে, শেলি তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু মেরি শেলি ইহার নাম 'এরিয়েল' রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বায়রণ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় নায়কের নামে জাহাজের নামকরণ করা হইয়াছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং পোতখানির নাম 'এরিয়েল' রাখাই স্থির হইল।

শেলি এই নৌকায় আরোহণ করিয়া মেঘ ও পবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অনেকবার সমুদ্রে গিয়াছিলেন। প্রাচীন নাবিকেরা নিষেধ করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এই সময়ে তিনি অধিক কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই।

লর্ড বায়রণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তখন তিনি অধিক কবিতা রচনায় সক্ষম হন নাই। "আমি বায়রণের সঙ্গে অনেককাল বাস করিয়াছি—সূর্য্যের আলোকে ক্ষুদ্র খদ্যোত নিভিয়া গিয়াছে।" এই সময়ে পোতে বসিয়া তিনি 'Triumph of Life' শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কবিতায় তাঁহার প্রতিভার পূর্ণোজ্জ্বল বিকাশ, তাঁহার কবিতাসরিতে নূতন স্রোত। তাহাতে অপেক্ষাকৃত

মরণলালসা।

শান্তভাব, গাম্ভীর্য্য ও সহানুভূতি দেখা গিয়াছিল। এই কবিতার বিষাদক্লিষ্ট শেষ চরণে যেন আমরা শেলির আসন্ন মৃত্যুর আভাষ পাই। একবার ট্রিলনিকে শেলি কিছু 'প্রুসিক এসিড' পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন; তিনি লেখেন,—"বলা বাহুল্য, আজ কাল আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু অনন্ত শান্তিগৃহের চাবি সর্ব্বদা আমার হাতে থাকা নিতান্ত আরামপ্রদ নয় কি?"

লে হাণ্ট একখানি সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশবিষয়ে বায়রণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইটালিতে আসিয়াছিলেন। 'এরিয়েলে' আরোহণ করিয়া শেলি ও উইলিয়মস্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। লে হাণ্ট ও শেলির মধ্যে যেরূপ প্রণয় ছিল, পৃথিবীতে সেরূপ প্রণয় নিতান্ত দুর্ল্লভ। উইলিয়মস্ ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলে তাঁহারা লে হাণ্টের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। লে হাণ্ট কবি কিট্‌সের প্রণীত একখানি "Hyperion" গ্রন্থ শেলিকে উপহার দিলে, শেলি বলিলেন, "এখানি এখন তুমি রাখিয়া দাও, আমার যে সময় নিজ হাতে আমাকে দিতে পারিবে, তখন দিও।"

শেষ যাত্রা।

আকাশের অবস্থা না দেখিয়া লে হাণ্ট শেলিকে সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্রে যাইতে বারংবার নিষেধ করিয়া গেলেন। ৮ই জুলাই সোমবারে লিঙ্গা বন্দর হইতে ইঁহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে জলরাশি ধূমাকীর্ণ করিতেছিল, এবং জাহাজ বহিঃসমুদ্রে আসিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া লবণাম্বুরাশি ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, 'এরিয়েল' ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। তিন দিনের মধ্যে 'এরিয়েল' সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাইয়া ট্রিলনি চিন্তিত হইলেন, এবং বায়রণকে তাঁহার আশঙ্কার বিষয় জানাইলেন। দুই একটি আশঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই বায়রণের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জেন্ ও মেরি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা সেই প্রকৃত নিদারুণ বার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহারা লেগহর্ণে যাইবার

উদ্যোগ করিলেন। ইতিমধ্যে লে হাণ্টের নিকট হইতে শেলির নামে একখানি চিঠি আসিল; হাণ্ট লিখিয়াছেন,"তোমরা সোমবারে কেমন অবস্থায় ছিলে,—লিখিবে, আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।" জেনের হস্ত হইতে পত্রখানি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। জেন্ বলিলেন, "তবে সব ফুরাইয়াছে!" মেরি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহারা উভয়ে পিজায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহাদের কোন সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা সত্বর লেগহর্ণে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কাপ্তেন রবার্টসের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অদৃষ্ট বুঝিয়া লইলেন, তবুও তাঁহারা আশা পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা ভায়ারেগিও নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তখন এই শোকাবহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। ১৯শে জুলাই শেলি ও উইলিয়মসের শবদেহ বেলাভূমিতে সংলগ্ন দেখা গেল। ট্রিলনি, জেন্ ও মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ক্যাসাম্যাগ্নিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমি কোন কথাই বলিলাম না, তাঁহারাও আমাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। মিসেস্ শেলির আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনযুগল আমার মুখের উপর নিপতিত ছিল। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। সেই গম্ভীর ও শোকপূর্ণ নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তবে আর আশা নাই?' আমি উত্তর দিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলাম।"

শেলি ও উইলিয়মের মৃতদেহ স্পিজিয়া উপসাগরের সৈকতে বালুকারাশির মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছিল। লেগহর্ণের গবমেণ্ট ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা আবেদন করিয়া, ঐ দুইটি মৃতদেহ দাহ করিবার অনুমতি লওয়া হইল। এই দুইটি দেহ যে শেলি ও উইলিয়মসের, এবং উহা যে সমাধি হইতে বহিষ্কৃত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য, ডাক্তার বরজি অত্যন্ত অধ্যবসায়সহকারে অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনুমতি প্রদত্ত হইলে, ট্রিলনি,—যাঁহার উপর এই শোচনীয় কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল,—একখানি দেহপ্রমাণ লৌহপাত্র ও প্রচুরপরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। হাণ্ট এবং বায়রণকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। ১৫ই আগষ্ট দেহ দুইটির সৎকার আরম্ভ হইল। লে হাণ্ট, ট্রিলনি ও বায়রণ, এক দল সুসজ্জিত সৈন্য এবং স্বদলবল ও স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ সৎকারস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। উইলিয়মসের দেহ অগ্রে দাহ করা হয়। যখন তাঁহার সমাধি খনন করা হইল, তখন কেবলমাত্র অস্থিমাংসের স্তূপ পাওয়া গেল। ইহা যে উইলিয়মসের দেহ, বুট দেখিয়া ট্রিলনির সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। বায়রণ উইলিয়মসের মুখের কঙ্কাল দেখিয়া বলিলেন, "আমি দন্ত দেখিয়া মানুষ চিনিতে পারি; আমি যখন কাহারও সহিত কথা কহি, তখন তাহার ওষ্ঠপুট ও মুখ-গহ্বরের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকে। কারণ, জিহ্বা ও চক্ষু যাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে, ইহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া দেয়।" শবাবশিষ্ট কটাহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

বায়রণ বলিলেন, "আমার বেলায় এরূপ করিও না। দেহ যেখানে পতিত হয়, সেই-খানেই যেন পচিয়া যাইতে পারে।" চিতা সবেগে জ্বলিয়া উঠিল। বায়রণ এই সময় কাপড় জুতা খুলিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভস্মাবশেষ একটি ক্ষুদ্র বাক্সে তুলিয়া বায়রণের শকটে রক্ষিত হইল। পর দিন ট্রিলনি প্রভৃতি ভায়ারেগিওতে গমন করিলেন; সমাধি খনন পূর্ব্বক শেলির শব বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দাহ করা হইল।

শবদাহ।

ডাক্তার বরজি বলেন যে, শেলির সমাধিস্থান কোথায়, কাগজপত্র হইতে তাহা নিশ্চিত-

এক বৌদ্ধ প্রতিমা পাওয়া গেল। তাহার সিংহাসনের নীচে শ্রাবস্তী নগরের নাম খোদিত আছে। এই আবিষ্কারে এই সাহেত মাহেতই যে শ্রাবস্তী, তাহাতে কোন সন্দেহই রহিল না।

শ্রাবস্তী ভগবানের জীবিতাবস্থায় তাঁহার বড় প্রিয় স্থান ছিল, এ কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে জানা যায়। কথিত আছে, এখানকার অনাথপিণ্ডদ নামক জনৈক ধনী বুদ্ধ ভগবানের বাসার্থ জেতবন নামক একটি উদ্যান ক্রয় করিবার বাসনা করেন। উহা শ্রাবস্তীর রাজকুমারের সম্পত্তি ছিল। ইহার মূল্য নির্দ্ধারণের সময় রাজকুমার বলেন, সমগ্র উদ্যান স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আবরণ করিতে যত মুদ্রা লাগিবে, উহাই উদ্যানের মূল্য। ভক্ত বৌদ্ধ এই কল্পনাতীত মহার্ঘ মূল্যেও উদ্যানটি ক্রয় করেন। এই শ্রাবস্তীর ৫০০ লি, অর্থাৎ ৮৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কপিলাবস্তু। আমরা কুশীনগরের অবস্থান সম্বন্ধে নবীন-মতালোচনায় দেখিব যে, বঙ্গের অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার লামাইক (Lamau) বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার ওয়াডেল্ (Waddell) এই নগরী আবিষ্কার করিয়া কেমন কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। কপিলাবস্তু সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। এই কপিলাবস্তুর অবস্থান নির্দ্দেশের সময় বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল, এবং এখন ওয়াডেল সাহেব যাহা চরম সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, হয় ত ভবিষ্যতে তাহাও অপ্রমাণ ও অগ্রাহ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক, ৮৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে আমরা ভুইলাতাল (Bhui Latal) নামক স্থানের ভগ্নাবশেষ উক্ত নগরীর বর্ত্তমান চিহ্ন বলিয়া নির্ণীত হইল। কার্লাইল সাহেব এই স্থানে মায়াদেবীর মন্দির প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থান কপিলাবস্তু বলিয়া নির্ণীত হইল। এই স্থান হইতে ২০০ লি, অর্থাৎ প্রায় ৩৪ মাইল পূর্ব্বে, রামগ্রামে হিউয়েন্‌থ্সাং একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। পালী ভাষায় লিখিত মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে ভগবানের নির্ব্বাণের ও উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক দিনের [illegible] আছে। তাহাতে জানা যায় যে, যখন ভগবানের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ [illegible] রাখিয়া দ্রোণান্তরে উহা সংস্থাপিত করিয়া সুগন্ধ চন্দনাদি কাষ্ঠের দ্বারায় দাহ করা হয়, তখন যেমন তৈল বা ঘৃত দগ্ধ হইবার পর ভস্ম বা অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে না, ভগবানের দেহেরও তদ্রূপ কোনও প্রকার ভস্মাবশেষ ছিল না। [illegible] কয়েকখানি অস্থি দগ্ধ হয় নাই, অবশিষ্ট ছিল। সেই অস্থি কয়খানি [illegible] বিভিন্ন দেশের রাজারা বিভিন্ন স্থানে যে কয়েকটি সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণ [illegible] ছিলেন, রামনগরে ইহারই অন্যতম স্তূপ ছিল। স্তূপগুলি অ[illegible] নারেট ইটের গাঁথনি; তাহাদের উচ্চতা ৪০।৫০ হইতে ৩০০ ফু[illegible] গিয়াছে। স্তূপের অর্থ ঢিপ। আজ কাল যেমন স্মরণা[illegible] চিহ্ন[illegible] বা অন্য কোন প্রস্তরমূর্ত্তি বা স্তম্ভে স্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা ক[illegible] লোকেরাও এইরূপ স্তূপ নির্ম্মাণ করি[illegible] মসজিদের গম্বুজে[illegible] করিলে পাঠকেরা অনেকটা ইহার ধার[illegible] পারিবেন[illegible] জাতির দ্বারা রামগ্রামে পূর্ব্বোক্ত যে স্তূপ [illegible]

বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং কার্লাইল ভাবিলেন, যদি এই [illegible]গ্রাম যথার্থ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত [illegible]মগ্রাম হয়, তবে নিশ্চয় ইহাতে উক্ত স্তূপ থাকিবে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ স্তূপ বর্ত্তমান দেখিয়া অনুসন্ধানকার্য্যে তাঁহার দ্বিগুণ উৎসাহ জন্মিল। এই রামগ্রাম হইতে অনেক ঘুরিয়া তাঁহারা [illegible] "কড়োয়া" নামক নালাকে কার্লাইল অনোমা বলিয়া স্থির করিলেন। [illegible]য়া" শব্দের অর্থ 'যাহার উপর দিয়া কেহ পার হয়'। ভগবান সন্ন্যাসী [illegible]র পূর্ব্বে এইখানে অশ্বারোহণে লম্ফ দিয়া পার হইয়াছিলেন। কার্লাইল [illegible] অনুমান করিলেন যে, ইহাই অনোমা হইবে। তাঁহার অনুমানের স্বার একটি কারণ এই যে, এই নদীর অনতি[illegible] "শিরসারাও" নামক গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। "শিরসারাও" অর্থে মস্তকমুণ্ডন। অনোমার তীরে সিদ্ধার্থ রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন, এই শিরসারাও গ্রামের নামে তাহার পরিচয়। এই তিনটি স্থান বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান। এ তিন স্থানে তিনি অনেক স্তূপাদি দেখিতে পাইলেন। এই স্তূপত্রয়ের ১৮০ লি, অর্থাৎ ৩০ মাইল পূর্ব্বদ[illegible]মুখে, নিবিড় ন্যগ্রোধবনের মধ্য দিয়া, পরিব্রাজক মৌর্য্যরাজাদিগের [illegible] উপস্থিত হন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এইখানে উক্ত রাজাদিগের নির্ম্মিত একটি স্তূপ ছিল। বুদ্ধের দেহাস্থির অবশেষ আট জন রাজার মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; তখন মৌর্য্যরাজারা উপস্থিত না থাকায়, তাঁহারা উক্ত অস্থি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিতমনে ভগবানের চিতা-অঙ্গার লইয়া স্বীয় রাজধানীতে একস্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এ জন্য ইহাকে অঙ্গারস্তূপ [illegible]। কার্লাইল [illegible] ন্যগ্রোধবনের ভিতর সেই অঙ্গারস্তূপ দেখিয়া এই স্থানকেই উক্ত রাজাদের রাজধানী স্থির করিলেন।

এবারেই গোল। অধ্যবসায়শীল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এত দূর চীন পরিব্রাজকের [illegible] অতি কষ্টে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়া, [illegible] অভিলষিতদর্শন ইষ্টদেবের সমাধিমন্দির এবার দেখিতে পাইব, এই আহ্লাদে, হিউঅ্যাঙ্গথ্সাং এই স্থান হইতে কুশীনগরের দূরত্বসীমার নিরূপণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং যে ক্ষীণ [illegible]লোকবর্ত্তিকা কার্[illegible]র পথ উজ্জ্বল করিতে[illegible], তাহাও নির্ব্বাণপ্রায় হইল। কিন্তু ইহাতে [illegible] নিরুৎসাহ হইলেন না। ফাহিয়ান নামক চীনপরিব্রাজক ও হিউ-[illegible] ঠিক এই স্থান হইতেই কুশীনগরের পথে গিয়াছিলেন, কিন্তু ফাহি-[illegible] মৌর্য্য-রাজধানী হইতে কুশীনগরের ১২ যোজন, অর্থাৎ ৮৪ মাইল, [illegible] করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সকল দিক বিবেচনা করিয়া স্থির [illegible] ফাহিয়ানের এ গণনায় ভুল আছে, উহা ১২ যোজন হইতে [illegible] মাইল মাত্র। কারণ ক[illegible]নিংহাম্ বলেন, "যদি ফাহিয়ানের [illegible]কে উক্ত অঙ্গার[illegible] ১২ যোজন পূর্ব্বে [illegible] যায়, [illegible] বার [illegible] দূরত্বের ইতিহাসের তুলনায় [illegible]